খ্যাপা
খুঁজে খুঁজে
ফেরে
সায়ন্তনী পূততুণ্ড

এ এক অদ্ভুত জগৎ? এই অদ্ভুত জগতে কোনো স্বাভাবিক মানুষ বাস করে না! ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। কেউ অল্প অসুস্থ, কেউ বেশি ! আবার কেউ বা সাইকো! নিশুতিরাতে আচমকা ভেসে আসে তাদের চিৎকার! এমনই এক গা-ছমছমে, অস্বাভাবিক পরিবেশে আচমকা একের-পর-এক খুন হতে থাকেন সাইকিয়াট্রিস্ট এবং নিউরোলজিস্টরা! সিআইডি সমস্যায় পড়ে! মানসিক রোগীদের মানবিকতার খাতিরে কড়া জেরাও করা যায় না। ওদিকে এই খুনের প্রত্যক্ষদর্শীরা মানসিক রোগী! কীভাবে তাদের পেট থেকে কথা বের করা সম্ভব? এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বাচ্চা ছেলে কুক্কু। সমস্ত প্রমাণ, তার অস্বাভাবিক আচরণ- বারবার তাকেই ‘খুনি’ বলে সাব্যস্ত করে। কিন্তু সত্যিই কি কুক্কুর সঙ্গে এই খুনের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে? কেন খুন হচ্ছেন ডাক্তাররা? এ রহস্যভেদে নামলেন অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জি! শেষপর্যন্ত কি খুঁজে পাওয়া যাবে আসল খুনিকে? এই রহস্যের আলো-আঁধারি নিয়েই গড়ে উঠেছে ‘খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে’।

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে

সায়ন্তনী পূততুন্ড

পূর্বকথা

বাড়িটা অনেক কালের পুরনো। ইঁটে ইঁটে শ্যাওলা জমে একটা অদ্ভুত ফ্যাকাশে অথচ বিষণ্ণ আস্তরণ তৈরি করেছে। কোন সময়ে ওটার রঙ হয়তো সাদা ছিল। এখন সবুজাভ। আদিম,অতিকায় জীবের মতো পড়ে থাকা বাড়িটাকে দেখলে প্রথম দর্শনেই ভয় হয়। মনে হয় কোনও অশুভ শক্তির ছায়া বুঝি ওটার উপর ভর করেছে।

অতীতে এই বাড়িটা কোনো এক সাহেব খুব শখ করে তৈরি করেছিলেন। তখন এটা একটা ঝকঝকে তকতকে অট্টালিকা ছিল।কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ও তাঁর গোটা পরিবারই বিদ্রোহী সেনাদের হাতে বীভৎস ভাবে খুন হন।

তারপর থেকেই বাড়িটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে ঘিরে গড়ে উঠছিল নানা জনশ্রুতি। এ বাড়ির রক্তাক্ত ইতিহাসই আস্তে আস্তে জন্ম দিল নানারকম ভূতের গল্পের। কেউ বলত গভীর রাতে এ বাড়িতে নাকি পিয়ানো বাজে! আবার কারুর বক্তব্য, প্রায় রাতেই এখানে অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। কখনও নাকি কেউ চিৎকার করে, কখনও কাঁদে!

হয়তো বাড়িটার ভাগ্যে আজীবন 'হানাবাড়ি'র তকমা জুটতো। কিন্তু বছর দশেক আগে এক বিখ্যাত মনোবিদ ডঃ মনোহর চৌধুরী শেষপর্যন্ত তাকে উদ্ধার করলেন। ভদ্রলোক মেন্টাল অ্যাসাইলাম তৈরি করার জন্য বাড়ি খুঁজছিলেন। হাওড়ার এই প্রাচীন বাড়িটা তার ভালো লেগে গেল। বেশ বড়সড় চারতলা বাড়ি—যেমন তিনি চেয়েছিলেন, অবিকল তেমনই। কি যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে বাড়িটার। ব্রিটিশ আমলের বড় বড় থাম, শ্বেত পাথরের সিঁড়ি আর লম্বা লম্বা করিডোরের আভিজাত্যই আলাদা। শহরাঞ্চলের চেঁচামেচি, কলরব থেকে অনেকটাই দূরে।মানসিক রোগীদের জন্য শান্ত পরিবেশ খুব প্রয়োজন। সেদিক দিয়েও জায়গাটা পারফেক্ট। তাছাড়া 'হানাবাড়ি' বদনাম থাকার ফলে নেহাৎই জলের দরে পাওয়া যাচ্ছিল।

ডঃ মনোহর চৌধুরী এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। বাড়িটা কিনে নিলেন। যতখানি সম্ভব মেরামতও করালেন। এরপরও অবশ্য বাড়িটা থেকে চিৎকার বা কান্নার শব্দ ভেসে আসত। তবে ভূতের নয়, মানসিক রোগীদের। পরিত্যক্ত এককালের প্রাণহীন হানাবাড়ি পরিণত হল—'মেন্টাল হেল্প অ্যাসাইলামে। -

-স্যার, আপনার চা।

ওয়ার্ডবয় বিনয়ের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডঃ মনোহর চৌধুরী। এতক্ষণ দশ বছর আগেকার স্মৃতিতে ডুবে ছিলেন।তখন মাত্র পাঁচটি রোগীকে নিয়ে তিনি একাই চালু করেছিলেন এই অ্যাসাইলাম। আর এখন রোগীর সংখ্যা প্রায় একশো ছাড়িয়েছে। অনেকেই সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে তাদের হাতযশে। কেউ কেউ ফেরেনি। একদল সাইক্রিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট আর নিউরোলজিস্ট তাদের নিয়ে সর্বক্ষণই ব্যতিব্যস্ত। সবমিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ।

—'ইয়েস'। তিনি সামান্য মাথা ঝাঁকালেন—'টেবিলে রাখো'।

বিনয় টেবিলের উপর খুব সন্তর্পনে চায়ের কাপ রাখে। সামান্য চা ও যদি কাপ থেকে প্লেটে চলকে পড়ে তাহলেই স্যার কুরুক্ষেত্র বাঁধাবেন।

মাঝেমধ্যে তার মনে হয় শুধু রোগীরাই নয়, তার সাথে এখানকার ডাক্তাররাও কিছু কম উদ্ভট প্রকৃতির নন! ডঃ মনোহর চৌধুরী এমনিতে ভীষণ ঠান্ডা প্রকৃতির লোক হলেও তাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সবাই। তিনি যে কিসে রাগবেন, আর কিসে রাগবেন না—তা বোধহয় ঈশ্বরও জানেন না। একবার দোতলার করিডোরের দেওয়ালে একটা মথ এসে উড়ে বসেছিল। সেটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার নয়। কিন্তু ডঃ চৌধুরী সেটা দেখে এমন লঙ্কাকান্ড বাঁধালেন যে মনে হল—মথ নয়, একটা টেরোডাকটেল এসে উড়ে বসেছে!

ডঃ চৌধুরীর পরেই এখানে যার স্থান, সেই ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ তো আরও বিটকেল প্রকৃতির! অন্ধকার কেবিনে বসে খুব মৃদু আওয়াজে মিউজিক সিস্টেমে গান শোনেন।

দিনের বেলায় তিনি খুব একটা ঘর থেকে বেরোন না। রাতেই তার দেখা পাওয়া যায় বেশি। বেশির ভাগ সময়েই মধ্যরাত্রে এসে রোগী দেখেন। অন্ধকার বা খুব অল্প আলোই তার পছন্দ। চড়া আলো দেখলেই অসম্ভব রেগে যান। তবে ডঃ চৌধুরীর মতো চেঁচামেচি বা লম্ফঝম্প করেন না। বরং বিড়বিড় করে বলতে শুরু করেন —'একশো...নিরানব্বই...আটানব্বই...সাতানবই...ছিয়ানব্বই...'।

এই উলটো গুনতি শুনলেই সবাই বোঝে যে তিনি চূড়ান্ত চটেছেন!

এখানকার আরেক বিখ্যাত মনোবিদ ডঃ ধৃতিমান হালদার বরং অন্য দুজনের তুলনায় স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বেশ শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ। সর্বক্ষণই মুখে একটা চমৎকার হাসি লেগে থাকে। খুব সস্নেহ ব্যবহার। সবসময়ই তার পকেটভর্তি লজেন্স থাকে। প্রত্যেক রোগীকেই রোজ লজেন্স উপহার দেওয়া তার স্বভাব।

কিন্তু ভদ্রলোককে যখনই দেখা যায় তখনই তিনি কলা খেতে ব্যস্ত! এমনকি রোগীও দেখতে যান কলা হাতে। এক একজন রোগীকে দেখেন আর এক একটি কলা শেষ হয়। কি অদ্ভুত টাইমিং তার! একজন রোগী পিছু একটি করে কলা! রোগী দেখা শেষ করে কলার খোসাটা সিস্টারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যান অন্য রোগীর কাছে। পিছন পিছন কলার ট্রে হাতে কোনও জুনিয়র ডাক্তার। কলা শেষ, তার সাথে রোগী দেখাও শেষ!

উপরোক্ত এই তিনজনই এই অ্যাসাইলামের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এছাড়াও যারা আছে তারাও একেকজন একেকটি অবতার! তাদের কথা না বলাই ভালো।

সবমিলিয়ে বিনয়ের এই পরিবেশ অসহ্য লাগে। রোগী থেকে ডাক্তার অবধি—একটা লোকও এখানে স্বাভাবিক নয়! যেন বিচিত্র রকমের পাগলের মেলা বসেছে এখানে। সবাই পাগল--কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম।

–‘চারতলায় মাঝখানে খুব চেঁচামেচি শুনছিলাম'। চায়ের কাপে আলতো চুমুক দিয়ে বলেন ডঃ চৌধুরী—‘কি হয়েছিল?'

বিনয় আস্তে আস্তে বলে—'তিনশো বারো ডঃ মিত্রকে খেতে চাইছিল স্যার'।

ডঃ চৌধুরীর মুখে কোন ভাবান্তর নেই—‘ডঃ মিত্র কি আস্ত আছেন?'

—'এমনিতে আস্তই আছেন...' তার প্রতিক্রিয়াও খুব ঠান্ডা—‘তবে ওনার কাঁধ থেকে রক্ত পড়ছিল। তিনশো বারো কামড়ে অনেকটা মাংস তুলে নিয়েছে। ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল স্যার। আমরা পাঁচজন মিলেও সামলাতে পারছিলাম না। আমাদেরও খেতে আসছিল'। বিনয় একটু থেমে বলে—‘শেষপর্যন্ত ডঃ হালদার হান্টারপেটা করে ঠান্ডা করলেন'।

–হুঁ'।

তিনি একটু অন্যমনস্ক। এই বিল্ডিঙের চারতলাটা মারাত্মক ‘সাইকো কিলার'দের জন্য রক্ষিত। বেশিরভাগেরই ঠিক হবার সম্ভাবনা নেই। এক একজন একেকরকমের মানসিক বিকৃতির শিকার! কেউ রক্তদর্শন করে আনন্দ পায় বলে একের পর এক খুন করে গেছে। কারুর ধারণা যে সে ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করতে পেরেছে। সেইসব ওষুধ তথা বিষাক্ত কেমিক্যাল প্রয়োগ করে সুস্থ জ্যান্ত মানুষগুলোকে মেরে ফেলেছে। কারুর বা আবার মৃতদেহ সংগ্রহের শখ!

এমনই এক অদ্ভুত সাইকো কিলার তিনশো বারো। লোকটার আসল নাম কি তা সকলেই ভুলে মেরে দিয়েছে। তার আবার নরমাংস খাওয়ার টেন্ডেন্সি। নরমাংস খেলে নাকি আয়ু বাড়ে! লোকটার সুস্থ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। তাকে সর্বক্ষণই হাতে পায়ে লোহার বেড়ি, আর মুখে লোহার খাঁচা পরিয়ে রাখতে হয়। নয়তো সে সবাইকেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। প্রায় দু বছর সে এখানে আছে। এর মধ্যে যে কতবার, কতভাবে ডাক্তাররা তার হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তার হিসেব নেই। একমাত্র ডঃ ধৃতিমান হালদারই তাকে বাগে আনতে পারেন। বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে নির্দয়ের মত ইলেক্ট্রিক হান্টার দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেন।

–‘দুশো তিনের কুক্কু আর তার দাদার খবর কি?'

—'দাদাটা ঠিকঠাকই আছে। তবে কুক্কুকে নিয়ে আরেক ঝঞ্ঝাট!' বিনয় বিরক্ত মুখে জানায়—'তার চুলে হাতই দেওয়া যাচ্ছে না।চুল জট পাকিয়ে প্রায় জটা হয়ে গেছে। অথচ মাথায় চিরুনি দিতে গেলে বা চুল কাটতে গেলেই হাঙ্গামা করছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কখনও আবার কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে পড়ছে'।

ডঃ চৌধুরী একটু ভাবলেন। দুশো তিনের কেসটাও অদ্ভুত। ঐ ফ্লোরটা আবার সেইসব বাচ্চাদের জন্য, যাদের পরিবারে কোনও না কোনও অপরাধ ঘটে গেছে। পারিবারিক অপরাধের অতীত যাতে তাদের শিশুমনেও অপরাধপ্রবণতা ডেকে না আনে—সেইজন্যই তাদের এখানে রাখা হয়। কাউন্সিলিং করা হয়।

দুশো তিনের কুক্কু আর তার দাদা পুপুর ইতিহাসটাও এইরকম। ওদের মাকে বাবা বিষ দিয়ে খুন করে। ভদ্রলোক বর্তমানে হাজতে বিচারাধীন অবস্থায় আছেন। অনাথ ছেলেদুটিকে ছ'মাস আগেই এডিজি শিশির সেন এখানে রেখে গেছেন। সি আই ডি'র বিখ্যাত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ অসীম চ্যাটার্জীর সাথে ডঃ চৌধুরীর বহু দিনের বন্ধুত্ব। সেই সূত্রেই শিশির সেন এরকম কেস পেলে ডঃ চৌধুরীর হেফাজতে রেখে যান।

তার কপালে ভাঁজ পড়ল—'ঠিক আছে। এক কাজ করো। তুমি ডঃ মিত্রকে একবার ডেকে দাও। দেখছি কি করা যায়'।

বিনয় সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চলে যায়। তিনি চায়ের কাপে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে ফের চিন্তায় ডুবে যান। এ বিল্ডিঙের চারতলাটা ক্রমশই ডাক্তারদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারতলার বাসিন্দারা সবচেয়ে বিপজ্জনক মনোরোগী। তাদের সবাইকেই হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা হয়। দরজায় জেলখানার মতোই মোটা মোটা গরাদ দেওয়া। তা সত্বেও প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ আক্রান্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে ওখানে তেরোজন খুনী আছে। প্রত্যেকেরই খুনের তালিকা দীর্ঘ। হাতে গোণা কয়েকজন অবশ্য শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু বেশিরভাগই হিংস্র। তীব্র ক্ষোভে, রাগে ছটফট করে বেড়ায়। কোনওমতে একবার ছাড়া পেলে বোধহয় কাউকেই ছাড়বে না।

আজকাল ডঃ চৌধুরীর মনে হয়, সত্যিই হয়তো এ বাড়ির উপর একটা অশুভ ছায়া ঘনিয়ে আসছে। যদিও এরকম মনে হওয়ার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কিন্তু যা যুক্তিবুদ্ধির কাছে অধরা, তা অনুভবের কাছে ধরা পড়ে। তিনি অনুভব করতে পারেন, কিছু একটা অমঙ্গল, কিছু একটা অশুভ খুব শীগগিরিই ঘটতে চলেছে......।

--'আসবো স্যার'?

নিউরোলজিস্ট ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র বয়েসে নবীন। বছর ত্রিশ বত্রিশের যুবক। এমনিতে ভারি হাসিখুশি। কিন্তু আজকে তাকে বেশ চিন্তিত লাগছে। কাঁধে ব্যান্ডেজ।

—'এসো'। ডঃ চৌধুরী তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন—'কাঁধ কেমন আছে'।

—'ঠিক আছে'। সে অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'চারতলায় আজকাল প্রাণ হাতে করে যেতে হচ্ছে স্যার! এই খুনীদের এখানে রাখা কি খুব প্রয়োজন? পুলিশ তো এদের জেলে রাখলেই পারে।এখানে রাখার দরকার কি?'

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'ভারতীয় সংবিধান চিরঞ্জীব! খুনী মানসিক বিকৃতির শিকার হলে, তাকে আগেই জেলে ভরা যায় না। বরং তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয় আগে। তারপর বিচার'।

-'এরা কোনওদিন সুস্থ হবে না'। ডঃ মিত্র একটু উত্তেজিত—'মানুষ খুন করাটা এদের নেশা! আজ পর্যন্ত কারুর মধ্যে একটু অনুতাপও দেখলাম না। বরং এমনভাবে তাকায় যে ভয় করে। মনে হয় আমাকেই বোধহয় পরবর্তী শিকার ভেবে বসে আসে আছে'।

—'আই নো'। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কাজের কথায় এলেন ডঃ চৌধুরী—'তোমাকে আপাতত আর চারতলায় যেতে হবে না। তুমি দুশো তিনের কেসটা একটু দেখো। কুক্কুর মাথার চুল কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না'।

চিরঞ্জীব কিছু যেন ভাবছে। মাস দুয়েক আগেও এই বাচ্চাটাকে নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। যাথাতে কিছুতেই হাত দিতে দেবে না! তার যে কিসের ভয় তাও বোঝা যাচ্ছে না। কমিউনিকেট করা তো দূর, বরং পারলে যেন ডাক্তারদেরই খুন করে! বয়েস নেহাৎই কম বলে হিপনোসিস দেওয়া যাচ্ছে না। হিপনোসিস সফলই হচ্ছে না! অথচ সে মাথার চুল কিছুতেই কাটবে না। চুল আঁচড়াতে দেবে না। সেবারও চিরঞ্জীব তার চুল কাটার চেষ্টা করেছিল। বাচ্চাটা ক্ষিপ্ত হয়ে একটা ক্রিকেট ব্যাট ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে। ব্যাটটা সরাসরি মাথায় এসে লাগেনি—এই রক্ষে। তবে কপাল কেটে গিয়েছিল। ব্যাটটাও দু টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

শেষপর্যন্ত তাকে সেডেটিভ ইঞ্জেক্ট করে ঘুম পাড়িয়ে চুল কেটে দিয়েছে সে।

তখন থেকেই বাচ্চাটার অদ্ভুত আক্রোশ চিরঞ্জীবের প্রতি। ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে সারল্যের বদলে প্রতিহিংসা ফুটে ওঠে। তার মনে হয়, কুক্কু নামের বাচ্চাটা সুযোগ পেলে নির্ঘাৎ তাকে খুন করবে।

আবার সেই ছেলেটারই চুল কাটার দায়িত্ব পড়েছে তার উপর!

–'এবার কোনও রিস্ক নিও না। সিস্টারকে বোলো আগেই একটা সেডেটিভ দিয়ে দিতে'। ডঃ চৌধুরী বলেন—' –'ঘুমিয়ে পড়লে তবেই চুলে হাত দিও। পারলে এবার একদম ন্যাড়া করে দাও। অন্তত কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্তে থাকা যাবে'।

-'ওকে স্যার'...

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ তার বোধহয় কিছু মনে পড়ে গেছে। সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

–'কিছু বলবে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছেন ডঃ চৌধুরী

একটা অদ্ভুত সন্দেহ!...একটা অদ্ভুত

-'হ্যাঁ স্যার...। একটা কথা বলার ছিল'।

-'বলো'।

-'আমার মনে হয়...সে একটু ইতস্তুত করতে করতেই বলে—'আমার মনে হয়...ঐ দুশো তিনের...'।

আর কিছু বলার সুযোগ সে পেল না। তার কথার মাঝখানেই হঠাৎ শোনা গেল নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার। কেউ যেন প্রচন্ড আতঙ্কে আর্তনাদ করছে

--'খু–উ–ন......খু-উ-ন...'

ডঃ চৌধুরী এস্তব্যস্ত হয়ে সেদিকেই ছুটে গেলেন। চিরঞ্জীবের কথা আর শোনা হল না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের আট নম্বর ঘর থেকেই চিৎকারটা ভেসে আসছিল। আট নম্বরের পেশেন্ট মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত পরিত্রাহি চিৎকার করে ততক্ষণে ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন। কেউ তাকে থামাতে পারছে না। ডঃ ধৃতিমান হালদারও ছুটে এসেছেন। ডঃ চৌধুরীকে দেখে মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে অস্ফুটে বললেন—'আবার সেই এক প্রবলেম!'

মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত 'এজ অব অ্যাংজাইটি' বা 'অবসেশনের' পেশেন্ট। তার রাতে ঘুম হত না। ভয়ের চোটে রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেন। এবং সারারাত জেগেই কাটাতেন। তার আতঙ্ক যে ঘুমিয়ে পড়লেই কেউ তাকে খুন করবে। কিংবা ঘুম আর ভাঙবে না!

বর্তমানে 'এক্সপ্ল্যানেটরি সাইকোথেরাপির' মাধ্যমে তার ভয় অনেকটাই কেটেছে। কয়েকদিন ধরেই বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন।কিন্তু আবার সেই একই সমস্যা ফের দেখা দিয়েছে।

–'কি হয়েছে?' খুব শান্ত, নম্র গলায় প্রশ্নটা করলেন মনোহর চৌধুরী।

–'কেউ আমাকে খুন করবে...ডাক্তারবাবু...' প্রায় হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ডঃ চৌধুরীকে জড়িয়েই ধরেছেন অঞ্জলি। বাচ্চা মেয়ের মতো তার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলেন—'কেউ একটা গদা হাতে আমায় মারতে আসছিল...ঐ করিডোর

দিয়ে...চুপিচুপি...গদা হাতে... আমি ঘুমোব না...ঘুমোলেই ও আমায় মারবে। ঘুমোব না...ঘুমোব না...'।

ডঃ চৌধুরী আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। যেন ছোট্ট মেয়ের ভয় ভাঙাচ্ছেন ——কেউ নেই মিসেস গুপ্ত। কেউ মারবে না আপনাকে'।

—'কিন্তু আমি যে দেখলাম...কমলা রঙের জামা পরে...একজন গদা হাতে...'

—'ঠিক আছে...' তিনি বললেন—'আমি বিনয়কে বলে দিচ্ছি। ও আজ রাতে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে।

—'সত্যি বলছেন?' জলভরা বড় বড় চোখ তুলে তাকালেন অঞ্জলি।

—'হ্যাঁ'। ডঃ চৌধুরী সস্নেহে তাকে আশ্বস্ত করেন—'আমি বিনয়কে এক্ষুনি বলে দেব। আপনি ওষুধ খেয়েছেন?' তিনি পিছনদিকে তাকালেন—'সিস্টার...'

সাদা পোষাক পরা সিস্টার ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এসেছে।

—'উনি কি আজকে সেডেটিভ নিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ স্যার' সিস্টার নির্বিকার ভাবে বলে—'একঘন্টা আগেই খেয়েছেন। দশ মিনিট আগেও দেখে গেছি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন'।

—'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন!' তার মুখে চিন্তার ছাপ। ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! তাহলে হঠাৎ আবার তার কি হল? এমন তো হওয়ার কথা নয়!

-'আরেকটা পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দাও।

—'ডাক্তারবাবু...' ডঃ চৌধুরীর দুহাত অসহায়ের মত জড়িয়ে ধরলেন অঞ্জলি—'আমাকে কেউ মারবে না তো?' —'কেউ মারবে না'। তিনি তাকে আশ্বাস দেন—'আমি আছি তো। আমি বসে আছি আপনার পাশে। কেউ কিচ্ছু করবে না'।

একটু পরেই অবশ্য অঞ্জলি শান্ত হয়ে যান। ঘুমের ওষুধ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

ডঃ চৌধুরী তার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অঞ্জলির পাশের বেডের পেশেন্ট সুজাতা দত্ত তার কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট মুখ করে বসেছিলেন। ডক্টরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন—'এই মহিলার জ্বালায় আমি কোনওদিন হার্টফেলই করবো।

সুজাতা দত্ত আবার 'অ্যাংজাইটির' রোগী। সুজাতাদেবীর ধারণা যে তার হার্ট ভীষণ দুর্বল। যে কোনও মুহূর্তে হার্টফেল করবেন! অথচ তার কার্ডিওগ্রামে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বড় বড় হার্ট স্পেশ্যালিস্টরাও অনেক পরীক্ষা করে কিচ্ছু পাননি! অথচ সে কথা তিনি বিশ্বাসই করেন না! চারমাস আগেও সবসময়ই হাতের কাছে 'কোরামিন' রাখতেন। এখন 'কোরামিন' রাখার প্রবণতা অবশ্য গেছে। কিন্তু খুঁৎখুতুনি যায়নি।

ডঃ চৌধুরী শান্তকণ্ঠে জানতে চান—'কি অসুবিধা হচ্ছে'।

—'এই বুকটা কেমন ব্যথা...ব্যথা...

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে মহিলার ওষুধের বাক্স কিছুক্ষণ ঘেঁটেঘুঁটে একটা ওষুধ বের করে এনেছেন। ওষুধ খাওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই রোগীর বুকের ব্যথা কমে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শোনা গেল তার নাক ডাকার আওয়াজ।

ডঃ হালদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটাই লক্ষ্য করছিলেন। ডঃ চৌধুরী বেরিয়ে আসতেই প্রশ্ন করেন

—'আপনি মিসেস দত্তকে কি ওষুধ দিলেন স্যার? এক মিনিটেই বুকের ব্যথা কমে গেল!'

তিনি হেসে ফেললেন—'নাথিং। জাস্ট ভিটামিন বি টুয়েলভ ক্যাপসুল। আরও কিছুদিন সাজেশন চালু রাখো। আই থিঙ্ক—একমাসেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাই দ্য ওয়ে, তোমার ঐ দুই পেশেন্টের খবর কি? একশো পাঁচের মেলাঙ্কলিক ভদ্রলোক আর একশো পনেরোর মহিলা? সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন না?'

-একশো পাঁচের মেলাঙ্কলি গেছে'। তার মুখ সাফল্যের হাসিতে ভরে ওঠে—'ভদ্রলোকের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। কাল পরশু নাগাদই ছেড়ে দেব। আর একশো পনেরোও এ সপ্তাহেই ছুটি পেয়ে যাবে'।

—'অ্যাট লাস্ট তাকে ভূতে ছাড়ল'। সজোরে হেসে ওঠেন ডঃ চৌধুরী—'তোমার অন্যতম পজেজড কেস'।

এই জাতীয় পজেজড কেস বা ভর হওয়া বা ভূতে পাওয়া কেসে ডঃ হালদার ধন্বন্তরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব পজেজড রোগীদের আসল সমস্যা কোনও ভূত বা দেবদেবী নন—হিস্টিরিয়া বা স্কিজোফ্রেনিয়ার যত নিউরোসিস।

একশো পনেরোর মহিলা অবশ্য হিস্টিরিক বা স্কিজোফ্রেনিক নন। তিনি ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ। এই জাতীয় রোগীরা কখনও কান্ডজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করে, কখনও বা একদম বিষণ্ণ হয়ে যায়। কথাবার্তা বলতে চায় না। এমনকি খাওয়া দাওয়া করাও ছেড়ে দেয়।

ভদ্রমহিলার স্বামী তার এই অদ্ভুত আচরণে বিলক্ষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, মহিলাকে ভূতে পেয়েছে! বেচারিকে আটচল্লিশ ঘন্টা ঝাঁটার বাড়ি সহ্য করতে হয়েছিল। ফুটন্ত তেল আর লোহার ছ্যাঁকাও বাদ যায়নি। রোজা বনাম ভূতের লড়াই আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু একজন স্থানীয় চিকিৎসক লোকমুখে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মহিলাকে বাঁচালেন। এবং রোগিনীকে সোজা নিয়ে চলে এলেন এখানে।

শেষ পর্যন্ত ডঃ হালদারের অব্যর্থ চিকিৎসাপদ্ধতিতে এক সপ্তাহেই ভূত বিদায় নিল। এখন মহিলারও বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে।

ভাবতেই তার মুখে সুন্দর একটা হাসি ভেসে উঠল। রোগীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেই ডাক্তারের ডাক্তারি সার্থক।একটি বিপন্ন, অসহায় মানুষ সমস্ত বিপর্যয় কাটিয়ে আবার ফিরে যাবে তার স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে—এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!

–তোমার হাতে আজ কলা দেখছি না!' ডঃ চৌধুরী ঠাট্টাচ্ছলে হেসে বলেন—' আজ হঠাৎ এ ইন্দ্রপতনের কারণ?' –'তুমি আছো, অথচ কলা নেই—এমন তো হয় না!

–'আছে...আছে...' ডঃ হালদার অ্যাপ্রণের পকেট থেকে একটা কলা বের করে এনেছেন—'আট নম্বরের মিসেস গুপ্তর লাফালাফিতে খেতে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করলেন। অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছিলাম কি যেন খাই নি...কি যেন খাইনি.......

কথাটা শেষ করতে পারলেন না ডঃ ধৃতিমান হালদার!

কথা বলতে বলতেই দুই ডাক্তার একতলার করিডোর দিয়ে হাঁটছিলেন। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা পড়ছে। করিডোর ফাঁকা......।

মাথার উপর হাল্কা হলুদ আলো জ্বলছে। তার আলোতেই সামনের দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখলেন তারা!

অনতিদূরেই কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে! মাথা, মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে...তার পাশেই পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত ক্রিকেট ব্যাট!...

-'গ—ড'!

ডঃ হালদারের হাত থেকে কলাটা পড়ে গেল। তিনি পড়ি কি মরি করে দৌড়েছেন সেদিকেই। পিছন পিছন ডঃ চৌধুরী!

দেহটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন দুজনেই। প্রায় উপুড় হয়ে থাকা লোকটাকে ভালোভাবে একবার দেখেই তাদের রক্ত হিম হয়ে গেল!

-'চি-র-ঞ্জী-ব!'

বিস্মিত গলায় বলেন ডঃ হালদার। খুব সন্তর্পনে তার নাকের সামনে হাত রাখলেন। তারপর কানের কাছের রগে। চিরঞ্জীবের স্থির চোখের দিকে তাকিয়েই সন্দেহ হয়েছিল। এবার নিশ্চিত হলেন।

স্খলিত ভয়ার্ত স্বরে বললেন তিনি—'মাই গড স্যার! চিরঞ্জীব নেই! হি ইজ ডেড!'

ডঃ চৌধুরী পাশেই পড়ে থাকা রক্তমাখা ব্যাটটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। অমঙ্গল কিছু হতে চলেছে তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেটা এমনভাবে আসবে তা আশা করেননি!

তিনি আক্ষেপে, শোকে চোখ বুঁজলেন। কিছুক্ষণ আগেই ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র সাথে কথা বলেছেন! অমন তরতাজা জীবন্ত ছেলেটা......তার উৎকন্ঠিত মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল...। কি যেন বলতে চেয়েছিল চিরঞ্জীব!...কি যেন বলার ছিল তার.........

–'নো হালদার'। ডঃ চৌধুরীর গলা কাঁপছিল। তবু কোনমতে বললেন

–'এটা খুন! হি হ্যাজ বিন মার্ডারড! পুলিশে খবর দাও...'।

(ক্রমশঃ)

১

অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিস, সি আই ডি, শিশির সেন মহাবিপাকে পড়েছেন! একদিকে আই জি, অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ীর উত্তপ্ত ও উত্তেজিত অভিযোগ। অন্যদিকে ডিপার্টমেন্টের সেরা ও অভিজ্ঞতম ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ অসীম চ্যাটার্জীর হিমশীতল নীরবতা! এর মাঝখানে পড়ে তাঁর প্রায় মগ্নমৈনাক অবস্থা! অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ীর পুলিশমহলে মারকুটে ও এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট হিসাবে বেশ নাম আছে। রিপোর্টাররা তাকে 'লাহিড়ী কোটাল' আখ্যা দিয়েছে। তিনি অবশ্য ওসবের তোয়াক্কা করেন না।

–'ডঃ চ্যাটার্জী আমার সাথে কো-অপারেট করছেন না স্যার'। প্রণবেশ লাহিড়ী উদ্ধত ও তীব্র ভাবে বলেন—'ওনার কাছে হাওড়ার মেন্টাল অ্যাসাইলাম মার্ডার কেসের এভিডেন্স আর রিপোর্ট আছে। অথচ উনি দিচ্ছেন না।

শিশির সেনের মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ল—'কি কি এভিডেন্স পাওয়া গেছে?'

—'একটা ক্রিকেট ব্যাট'। অফিসার জানালেন—'ব্যাটের গায়ে রক্ত আর চুল লেগে ছিল। সেই রক্ত মৃতব্যক্তিরই। চুলও তার ডি এন এর সাথে ম্যাচ করেছে। মানে ব্যাটটাই মার্ডার ওয়েপন'।

-'মার্ডার ওয়েপন ছাড়া আর কি কি পেয়েছ?'

–'ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্যার। ব্যাটের হাতলে ফিঙ্গারপ্রিন্টও আছে। নিঃসন্দেহে সেটা খুনীরই'।

—'বাঃ'। শিশির সেন বলেন—'এ তো রীতিমত লক্ষ্মী খুনী দেখছি! মার্ডার ওয়েপন রেখে গেছে, মার্ডার ওয়েপনের উপর নিজের হাতের ছাপও রেখে গেছে! নাম ঠিকানা লিখে রেখে যায়নি?

ডঃ চ্যাটার্জী মুখ টিপে হাসলেন। অফিসার লাহিড়ীর কালো মুখ বেগুনী হয়ে গেছে। –'ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কার সেটা জানা গেছে?'

এই প্রশ্নটার লক্ষ্য ডঃ চ্যাটার্জী। তিনি মাথা নেড়ে জানান যে জানা গেছে।

-তাহলে তো কেস সলভড্'।

অফিসার লাহিড়ী রেগে গিয়ে বললেন——সেটা তো ডক্টর বুঝছেন না। উনি বেঁকে বসে আছেন। কিছুতেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট দিতে চাইছেন না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকালেন এডিজি। এতক্ষণে মুখ খুললেন ডঃ অসীম চ্যাটার্জী

–'আ লি কারেকশন্। রিপোর্টটা আমি শুধু তোমাকে দিতে চাইছি না'।

—'হোয়াই ডঃ চ্যাটার্জী?' শিশির সেন অবাক—'এরকম নন কো-অপারেশনের কারণ?'

ডঃ চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—'খুব স্পর্শকাতর ব্যাপার। সামান্য ভুল হলেই অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারুর নেই। আপনি আগে আমায় কথা দিন যে কোন শুম্ভ-নিশুম্ভের বংশধর কেসটা হ্যান্ডল করবে না'।

বলতে বলতেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার অফিসার লাহিড়ীকে দেখে নিলেন। অফিসার উত্তরে 'ফোঁস' করে ওঠার আগেই এডিজি বলেন –'আগে ব্যাপারটা কি সেটা তো খুলে বলুন! হাতের ছাপটা কি কোনো সাইকো কিলারের?'

–'নাঃ। ওটা কোনও সাইকো কিলারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নয়। বরং ওটা একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ'।

একদম অপ্রত্যাশিত খবর! এডিজি চমকে উঠলেন! অফিসার তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন—'দুশো তিন নম্বর ঘরের বাচ্চা ছেলেটার তো? আমি জেরা করে জেনেছি ব্যাটটাও তারই। এক্ষুণি ছেলেটাকে গ্রেফতার করা দরকার। তিন থাপ্পড় মারলেই......'।

–'এই...!' ডঃ চ্যাটার্জী এডিজির দিকে তাকালেন—'এইজন্যই বলতে চাইছিলাম না। হাতের ছাপটা বাচ্চা ছেলেটার হতেই পারে। কিন্তু খুনটা তার পক্ষে করা সম্ভবই নয়'।

-'কেন?'

—'প্রথমত, ভিকটিমের মাথায় একবারই আঘাত করা হয়েছে। সে হিটটাও এত জোরে যে খুলি ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলের শরীরে এত জোর থাকতেই পারে না। দ্বিতীয়ত......'

বলতে বলতেই তিনি আচমকা একটা কাঠের রুল নিয়ে বিদ্যুতগতিতে সোজা অফিসার লাহিড়ীর মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু লাঠিটা অফিসারের মাথায় পড়ল না। পড়ল কাঁধ বরাবর।

- একি!...' অফিসার প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন—'কি করছেন? পাগল হলেন না কি?'

ডক্টর চ্যাটার্জী লাঠিটা বসিয়ে দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আঘাত করতে চাননি। রুলটা অফিসারের কাঁধ আলতো করে স্পর্শ করল মাত্র।

—'সরি, আশা করি লাগেনি'। তিনি শিশির সেনের দিকে তাকান—'এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। প্রণবেশের মাথা

লক্ষ্য করেই আমি রুলটা চালিয়েছিলাম। কিন্তু হিটটা ওর মাথা অবধি গেলই না। কারণ আমি ওর থেকে অনেকটাই বেঁটে। মৃতব্যক্তির হাইট মেপে দেখেছি। প্রায় ছ'ফুট দু ইঞ্চি লম্বা! একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলের পক্ষে ওর মাথার নাগাল পাওয়া আদৌ কি সম্ভব? একটা বাচ্চা ছেলে যদি ব্যাট দিয়ে ভদ্রলোককে মারত তবে স্ট্রাইকটা তার মাথায় পড়ত না। বুকে বা বড়জোর কাঁধে পড়ত'।

শিশির সেন গম্ভীর ভাবে বলেন—'আই সি'।

—'তৃতীয়ত, এই ছবিগুলো আর এই এক্সরে প্লেটটা দেখুন'।

ডঃ অসীম চ্যাটার্জী তার হাতের খাম থেকে বেশ কয়েকটা ফটো আর এক্সরে প্লেট বের করে রাখলেন এডিজির টেবিলে। শিশির সেন ছবিগুলো দেখছেন। ব্যাটের হাতলে একটা হাতের ছাপের এনলার্জড ফটো। আঙুলগুলো গোল হয়ে হাতলের উপর একটা চক্রাকার ছাপ তৈরি করেছে। ব্যাটের হাতল মুঠো করে ধরলে এমন ছাপ পড়ে।

—'এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের রোটেশনটা দেখেছেন?' তিনি বললেন—'লক্ষ্য করে দেখুন এটা অ্যান্টিক্লকওয়াইজ গেছে'।

—'তাতে কি?'

ডঃ চ্যাটার্জী ডানহাতে কাঠের রুলটা মুঠো করে ধরলেন। নিজের মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের দিকে বাঁ আঙুলের তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করেন—'এই দেখুন। যদি এটা আমি ডানহাতে ধরি, তবে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যান্টিক্লকওয়াইজ আসছে। কিন্তু যদি বাঁ হাতে ধরি...' বলতে বলতেই রুলটা তার বাঁ হাতে চলে গেছে—'তবে কিন্তু রোটেশনের ডাইরেকশন পালটে যাচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের রোটেশন ক্লকওয়াইজ হচ্ছে'।

—'ইয়েস'। এডিজি অস্ফুটে বলেন—'সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে ছেলেটি রাইট হ্যান্ডার'।

—'এগজ্যাক্টলি'। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন—'কিন্তু ভিকটিমের খুলির এক্সরে অন্য কথা বলছে'।

ডঃ চ্যাটার্জী এক্সরে প্লেটটা সোজাসুজি আলোর দিকে তুলে ধরলেন। বেশ পরিষ্কার ভাবে খুলির ফাটলের অংশটা দেখা যাচ্ছে।

—'খুলিটা কি ভাবে ভেঙেছে দেখুন। ফাটলটা দেখেছেন?'

তিনি আঙুল দিয়ে ফাটলের অংশটা দেখালেন—'মারার ডাইরেকশন লক্ষ্য করুন। ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে মারা হয়নি। একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ মেরেছে। রাইট হ্যান্ডার কেউ মারলে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ব্লো টা আসত। কিন্তু এক্ষেত্রে ফাটলের ডাইরেকশন পুরো উল্টোদিকে। অর্থাৎ বাঁদিক থেকে ডানদিকে'।

'তার মানে যে মেরেছে সে লেফট হ্যান্ডার। হাতের ছাপটা খুনীর নয়!'

—'অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। কখনই খুনীর নয়'। ডঃ চ্যাটার্জী মাথা ঝাঁকালেন—'খুনী লেফট হ্যান্ডার বা লেফটি। তার হাইট মৃতব্যক্তির হয় কাছাকাছি, নয় আরও কয়েক ইঞ্চি

বেশি। মোটমাট সে মিনিমাম ছ'ফুট লম্বা। এবং সে কোনও বাচ্চা ছেলে নয়, সম্পূর্ণ পূর্ণবয়স্ক জোয়ান লোক'।

অফিসার লাহিড়ী ফের অধৈর্য হয়ে ওঠেন—'এমনও তো হতে পারে যে মৃতব্যক্তিকে যখন মারা হয় তখন তিনি বসেছিলেন। সেক্ষেত্রে হাইট যাই হোক, স্ট্রোকটা মাথাতেই পড়বে'।

–'ওহে হার্লক শোমস্'। ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী—'তুমি নিজেই করিডোর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছ। তুমিই বলেছ যে মৃতদেহ টেনে আনা হয়নি। করিডোরেই নিউরোলজিস্ট ভদ্রলোক আক্রান্ত হন। তাহলে করিডোরে তিনি বসবেন কোথায়? হ্যাঁ...হতে পারে হয়তো রাত বারোটার সময় তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

তাই করিডোরে 'হাম হাম গুড়ি গুড়ি' নৃত্য করছিলেন! অথবা 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার ব্যাটের তলার পরে' গাইতে গাইতে খুনীর ব্যাটের নীচে মাথা গুঁজে দিয়েছেন—তাই না?'

তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এডিজির দিকে তাকান—'আমি ঐ বাচ্চাটি সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। ছেলেটির বাবা তার মাকে বিষ দিয়ে খুন করেছিল। বাচ্চাটির নাম কুক্কু। আর ওর দাদার নাম পুপু। এই দুটি অনাথ ছেলেকে ঐ মিস্হ্যাপের পর আপনি নিজেই ডঃ চৌধুরীর অ্যাসাইলামে রেখে আসেন। ডঃ চৌধুরীর সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে। বাচ্চাদুটি এখনও তাদের মায়ের মৃত্যুর ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনও তারা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এছাড়াও ওখানে আরও কিছু বাচ্চা আছে, যারা এমনই দুর্ভাগ্যের শিকার। সর্বোপরি, ওটা কোনও আন্ডারওয়ার্ল্ডের গেট টু গেদার নয়—একটা মেন্টাল অ্যাসাইলাম। এইমুহূর্তে যদি আপনার এই অফিসারটি ওখানে গিয়ে তুর্কি নাচতে শুরু করে তবে কুক্কু ও পুপুর উপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে। তারা হয়তো আর কোনওদিন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে না। অ্যাসাইলামের অন্যান্য পেশেন্টদের উপরও ফলটা মারাত্মক হতে পারে'।

এডিজি একটু চিন্তিত মুখে কথাটা ভাবছিলেন। ডঃ চ্যাটার্জী কথাটা মিথ্যে বলেননি। বাচ্চারাই তো সমাজের ভবিষ্যৎ। শৈশব বড় সুন্দর আর স্পর্শকাতর। তাকে এভাবে তছনছ করে দেওয়া অমানবিক। তার উপর মানসিক রোগীদের উপরও এ একরকমের অত্যাচার! কিন্তু তদন্ত না করে বসেও তো থাকা যায় না!

—'আপনি কি করতে বলেন?'

প্রশ্নটা ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন এডিজি। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী গম্ভীর মুখে বলেন—'এটা একটা স্পেশ্যাল কেস। যেহেতু কয়েকটি শিশু আর একগাদা মেন্টাল পেশেন্ট এ কেসে জড়িয়ে আছে, সেহেতু হ্যান্ডল্ করাটাও কঠিন। আমার এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, নিজেই ভেবে দেখুন যে এখন কি করণীয়। গোয়েন্দা বিভাগের সেরা পালোয়ানটিকে পাঠাবেন? না সেরা গোয়েন্দাটিকে?'

ডঃ চ্যাটার্জী কথাটা বলেই আর দাঁড়ালেন না। এডিজিকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে দুর্বিনীতভাবেই গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। চলে যেতে যেতেই তার কানে গেল শিশির সেন ফোনে কাকে যেন বলছেন

-'হ্যালো.......হ্যাঁ...ব্যানার্জীকে একবার পাঠিয়ে দাও।......বলো আমি ডাকছি। ... কোন্ ব্যানার্জী মানে?... অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জী, আই জি-টু'.. ...।

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখে মৃদু হাসি ভেসে ওঠে। সেরা গোয়েন্দা নির্বাচনে তিনি এডিজি সেনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

—'স্ট্রেঞ্জ...এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ!'

অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জী গোটা কেসটাই খুব মন দিয়ে স্টাডি করছিল। সবার বিবৃতিগুলো পড়তে পড়তেই তার মুখ দিয়ে খসে পড়ল চির পরিচিত লব্জটা।

তার জুনিয়র অফিসার অর্নব এতক্ষণ ধরে পুলিশ রেকর্ড ঘাঁটছিল। তাকে স্যার কুক্কু ও

পুপুর রেকর্ড খুঁজে বের করতে বলেছেন। সে মন দিয়ে সেটাই খুঁজছিল। হঠাৎ শব্দটা শুনে মুখ তুলে তাকায়।

অধিরাজ তার এই নীরব দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারে। তার চোখ তখন অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ অর্নব? যে রাতে এক ভদ্রমহিলা 'খুন.........খুন...' করে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ক্লেম করলেন যে তাকে কেউ গদা হাতে মারতে আসছে—ঠিক সেই রাতেই খুনটা হল! তোমার কি মনে হয়? নিছকই কো-ইনসিডেন্স?'

অর্নব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে—'হতেও পারে স্যার। ভদ্রমহিলার ওটাই অসুখ। প্রায়ই নাকি রাতে বিছানায় উঠে বসে 'খুন...খুন...' করে চিৎকার করে ওঠেন।

-'হ্যাঁ'। সে অন্যমনস্ক স্বরে বলে—'আমিও সেটা জানি। বাট্, একটা পয়েন্ট তুমি মিস্ করলে। এর আগেও তিনি চেঁচিয়েছেন, , ভয় পেয়েছেন। কিন্তু একবারও খুনীর চেহারা বা গদার মত কোনও স্পেসিফিক মার্ডার ওয়েনের কথা বলেন নি। অথচ এবার বললেন। এটা আমি বলছি না। ডঃ চৌধুরী এই কথা প্রণবেশ লাহিড়ীকে তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন। অর্থাৎ এই ব্যাপারটা তাঁর মনেও স্ট্রাইক করেছে!'

–'তাতে কি?' অর্নব বুঝতে পারেনা যে স্যার কি বলতে চাইছেন।

—সেক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার হতে পারে'। অধিরাজ চিন্তিত মুখেই একটা সিগ্রেট ধরায়——হয় মহিলা জানতেন যে খুনটা এভাবেই হতে চলেছে। খুনীকে স্কোপ দেওয়ার জন্যই হল্লা বাঁধিয়েছিলেন। নয়তো তিনি আদৌ কোনও স্বপ্ন দেখেননি। খুনীকেই দেখেছেন। ব্যাটটা যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রথমেই গদার কথা মনে পড়ে। খুনী ব্যাট ঘাড়ে করে ঐ ঘরের সামনে দিয়েই হেঁটে গেছে'। সে বলল——সেডেটিভে আচ্ছন্ন থাকার দরুণ তিনি বুঝতে পারেননি যে ঘাড়ে করে কি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যাটটাকে তার গদা বলেই মনে হয়েছে'।

অর্নব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। খুনী ভদ্রমহিলার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে এ কথাটা তার অবিশ্বাস্য লাগছিল। ক্রিকেটব্যাট ঘাড়ে করে একটা দশাসই চেহারার লোক হেঁটে চলে গেল, -খুনও করে এল, অথচ কেউ দেখল না! কারুর অস্বাভাবিক লাগল না! এ কি সম্ভব!

প্রশ্নটা করতেই অধিরাজ চিন্তিত গলায় বলে——সেটাই প্যারাডক্স অর্নব! সেটাই একটা মস্তবড় প্যারাডক্স। তোমার প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক। এর একটা যুক্তিযুক্ত উত্তরও দিতে পারি। কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী সেটা সম্ভবই নয়!'

অর্নব নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে স্যারের দিকে। তাকে অদ্ভুত আবেশগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। স্যার যেন আস্তে আস্তে কোথাও ডুবে যাচ্ছেন।

–'ধরো একটা বাচ্চা ছেলে খাটের উপর উঠে লম্ফঝম্প করছে। লাফাতে লাফাতেই খাটটা হঠাৎ ভেঙে গেল'। অধিরাজ ধীরে ধীরে বলে—'তবে সেটা কারুর একটুও অস্বাভাবিক মনে হবে না। বরং ওটা লোকে অ্যাক্সিডেন্ট বলেই ভাববে। কিন্তু আমি যদি খাটের উপর উঠে লাফাতে শুরু করি আর তারপরই খাটটা ভেঙে যায়, তবে সেটা কেমন হবে?

অর্নব দৃশ্যটা কল্পনা করে কোনওমতে হাসি চাপল।

-'তাহলে লোকে আপনাকে পাগল ভাববে স্যার'।

–'শুধু পাগলই নয়—সবাই ভাববে যে খাটটা ভাঙার জন্যই আমি ইন্টেনশনালি লাফাচ্ছিলাম। কারণ একটা বাচ্চাছেলের পক্ষে যেটা মানানসই সেটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান। তাই লোকে আমাকেই সন্দেহ করবে—কিন্তু বাচ্চাটাকে করবে না'।

সে নাক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—'এ কেসেও সেটা হতে পারে। হতে পারে ব্যাটটা এমন কারুর ঘাড়ে ছিল যার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মানানসই। একটা ছ'ফুট লম্বা শক্তপোক্ত লোক যদি ঘাড়ে একটা ক্রিকেট ব্যাট বাগিয়ে হেঁটে যায় তবে সেটা একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য! এবং সেটা অনেকেরই চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু মনে করো

দৃশ্যটা যদি এরকম হয়,--একটা বাচ্চা ছেলে ঘাড়ে করে তার প্রিয় ক্রিকেট ব্যাটটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে-তবে?'

অর্নবের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। স্যার একদম মোক্ষম যুক্তি দিয়েছেন। একটা বাচ্চা ছেলে ঘাড়ে করে একটা ব্যাট নিয়ে গেলে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। হয়তো সে ঐ ব্যাট দিয়েই রোজ ক্রিকেট খেলে। ওটা তার খেলার উপকরণ। বেশিরভাগ লোকই সেক্ষেত্রে দেখলেও বিশেষ পাত্তা দেবে না—সন্দেহ করা তো দূর!

—'তাহলে সেই বাচ্চাটাই......'!

অধিরাজ হতাশভাবে মাথা নাড়ল—'নাঃ, ওখানেই কবি কেঁদেছেন! দুর্বাসা ফরেনসিক রিপোর্টে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে যে এটা কোনও বাচ্চা ছেলের কাজ হতেই পারে না। কারণ এক মারেই খুলি ভেঙে দেওয়ার মতো শারীরীক জোর কোনও বাচ্চা ছেলের নেই। তাছাড়া ভিকটিম ছ'ফুটের উপর লম্বা। তার মাথার নাগাল পাওয়াও একটা ছোট ছেলের পক্ষে দুষ্কর। দুর্বাসার এই ফরেনসিক রিপোর্টটাই একটা বিরাট প্যারাডক্সের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে'।

ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ অসীম চ্যাটার্জীকে অধিরাজ পিছনে দুর্বাসা বলে ডাকে।

অর্নব কিছুক্ষণ ভাবল। অনেক ভেবেচিন্তে বলল—'স্যার, এমনও তো হতে পারে যে ভিকটিম কোনও কারণে ঝুঁকে পড়েছিল। হয়তো কিছু কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। বা জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য। সেক্ষেত্রে হাইটটা কোনও ফ্যাক্টর নয়'।

অধিরাজ তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়—'গুড থিঙ্কিং অর্নব। তবে সেক্ষেত্রেও একটা 'কিন্তু' আছে'।

-'কি রকম?'

—'ধরো আমি তোমার সামনে ঝুঁকে পড়ে জুতোর লেস বাঁধছি বা কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই তুমি আমার মাথায় ব্যাটটা বসালে। সেক্ষেত্রে ব্যাটটা পড়বে মাথার পিছনদিকে বা ব্রহ্মতালুতে। অথচ ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে যে তা হয়নি। ব্লোটা পড়েছে একদম সোজাসুজি। কপালের দিকে'। মুখের ধোঁয়াটা গিলে ফেলেছে সে—— অর্থাৎ মারটা একদম সামনাসামনি এসেছে। একদম মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মারা হয়েছে ভদ্রলোককে। বাচ্চা ছেলের কাজ নয়, ঠান্ডা মাথার প্ল্যানিং।

—'ঠান্ডা মাথার প্ল্যানিং?'

—'নিশ্চয়ই'। সে অ্যাসাইলামের বিল্ডিঙের প্ল্যানিংটা টেবিলের উপরে মেলে ধরল--'এই দ্যাখো, এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের নকশা। আট নম্বরের ঘরের যে মহিলা চেঁচামেচি করে উঠেছিলেন তার ঘরটা সিঁড়ির ডানদিকে। আর মার্ডার স্পটটা বাঁদিকে। যদি খুনী সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নীচে নেমে আসে তবে আট নম্বর ঘরটা তার উলটো ডাইরেকশনে। ওদিক দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কোনও দরকারই পড়ে না। আট নম্বরের ব্যক্তিটির তাকে দেখার সুযোগই নেই। বরং তার আসার কথা বাঁদিকের করিডোর ধরে। তবে সে খামোখা আট নম্বরের সামনে গেল কেন?'

সত্যিই তো! একথাটা অর্নবের মাথায় আগে আসেনি। আট নম্বর ঘরের দিকে না যাওয়াটাই বরং স্বাভাবিক। যে খুন করতে চলেছে সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী রাখার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কেন?

—এটাও আরেকটা প্যারাডক্স'। অধিরাজ বলে—'এক্ষেত্রে আট নম্বরের পেশেন্টকেও ক্লিনচিট দেওয়া যাচ্ছে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনিও এর সাথে জড়িত। হয়তো খুনী আট নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারা করে হল্লা বাঁধাতে বলেছিল। অথবা...'।

—'অথবা?'

——খুনী চাইছিল যে মহিলা তাকে দেখুন। ভদ্রমহিলার কেস হিস্ট্রি তার সম্পূর্ণ জানা। সে আট নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে এমনভাবে ঘাড়ে ব্যাট নিয়ে হেঁটে গেল-যাতে ভদ্রমহিলা ভয় পান। এবং একজন আতঙ্কে ভোগা পেশেন্টের পক্ষে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক

সেইরকমই 'খুন..........খুন...' করে চেঁচিয়ে ওঠেন। এর ফলে গ্রাউন্ডফ্লোরের সবাই সেদিকেই ছুটে যাবে। ডাক্তার-নার্সরাও তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। করিডোরের উল্টোদিকটা পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে। সেই সুযোগেই ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতো সে খুনটা করে বেরিয়ে গেল'। অধিরাজ অল্প অল্প হাসে—'একে তুমি ঠান্ডা মাথার প্ল্যানিং ছাড়া আর কি বলবে?'

অর্নব অভিভূত! স্যার যেভাবে গোটা ঘটনাটা এক্সপ্লেইন করছেন, তাতে মনে হয় যেন তিনি সবটাই নিজের চোখে দেখেছেন!

অধিরাজ অবশ্য তার মুগ্ধ চাউনি লক্ষ্য করে না। সে যা বলছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত অনুমান যাত্র। এর মধ্যেও অনেক ফাঁকফোকর আছে। সে আস্তে আস্তে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরছিল।

প্রথমত, আট নম্বরের মহিলাটির ভূমিকা কি? তিনি কি খুনীর সহযোগী? যদি তাই হয় তবে, তার 'কমলা রঙের জামা'র কথাটা মিথ্যে। কিন্তু যদি না হন? তবে কমলা রঙের জামাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র!

দ্বিতীয়ত, চিরঞ্জীব মিত্র কি বলতে চেয়েছিলেন? তাঁর কিছু সন্দেহ ছিল।' ঐ দুশো তিনের...' অবধিই বলতে পেরেছিলেন। বাকিটা বলার আগেই খুন হয়ে গেলেন। এই সন্দেহই কি তাঁর কাল হল? কি সন্দেহ ছিল তাঁর? কথাটা ঠিক কি ছিল? ঐ দুশো তিনের কি? ওটাই কি খুনের মোটিভ?

তৃতীয়ত, খুনী ডঃ মিত্রকে কেবিনেই মারতে পারত। কিন্তু তা না করে সে ভদ্রলোকের বাইরে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করল কেন? সে কি জানত ঠিক তখনই ডঃ মিত্র বেরিয়ে আসবেন? কি করে জানল?

চতুর্থত, দুশো তিন ঘরের কুক্কুর চুল কাটতে এত আপত্তি কেন? এই কেসের সাথে তার এই আতঙ্কের কি কোনও যোগ আছে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিজেকে করে যাচ্ছিল অধিরাজ। কিন্তু কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়ে মনে মনে ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছে। এভাবে ভাবতে শুরু করলে সাসপেক্টের তালিকা ক্রমাগতই বাড়ে। ডাক্তার-সিস্টার ওয়ার্ডবয়দের ও সন্দেহ হতে শুরু করে। যে কেউ খুনটা করতে পারে। এমনকি কুক্কুর পক্ষেও অন্য কারুর সাহায্য নিয়ে খুন করা সম্ভব! আট নম্বরের প্রত্যক্ষদর্শীকে ছাড়া যাচ্ছে না। ছাড়া যাচ্ছে না চারতলার সাইকো কিলারদেরও!

আরও কতক্ষণ এভাবেই প্রশ্নে প্রশ্নে নিজেকে জেরবার করত কে জানে। কিন্তু ফুরিয়ে আসা সিগ্রেটের ছ্যাঁকা আঙুলে লাগতেই সম্বিৎ ফিরল।

সদ্য ঘুম ভাঙা মানুষের মতো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে। পূর্ণদৃষ্টিতে অর্নবের দিকে তাকিয়ে বলে—'কুক্কু আর পুপুর রেকর্ড খুঁজে পেলে?'

–'পেয়েছি স্যার'। অর্নব কম্পিউটারের উপর চোখ রেখেছে—'কেসটা ক্রিটিক্যাল। কুক্কু আর পুপুর মা দময়ন্তী সেন সম্পর্কে বিশেষ ডিটেলস জানা যায় না। তার প্রাক-বিবাহ জীবনের কথা কেউ বলতে পারেনি। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি আগেও বিবাহিতা ছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী তপন কুমার সেন দিল্লীর নামকরা বিজনেসম্যান ছিলেন। একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে। পুপু তাঁরই সন্তান। এই পর্যন্তই'।

–'মানে পুপু ভদ্রমহিলার প্রথম পক্ষের সন্তান'।

—'হ্যাঁ স্যার। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা ভদ্রমহিলা দিল্লী থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সো পুপু-ও।

কলকাতায় এসে কসবার এক হাউজিং কমপ্লেক্সে ওঠেন। সেখানেই এক ডিভোর্সি বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের সাথে পরিচয়, এবং দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁর দ্বিতীয় স্বামীরও প্রথম পক্ষের একটি ছেলে। সে-ই কুক্কু। পুপু কুক্কুর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়'।

–'আই সি! মানে পুপু ও কুক্কু স্টেপব্রাদার'।

-'হ্যাঁ'।

–'বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের নাম কি?'

–'অসিত চ্যাটার্জী।

অধিরাজের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। এই কেসে একজন বিজ্ঞানীও ঢুকে পড়লেন!

--'তারপর?'

–'তারপরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। বিয়ের ছ'মাস পরেই হঠাৎ একদিন গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রাইটিসে মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সন্দেহ হল। দময়ন্তীর পেটের সমস্যা ছিল। কিন্তু একেবারে মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। তিনি পুলিশে খবর দিলেন। পোস্টমর্টেমে বিষের ট্রেস মিলল। তারপরই পুলিশ অসিত চ্যাটার্জীকে গ্রেফতার করে। অফিসার পবিত্র আচার্য'র মতে ভদ্রমহিলার প্রথম স্বামী বিরাট বিজনেসম্যান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সেই ব্যবসা ও প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারিনী হয়েছিলেন দময়ন্তী। সেই লোভেই দ্বিতীয় স্বামী তাঁকে খুন করেন। এর বেশি আর কিছু নেই'।

—বেশ!' অধিরাজ চিন্তিত—'ভদ্রমহিলার মৃত্যু হলে সম্পত্তিটা তাঁর দ্বিতীয় স্বামীরই পাওয়ার কথা। তাই তো?'

-'হ্যাঁ স্যার'।

–'আর ভদ্রলোকের যাবজ্জীবন বা ফাঁসি হলে উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের টাকা পুপু আর বাবার যাবতীয় সব কুক্কু পাবে'।

–'হ্যাঁ। পুপুর বয়েস বারো বছর হলেও সে এখন কোটিপতি'!

–'অসিত চ্যাটার্জীর ছবি আছে?'

--'আছে'।

কম্পিউটারের মনিটরটাকে সামান্য ঘুরিয়ে দিল অর্নব। অধিরাজ মনিটরে চোখ রেখেছে।

-'স্ট্রেঞ্জ!'

তার মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়। সে খুব মন দিয়ে ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল—'ঠিক আছে অর্নব। তুমি আজকের মতো কেটে পড়ো। কাল দেখা হবে'।

অর্নবের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অধিরাজ। যদিও এ কেসের সাথে আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনার তেমন কোনও যোগাযোগ নেই। তবু একবার দুর্বাসার সাথে তাকে দেখা করতেই হবে!

২

ডঃ চ্যাটার্জী নিজের ল্যাবে চুপ করে বসেছিলেন। আজ তার মুড চূড়ান্ত খারাপ! তার অ্যাসিস্ট্যান্টরা এদিকে ওদিকে ঘুরে ব্যস্তভাবে কাজ করে বেড়াচ্ছে। স্যারের মেজাজ আজ সপ্তমে। তাই ভয়ের চোটে পারতপক্ষে কেউ ভদ্রলোকের সামনে আসছে না।

তাদের মধ্যেই একজনের কপালে হয়তো দুঃখ ছিল। তাই সে একটা রুমাল এভিডেন্স ব্যাগে ভরে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল।

—'স্যার, এটাকে কি করবো?'

ডঃ চ্যাটার্জীকে চিন্তিত লাগছিল। ভীষণ ক্লান্তও বোধ করছিলেন। তার উপর এইরকম কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

-'আমার টাকে রাখো! কি করতে বলা হয়েছিল তোমায়?'

সে বেচারা তোৎলাতে তোৎলাতে বলে—'না...মানে...প্যারাফিন টেস্ট করার কথা ছিল...'

—'তবে সেটাই করো'। তিনি প্রায় একশো কুড়ি ডেসিবেলে চেঁচিয়ে উঠেছেন—'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? আমার মুখটা কি প্যারাফিন কনটেনার?'

-'না...মানে...! ভয়ের চোটে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সে ঢোঁক গিলল—'প্যারাফিন টেস্টে তো কিছু পাওয়া যায় নি'।

-'না পাওয়া গেলে রিপোর্টে তাই লেখো'। ডঃ চ্যাটার্জী আরও চটেছেন—'আমার নাকের সামনে এনে নাড়ছ কেন? এটা দিয়ে কি আমি নাক মুছবো?

- 'ওকে স্যার'।

সে প্রায় ওখান থেকে পালিয়েই বাঁচল। ডঃ চ্যাটার্জী বিড়বিড় করে বললেন—'অপদার্থ কোথাকার! কোথা থেকে যে এসে জোটে!...'

বলতে বলতেই থেমে গেলেন। অধিরাজ ফরেনসিক ল্যাবের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে। দ্রুত পায়ে এদিকেই আসছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

অধিরাজ তার সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে। টেবিলের উপর ডঃ চ্যাটার্জীর সিগ্রেটের একটা আস্ত প্যাকেট পড়েছিল। সে কথা নেই বার্তা নেই খপাৎ করে প্যাকেটটা তুলে নেয়।

—'একটা সিগ্রেট খেতে এলাম ডঃ...'

ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় খামচা মেরেই তার হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিয়েছেন—'মামাবাড়ি পেয়েছ? এ কি তোমার বাপের মৌরসী নাকি! একটা সিগ্রেটেও যদি হাত দাও তবে এক্ষুনি কান ধরে এখান থেকে বের করে দেবো!'

এইজাতীয় সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনেও অধিরাজ রাগ করল না! বরং শান্তভাবে বলে—'সরি ডক্টর, কিন্তু আপনার কার্টসির যদি এই নমুনা হয় তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পুপু আর কুক্কুকে বাঁচানো সম্ভব নয়!'

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখের রক্ত কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। তার আগের উগ্রতা একমুহূর্তেই লোপ পেয়েছে। কোনমতে বলেন—'তাতে আমার কি? আমার যা করণীয় তা করেছি। ফরেনসিক রিপোর্ট তোমার কাছে আছে'।

—'উঁহু.....উঁহু.......' সে যাথা নাড়ল—'ফরেনসিক রিপোর্টের চেয়েও অনেক বেশি কিছু আপনি করেছেন। ছেলেদুটি সম্পর্কে রীতিমতো রিসার্চ করেছেন। এত কেসের ভিড়েও ছেলেদুটির নাম আপনার স্পষ্ট মনে আছে। ভাবা যায় না! অফিসার লাহিড়ীর হাত থেকে কেসটা খুব সুকৌশলে সরিয়ে এনে আমার টেবিলে রেখেছেন। অফিসার লাহিড়ী বাচ্চাটাকে গ্রেফতার করতেন। কিন্তু আপনি সেটা হতে দিলেন না। ঐ বাচ্চাটার উপর আপনার এত অনুগ্রহ কেন জানতে পারি?'

—'এই প্রশ্নটা করার জন্যই কি তোমার এখানে আগমন?'

—'নাঃ, প্রশ্নটা আরেকটু গুরুতর'। অধিরাজ হিমশীতল গলায় বলে—'আপনার ভাই

অসিত চ্যাটার্জী যে একজন খুনী আসামী সে কথা চেপে গেলেন কেন?'

ডঃ চ্যাটার্জী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে উঠলেন। তার ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে থাকলেন। যেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

অধিরাজ তাকে গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিল। সে চুপ করে বসে থেকে ডঃ চ্যাটার্জীর উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। এই সব ব্যাপারে তার ধৈর্যের অভাব নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'অদৃষ্ট! আমার বোঝা উচিৎ ছিল যে তুমি ঠিক ধরে ফেলবে।

–'পুপুর স্টেপফাদার ও কুক্কুর বাবা বিজ্ঞানী অসিত চ্যাটার্জীর চেহারার সাথে আপনার হুবহু মিল। শুধু টাকটাই যা পার্থক্য। তাই না বোঝার কোনও কারণই নেই'।

—'এখানে নয়'। তিনি আস্তে আস্তে বলেন—— বাইরে চলো। সব খুলে বলছি'।

দুজনেই ল্যাব ছেড়ে চলে এলেন ছাতে। একটু একান্ত, নিভৃত কোণ খুঁজে নিয়ে ডঃ চ্যাটার্জী সব কথা খুলে বললেন---

–'অসিত আর আমি টুইনস্। আমি অসিতের চেয়ে দু মিনিটের বড়। দেখতে প্রায় একইরকম। কিন্তু স্বভাবে একদম উলটো। আমি এদিকে সারাজীবন মড়া ঘেঁটে ঘেঁটেই কাটিয়ে দিলাম। অন্যদিকে অসিত বিয়ে করল। ওদের একটি ছেলেও হল। আমিই আদর করে বাচ্চাটার নাম রেখেছিলাম কুক্কু। ছেলেটির বয়স যখন তিন বছর তখনই ওকে শেষ দেখি। এরপরই অসিত সস্ত্রীক হায়দ্রাবাদে সেটলড্ হল। ওখানেই রিসার্চ করছিল ও'।

-'হুঁ'।

ডঃ চ্যাটার্জী একটু থেমে ফের বললেন—'আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ কমে গেল। পরের দিকে ওর সাথে আর তেমন কন্ট্যাক্ট ছিল না। শুধু দুবছর আগে শুনেছিলাম যে ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে'। তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে—'অবশ্য অসিত যে ধরণের লোক, তাতে ওর বিয়ে করাটাই অস্বাভাবিক। তাই ডিভোর্স হওয়ার কথা শুনে অবাক হইনি'।

–'যে ধরণের লোক মানে?' অধিরাজ উৎসুক—'কি ধরণের লোক?

— অসিত এমন একটা মানুষ যার সবচেয়ে ভালো স্ত্রী হতে পারে মাইক্রোস্কোপ! যার মাথায় সর্বক্ষণ বিষাক্ত কেমিক্যাল আর জীবাণু গিজগিজ করছে তার সাথে টিঁকবে এমন কোন হিউম্যান বিইং আমার জানা নেই!' অসীম চ্যাটার্জী বললেন—'যে লোক দুই পায়ে দুরকম জুতো পরে, উলটো শার্ট পরে বেরিয়ে যায়, কোন ফ্লোরে নিজের ফ্ল্যাট সেটা গুলিয়ে ফেলে, ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে মাঝপথেই ভুলে যায় যে সে কি করতে যাচ্ছিল, এবং সটান বাড়ি ফিরে আসে, তার সাথে সংসার করবে এমন মহিলা অন্তত এই বিশ্বে আছে বলে মনে হয় না'।

সে হেসে ফেলল—'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার!'

–'অসিতের বিয়ে করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল! আরও আশ্চর্যের কথা যে ঐ একই ব্লান্ডার সে আবার করল! হঠাৎ একদিন নিজেই ফোন করে বলল যে ও কলকাতায় ফিরে এসেছে। কোন্ ধনকুবেরের বিধবা স্ত্রীকে যেন বিয়ে করবে। ভদ্রমহিলার এক ছেলেও আছে। এইটুকুই জানতাম। ওর নতুন বৌ বা ছেলেকে কখনও দেখিনি'।

–'হুঁ'। অধিরাজ মন দিয়ে তার কথা শুনছিল—'তারপর?'

ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ জলে ভরে আসে—'তারপর আর কিছু জানিনা। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার বডি ফরেনসিক ল্যাবে এসে পৌঁছল। লক্ষণগুলো গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রাইটিসের হলেও রিপোর্টে বিষ ধরা পড়ে। কেসটা পবিত্র আচার্যর আন্ডারে ছিল। ওকে রিপোর্ট দেওয়ার সময়ে কি আর জানতাম যে নিজের ভাইয়ের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরাচ্ছি!'

অধিরাজ সহানুভূতি মাখা দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছে। ডঃ চ্যাটার্জীর মতন কঠোর, বদমেজাজী লোকও হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। তিনি অসহায়ের মত অধিরাজের দু হাত চেপে ধরলেন।

—'রাজা, আমি ভাইকে হারিয়েছি! যদিও ওর মতো লোক কাউকে বিষ দিয়ে খুন করবে

একথা আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আইন বিশ্বাসের কথা শোনে না। প্রমাণ চায়। আমি নিজেই আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ আইনের হাতে তুলে দিয়েছি। কুক্কু পুপুকেও নিজের কাছে রাখতে পারিনি। আমারই অক্ষমতা। একা থাকি। তাও বেশিরভাগ সময়ই ল্যাবে কাটে! বাচ্চাদুটোকে কে দেখত? কিন্তু কুক্কু আমার একমাত্র ভাইপো....... ওর বাবাকে আমিই জেলে পাঠিয়েছি...এখন ওকে সবাই খুনী ভাবছে...ওকে তুমি বাঁচাও রাজা...বাঁচাও ওকে...একমাত্র তুমিই পারো...আমার বিশ্বাস......!!

বলতে বলতেই তিনি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। অধিরাজ তাকে জাপ্টে ধরে বুকে টেনে নিয়েছে। তার সবল আশ্রয়ের মধ্যে থরথর্ করে কাঁপছেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আন্তরিক ভাবে বলল অধিরাজ

–'আমি চেষ্টা করবো ডক্টর। কিন্তু আপনাকেও একটু কষ্ট করতে হবে'।

ডঃ চ্যাটার্জী ধাতস্থ হতে একটু সময় নিলেন। ক্ষণিকের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বললেন—'কি করতে হবে?'

-'আগে আমায় নিশ্চিন্ত করুন যে, ফরেনসিক রিপোর্টটা একদম ঠিক আছে। আপনি অফিসার লাহিড়ী বা এডিজি সেনের কাছে কিছু চেপে যাননি তো?'

ডঃ চ্যাটার্জীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে—'ডিউটির ক্ষেত্রে আমার ইমোশন কাজ করে না।

–'ফাইন'। সে হাসল—'এবার একটু রেকর্ড ঘেঁটে বলতে হবে যে আপনার ভাইয়ের স্ত্রী ঠিক কোন বিষে যারা গিয়েছিলেন'।

–'রেকর্ড ঘাঁটার দরকার নেই'। তিনি ভাঙা ভাঙা স্বরে বলেন—'আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওকে থ্যালিয়াম স্লো পয়জনিং করা হয়েছিল'।

–'থ্যালিয়াম?' তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'শিওর?'

–'টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর'। তিনি জোর দিয়ে বললেন—'থ্যালিয়ামই'।

—'আচ্ছা'। অধিরাজ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে—'মার্ডার ওয়েপনটা আপনার কাছেই আছে না? ব্যাটটা আমি ফেরৎ পাইনি'।

—'ওঃ গড!' ডঃ চ্যাটার্জী কপাল চাপড়ালেন—'ওটা দিতে একদম ভুলে গিয়েছি।ঐ রাবণ লাহিড়ীটার লম্ফঝম্পের চোটে মিস হয়ে গেছে। ল্যাবেই আছে বোধহয়। চলো, এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি'।

দুজনেই ফের ফরেনসিক ল্যাবে ফিরে এলেন। ডঃ চ্যাটার্জীর হাত তখনও অল্প অল্প কাঁপছে! তবে আগের ধাক্কাটা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। এভিডেন্স ব্যাগ থেকে ব্যাটটা বের করে এগিয়ে দিলেন।

অধিরাজ ততক্ষণে হাতে গ্লাভস পরে নিয়েছে। ব্যাটটাকে সে উলটে পালটে দেখছে। শক্ত কাঠের নতুন ব্যাট। দিব্যি মসৃণ বার্নিশ করা। ওজনে বেশ ভারি। জিনিসটাতে এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে।

—'স্ট্রেঞ্জ!'

অধিরাজ অবাক হয়ে ব্যাটটাকে দেখছে। তার মুখে প্রথমে বিস্ময়ের ছাপ প্রকট হয়ে উঠল। —'এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ!'

এবার আস্তে আস্তে একটা হাসির রেশ ছড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠেছে। তার অট্টহাস্যে ডঃ চ্যাটার্জী নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। অ্যাসিস্ট্যান্টরাও কাজ থামিয়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

কিন্তু অধিরাজের সেদিকে খেয়ালই নেই। সে প্রথমে পাগলের মত একচোট খুব হাসল। তারপর অতিকষ্টে অট্টহাসি থামাল বটে, কিন্তু আপনমনে তখনও ফিকফিক করে হেসেই চলেছে।

–'এত হাসির কি হল?"

সে ফিকফিক করে হাসতে হাসতেই বলে—'আমি হাসছি খুনীর রসিকতায়। আমাদের খুনী মহোদয় সত্যিই রসিক মানুষ'।

বলেই সে আবার পাগলের মত হাসতে শুরু করেছে।

তিনি রাগতস্বরে বলেন—‘মাথায় পড়লে বুঝতে যে কেমন রসিকতা!’

–‘বেগ ইওর পার্ডম্’। অধিরাজ অতিকষ্টে হাসি চাপে—‘কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! এই ব্যাটটা নিয়ে এত লাফালাফি—এত সাতকান্ড রামায়ণ! অথচ আপনাদের কারুর চোখেই পড়ল না যে সীতা কার বাপ!'

—‘সীতা এর মধ্যে কোথা দিয়ে এলো!’

সে আবার হেসে ফেলেছে—‘বেচারা নিরীহ ব্যাট! এটা মার্ডার ওয়েপ্‌ই নয়!’

ডঃ চ্যাটার্জী হাঁ—'কি বলছ!’

–‘ঠিকই বলছি’। অধিরাজ ব্যাটটা তুলে নিয়েছে—'এ জাতীয় ব্যাট মাথায় তেমনভাবে পড়লে মাথার খুলি দু টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের মাথার খুলিও তেমন নরম জিনিস নয়! খট্ করে মারলাম আর ফট্ করে ভেঙে গেল! নিউটনের থার্ড ল পড়েননি? সব ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। ব্যাটটা জোরে মারা হল। মাথার খুলি ভাঙল। কিন্তু তারপর?’ সে বলল—‘শুধু খুলি নয়, ব্যাটটাও ভাঙবে। না ভাঙুক, চিড় বা ফাটল ধরবে। যদি ধরেও নিই যে এ একেবারে মহাশক্তিধর ঐশ্বরিক ব্যাট, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এটা দিয়ে ডাংগুলি খেলতেন ইত্যাদি ইত্যাদি—তা সত্বেও ছাল চামড়া উঠবে, নিদেনপক্ষে একটা আঁচড় তো পড়বেই'।

অধিরাজ ব্যাটটা এগিয়ে দিয়েছে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে—‘বিশ্বাস না হয়, নিজেই ভালো করে দেখে নিন। একদম ঝকঝকে তকতকে নতুন ব্যাট। চমৎকার বার্ণিশ করা। একটা স্ক্র্যাচও নেই গায়ে। একদম আনইউজড! এটা কি আদৌ সম্ভব!’

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ বিস্ময়ে লম্বাটে! তিনি আতশকাঁচ দিয়ে ভালো করে দেখলেন ব্যাটটা। সত্যিই! একটা আঁচড়ও নেই গায়ে—ফাটল তো দূরের কথা!

–‘তাহলে ব্যাটের গায়ে যে রক্ত আর চুল পাওয়া গেল!’ তিনি স্তম্ভিত।

–‘ওটা কেউ রসিকতা করে লাগিয়ে দিয়েছে। সে আবার হেসে উঠেছে—‘যাতে ঐ রক্ত আর চুল নিয়েই আপনারা ব্যস্ত থাকেন।আর সে আসল মার্ডার ওয়েপনটা এর মধ্যেই হাপিশ করে ফেলতে পারে'।

–‘স্টুপিড!’ নিজেকেই নিজে গাল দেন ডঃ চ্যাটার্জী—‘তাহলে এখন কি হবে?’

–‘আপাতত যা বুঝেছি তাতে ওখান থেকে পুলিশের নজরদারি তুলে দিতে হবে। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তবে আসল মার্ডার ওয়েপনটা এখনও ওখানেই কোথাও আছে। হয়তো সবার চোখের সামনেই আছে। অথবা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিছুদিন ধরে যেরকম পুলিশি উৎপাত চলছে তাতে অস্ত্রটা একদম লোপাট করে ফেলার সুযোগ খুনী পায়নি। ওটাই সবার আগে খুঁজে বের করা দরকার। এবং তার সাথে ওখানকার পেশেন্টদের নাজেহাল অবস্থা থেকে উদ্ধার করাও জরুরী। আফটার অল তারা মেন্টাল পেশেন্ট'।

—‘পুলিশি নজরদারি তুলে নিলে ওটা খুঁজে বের করবে কে? তুমি?'

–’এনি ডাউট?’ অধিরাজ অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করেছে।

–‘তাহলে আর পুলিশি নজরদারি উঠল কই?’ ডঃ চ্যাটার্জী বললেন —যেখানে স্বয়ং অফিসার অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় সশরীরে উপস্থিত, সেখানে বড়জোর হম্বিতম্বিটা কমবে। কিন্তু মানসিক চাপ, টেনশন সেই একই!'

–'কে বলল যে অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জী ওখানে ঢুকবেন?’ সে রহস্যময় হাসি হাসে —' -'মানবিকতা শুধু আপনার একারই নেই ডঃ চ্যাটার্জী। আমারও অল্পস্বল্প আছে। ওখানে যিনি উপস্থিত থাকবেন তিনি অধিরাজ ব্যানার্জী নন্। অধিরাজ ব্যানার্জীর এক অবতার যাত্র!'

–‘অ’! তিনি আশ্বস্ত হন—'বুঝলাম। কিন্তু ওখানে ঢুকবে কি করে?'

—‘আমি ঢুকবো না’। তার চোখে কৌতুক নেচে ওঠে —আপনি আমায় ঢোকাবেন। ওখানে প্রবেশের পাসপোর্ট তো আপনার হাতের মুঠোয়! ডঃ মনোহর চৌধুরীর সাথে

আপনার ভালো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব খুব কাজের জিনিস'।

ডঃ চ্যাটার্জী কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন—'বেশ, তাই হবে'।

-'আর হ্যাঁ...' অধিরাজ চলে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ায়—'আপনার যমজ ভাইয়ের ছবি দেখে কথাটা মনে হল। আপনি উইগ পরেন না কেন? উইগ পরলে আপনাকে খানিকটা ইয়ং দেখাবে। পারলে কয়েকটা ভালো জাতের বিদেশি উইগ কিনে রাখুন। জাস্ট আ সাজেশন'।

বলেই সে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ল। ডঃ চ্যাটার্জী রেগে গিয়ে প্রায় নাচতে শুরু করলেন—' কি! আমার টাক নিয়ে ইয়ার্কি! দেখে নেবো!...ফিচেল ছোঁড়া!... আমার টাক নিয়ে ফিচলেমি!...খুন করে ফেলবো...একদম খুন করে ফেলবো!...পাজি বাঁদর কোথাকার!...'

কিছুক্ষণ লাফালাফি করার পর খানিকটা ঠান্ডা হলেন তিনি। মোবাইল ফোনে ধীরেসুস্থে একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

-'হ্যাঁ...হ্যালো...নটরাজ?... অসীম চ্যাটার্জী বলছি...আমার কয়েকটা খুব ভালো জাতের বিদেশি উইগ লাগবে...কতগুলো সঠিক বলতে পারব না...যতগুলো সম্ভব রাখো...দাম ফ্যাক্টর নয়...কিন্তু একদম আসলের মত চাই...হ্যাঁ...আমি দোকানে গিয়ে নিজে বেছে নেব...ওকে...'।

কথা শেষ করে ফোনটা কেটে দিতে দিতেই লক্ষ্য করলেন তার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা সবাই হাঁ করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

প্রায় বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জী—— কি দেখছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাব প্রায় ফাঁকাই হয়ে গেল!

৩

ডঃ মনোহর চৌধুরীর উপর দিয়ে অসম্ভব চাপ যাচ্ছিল। একেই তার অ্যাসাইলামে একটা খুন হয়ে গেল। তার উপর পুলিশের দফায় দফায় জেরার চোটে জেরবার হয়ে পড়ছিলেন তিনি। আশঙ্কা ছিল যে এই খুনের ঘটনা ও পুলিশি অত্যাচারের ফলে রোগীরা হয়তো আরও অস্বাভাবিক, উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্য তেমন কিছু হয়নি।

এখন পুলিশি হাঙ্গামা নেই। কিন্তু আতঙ্কের ছাপ সর্বত্র পড়েছে। পেশেন্টরা রাতের বেলায় ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছেই না। এমনকি সিস্টার-ওয়ার্ডবয়-ডাক্তাররাও ঐ করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে ভয় পাচ্ছে!

আজ আবার সকাল থেকেই প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন যে আগামী বাহাত্তর ঘন্টা এমনই ঝড় বৃষ্টি চলবে। কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধ লোক বোধহয় ঠিকই করেছে যে এখনই, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে এই অ্যাসাইলামে এসে ঢুকতেই হবে। ঠিক এই মুহূর্তেই রোগীর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত মোট তিনজন রোগী এসে ঢুকেছে।

প্রথমজন পজেজড কেস। সম্ভবত স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট। বছর আঠাশ কি তিরিশের হবে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল। দেখতে শুনতে মোটের উপর ভালোই। তার উপর নাকি 'মহাদেব' ভর করেছেন!

দ্বিতীয়জন আবার মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত! সে মাঝেমধ্যেই নিজেকে এক একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ভাবতে শুরু করে! তাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যায়। এ পেশেন্টটিও বয়েসে যুবক। ত্রিশের কোঠা এখনও পেরোয় নি। এর আগে সে নিজেকে নেপোলিয়ন ভাবছিল। বর্তমানে 'অ্যাডল্ফ হিটলার' ভাবতে শুরু করেছে। উদ্ভট তার সাজপোষাক! চেহারাটিও ততোধিক উদ্ভট! হিটলারের মতোই একটা মাছি গোঁফও আছে, যদিও সেটা নকল বলেই মনে হয়। কথায় বার্তায় প্রায় হিটলারি ভাব!

প্রথমে তো তাকে কিছুতেই এখানে ঢোকানো যায় না! সবই নাকি ইহুদীদের চক্রান্ত! রীতিমতো মারদাঙ্গা হওয়ার

৩.

উপক্রম। শেষপর্যন্ত ডঃ অমিতাভ খাসনবিশকেই মাঠে নামতে হল। তিনি আবার এই জাতীয় রোগের এক্সপার্ট। সোজা গিয়ে রীতিমত অভিবাদন জানিয়ে বললেন—'হের হিটলার, আপনার জন্য নাৎসীবাহিনী ভিতরে অপেক্ষা করছে'।

তবেই সে ঢুকল!

তৃতীয়জনের বয়েস বোঝা দায়। চেহারা দেখলে চল্লিশের কাছাকাছি বলেই মনে হয়। কিন্তু হাবভাব আশি বছরের বুড়োর মত। তিনি অবশ্য পূর্বপরিচিত। তার প্রবলেম 'সাইকাসথেনিয়া'। মানুষটির ধারণা যে তিনি কোনও কাজেরই উপযুক্ত নন। যে কোনও সময়েই কাজে মারাত্মক ভুল করে বসতে পারেন। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবেন ভেবে পান না। সবসময়ই কনফিউজড়।

এই তিনজন পেশেন্ট সকালেই এসেছে। বিকেলে আরও দুজনের এসে পৌঁছনোর কথা। 'কেয়ার অ্যান্ড কিওর' নার্সিংহোমের ডঃ সিঙ্ঘানিয়া এক যুবকের রেকর্ড ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছেন। ছেলেটির রোগ ডিপ্রেশন। সে আবার সুইসাইডাল মেন্টালিটির লোক। ইতিমধ্যেই একবার কুড়িটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে। অনেক কষ্টে তাকে প্রাণে বাঁচানো গেলেও ছেলেটির মানসিক ভারসাম্য নিয়ে ডঃ সিঙ্ঘানিয়া চিন্তিত।

আরেকজন আবার আরেক 'সাইকো কিলার'। একে পাঠাচ্ছেন এডিজি শিশির সেন। খুনী আসামীটি হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গিয়ে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে খুন করে ফেলেছে! তার বক্তব্য যে বাড়ির সবকটা লোকই নাকি তাকে মারার ষড়যন্ত্র করছিল। তাই আত্মরক্ষার্থে সবাইকে খুন করেছে সে!

উপরোক্ত দুজনেরই বিকেলে এসে পৌঁছনোর কথা। একজন ডঃ সিঙঘানিয়ার পেশেন্ট। অন্যজন সাইকো। দুজনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এন্ট্রির সমস্ত ব্যবস্থাপনাই করতে হবে ডঃ চৌধুরীকে। তাই তিনি রাউন্ডেও বেরোতে পারছেন না। যে কোনও মুহূর্তে একটা অ্যাম্বুলেন্স বা প্রিজন ভ্যান এসে পৌঁছতে পারে। তাদের অপেক্ষাতেই কেবিনে বসে আছেন ডঃ চৌধুরী। আর বারবার অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছেন।

-'স্যার...'

বিনয় শশব্যস্তে এসে ঢুকল। তার ঢোকার ভঙ্গিটা বেশ সন্ত্রস্ত।

—'পেশেন্ট এসেছে?' অনিবার্য শব্দদুটো ছুঁড়ে দিয়েছেন ডঃ চৌধুরী।

বিনয় মাথা নাড়ল—'না স্যার। পেশেন্টরা আসেনি। তবে এক ভদ্রলোক এসেছেন। আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন'।

–'এক ভদ্রলোক! নাম কি?'

–'অর্চিষ্মান দত্ত'। সে জানায়—'বললেন যে ডঃ অসীম চ্যাটার্জী তাকে পাঠিয়েছেন। ইন্টার্নশিপের জন্য কথা বলতে চান'।

ডঃ চৌধুরী সচকিত হয়ে উঠলেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ অসীম চ্যাটার্জী এই ছেলেটির কথা তাকে আগেই বিশেষ করে ফোনে বলে দিয়েছেন।

-কোথায় সে?

–'বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন'।

–'বাইরে কেন?' ডক্টর রেগে গেছেন—'এই বৃষ্টির মধ্যে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ! এক্ষুনি ভেতরে নিয়ে এসো...যাও...এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এসো তাকে...

কথাটা বলতে বলতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিনয়ের ডেকে আনার অপেক্ষা না করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজেই ছুটলেন আগন্তুককে রিসিভ করার জন্য।

যে আগন্তুকের কথা এতক্ষণ হচ্ছিল, সে তখন অ্যাসাইলামের বাইরে ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকটা সতর্কদৃষ্টিতে মেপে নিচ্ছে। লোকটির পরণে স্বচ্ছ ওয়াটারপ্রুফ। মাথায় টুপি। হাতে একটা পেল্লায় ব্যাগ।

অ্যাসাইলামটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিলের মত প্রকান্ড চারতলা পুরনো বাড়িটা পড়ে আছে। দেখলেই ভয় লাগে! মেইন বিল্ডিংটার একদম পিছনে সারি সারি আধুনিক ছোট ছোট বাড়ি। সম্ভবত ডাক্তার-সিস্টার-অ্যাটেন্ডেন্টদের কোয়ার্টার।

মেইন বিল্ডিং ও কোয়ার্টারের মাঝখানে অনেকখানি জমির ফারাক। মাঝখান দিয়ে চলাচলের জন্য মোরাম বিছানো রাস্তা। রাস্তার ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাচ্চাদের জন্য স্লিপ, দোলনা, ঢেঁকি জাতীয় খেলার জিনিস। ওটা চিলড্রেন্স পার্ক। আর বাঁদিকে সযত্নে তৈরি করা একটা বাগান। বাগানের মাঝখানে টলটলে স্বচ্ছ জলের প্রাচীন পুকুর। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

আর এ সমস্তকেই ঘিরে রয়েছে পাথরের বাউন্ডারি। উচ্চতায় আন্দাজ পনেরো ফুট! মাথায় কাঁটাতার লাগানো। মানুষ তো দূর, ভগবানেরও বোধহয় সাধ্য নেই এ মহা প্রাচীর টপকে পালায়। মেইন গেটটাও প্রকান্ড ও মজবুত লোহার তৈরি!

আগন্তুক সে সবের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ফের মূল বাড়িটার দিকে মন দিয়েছে। এ বাড়িটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা একসাথে আকর্ষণ ও ভয় দুই-ই সৃষ্টি করে। বাড়িটা মিডইভাল স্টাইলে তৈরি। মেইন বাড়িটার চারদিকে চারটে বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারের ছাতগুলো আবার সুঁচোলো ত্রিভুজাকৃতির। আর্কিটেক্টরা এই ধরণের তিনকোণা সুঁচোলো ছাতকে বলেন 'টেট্রাহেড্রাল স্পায়ার'। ইংরেজ ভদ্রলোক বাড়িটিকে প্রায় দুর্গের আদলেই তৈরি করিয়েছিলেন। তখনও ওয়াচ টাওয়ারে সেপাইরা বসে থাকত। এখনও অ্যাসাইলামের প্রহরীরা ওখান থেকে চব্বিশ ঘন্টা আশেপাশে নজর রাখে।

সে মাথা তুলে উপরে তাকাতেই দেখল লাল রঙের উর্দিপরা প্রহরীরা নীচের দিকে

তাকিয়ে তাকেই লক্ষ্য করছে। একজনের চোখে আবার বাইনোকুলার!

আগন্তুক আশ্বস্ত হয়। অ্যাসাইলামের বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কড়া। দুদিকের ওয়াচ টাওয়ার তথা রেকট্যাঙ্গুলার টারেটের গায়ে ছোট ছোট লম্বাটে গর্ত। ওগুলোকে 'লুপ হোল' বলে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতেই সেখানেও লাল উর্দি নজরে পড়ল। ওখান থেকেও বাইরে নজর রাখা হচ্ছে।

সবমিলিয়ে তার মনে হল—এটা বাড়ি না দুর্গ! গঠনশৈলী থেকেই প্রাচীন ও অভিজাত বিদেশী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধের হলদেটে ম্লান আলো এসে পিছলে পড়ছিল বাড়িটার সামনের বড় বড় প্রাচীন মার্বেলের থামের উপরে। অঝোরে বৃষ্টির ফোঁটা চুঁইয়ে পড়ছে তার প্রকান্ড বিষণ্ণ দেহ থেকে। যেন বিষণ্ণতাই ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে।

অদ্ভুত মায়ায় তাকে যেন ঘিরে ধরছে সমস্ত পরিবেশটা। প্রাচীনত্ব ও আভিজাত্যের সংমিশ্রণ এই বাড়ি! তার চেয়েও বেশি রহস্যময়!

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ বাড়িতে খুন হবে না তো আর কোথায় হবে! প্রথম দর্শনেই রীতিমতো গা ছমছম করে উঠেছিল। এখনও পরিবেশটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না তার। সত্যিই যেন এই অপূর্ব প্রাচীন আভিজাত্যের পিছনে কোথাও একটা অশুভ শক্তির সঙ্কেত আছে!

—'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি'।

এস্তব্যস্ত হয়ে যেইন এন্ট্রান্স দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। চাপদাড়ি ওয়ালা দশাসই চেহারার মানুষটি আক্ষরিক অর্থে সুদর্শন নন। কিন্তু কি যেন একটা সৌন্দর্য আছে তার বলিষ্ঠ গড়ন আর আত্মবিশ্বাসী ঋজু চলাফেরায়। দেখলেই ভাল লাগে।

আগন্তুক লক্ষ্য করল ভদ্রলোকের হাইট মিনিমাম ছ'ফুট হবেই। তার পিছন পিছন যে ওয়ার্ডবয়টি বেরিয়ে এল তাকে ভদ্রলোকের পাশে লিলিপুট বলেই মনে হয়।

—'আমি সত্যিই দুঃখিত'... ভদ্রলোক তার হাত এগিয়ে দিলেন। আন্তরিক উষ্ণ করমর্দনের পর বললেন—'আমিই ডঃ মনোহর চৌধুরী'

আগন্তুক নম্র ভঙ্গিতে বলে--'আমি অর্চিষ্মান...অর্চিষ্মান দত্ত।

-'ইয়েস...ইয়েস...আই নো...অসীম বলেছে আপনার কথা'। ডঃ চৌধুরী হাসলেন। এমন তাজা হাসি খুব কম মানুষই হাসে।

—'আমি সব জানি। প্লিজ ভিতরে আসুন। এই ভোম্বলচরণ আপনাকে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রেখেছে। আমি সত্যিই দুঃখিত...'

অর্চিষ্মান 'ভোম্বলচরণ' শব্দটা শুনে মুচকি হাসল। ডঃ চ্যাটার্জীর উপযুক্ত বন্ধুই বটে!

ডঃ চৌধুরী অর্চিষ্মানকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ছ'ফুট না হলেও তার দৈর্ঘ পাঁচ ফুট ছয়-সাত ইঞ্চি হবে। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন যুবক। বয়স আঠাশ কি ত্রিশ। মাঝারি দৈর্ঘ্যের সুগঠিত চেহারা। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। এমন ডাক্তার দেখলে রোগীর অর্ধেক অসুখ এমনিতেই সেরে যায়।

ভিতরে ঢুকতেই গা শিরশিরে ভাবটা যেন আরও বেশি চেপে ধরল অর্চিষ্মানকে। ভিতরের পরিবেশটা ভীষণ ঠান্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে! প্রাচীন আমলের বিরাট করিডোর সাপের পেটের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। সবচেয়ে যেটা অস্বস্তিকর—তা হল আলোর অভাব! প্রাচীন শক্ত ইঁটের গাঁথুনি সূর্যালোককেও বোধহয় রীতিমত আড়াল করে রেখেছে। করিডোরে সার সার আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তার হলদে আলো সামান্য একটু পিঙ্গল আভা ছেড়েই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। যেন ম্লান রঙের প্রাচীন দেওয়ালগুলো বুভুক্ষুর মতো শুষে নিচ্ছে আলোর শেষ কণাটুকুও!

এর মধ্যেই কোথা থেকে যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে ভেসে এল উন্মত্ত চিৎকার।

-'ছেড়ে দাও...আমায় ছেড়ে দাও...আমি বাড়ি যাবো-ও-ও-ও-ও

সে চমকে ওঠে। তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডঃ চৌধুরী।

—'ঘাবড়াবেন না। এরকম প্রায়ই শুনতে পাবেন। এ তো রোজকারের ঘটনা। প্রথম প্রথম একটু অকওয়ার্ড লাগবে। আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। জাস্ট ইগনোর'।

যত সহজে ‘ইগনোর’ শব্দটা বললেন ডঃ চৌধুরী, তত সহজে অবশ্য ইগনোর করা গেল না। একেই এরকম ভুতুড়ে পরিবেশ! তার মধ্যে এরকম উন্মত্ত চিৎকার!

–‘আসুন, বসা যাক’। নিজের কেবিনে ঢুকে একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন তিনি—‘চা বা কফি চলবে?’

–‘চা’। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ডঃ চৌধুরী বিনয়কে ডেকে দু কাপ চায়ের ফরমায়েশ করলেন। তারপর ফের অর্চিষ্মানের দিকে মনোনিবেশ করেন।

-‘আপনার কাগজপত্র, সার্টিফিকেট?

সে একটা ফাইল ব্যাগ থেকে বের করে এগিয়ে দিয়েছে। তিনি আলগোছে কাগজপত্রের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলেন—'হঠাৎ মনোবিদ হওয়ার ইচ্ছে হল কেন?’

অর্চিষ্মান কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসল। ডঃ চৌধুরী ফের মুগ্ধ হলেন। ছেলেটির হাসিই তার আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দেয়। সম্ভবত সে কম কথা বলে। হাসে বেশি।

—'বেশ'। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন—'অসীম যখন বলেছে তখন ফেরৎ পাঠানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমার দিক দিয়ে সমস্যা নেই। তবে আগেই বলে রাখি যে এখানকার পরিবেশটা কিন্তু সবাই নিতে পারে না। আপনার আগে আরও চারজন ইনটার্ন এখানে এসেছিল। তারা সবাই একসপ্তাহের মধ্যেই পালিয়ে বেঁচেছে!’

–‘আমি পালাবো না'।

—ফাইন। তবে কয়েকটা পয়েন্ট আগেই ক্লিয়ার করে দিই'। ডঃ চৌধুরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি ফাইলটা ফেরত দিয়ে বললেন—‘আপনি আমাদের কম্পাউন্ডেই থাকবেন। আমাদের এক নিউরোলজিস্ট ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র সম্প্রতি খুন হয়েছেন। কাগজে খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়ই'।

-'হ্যাঁ'।

–‘তার কোয়ার্টারেই আপাতত আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হবে। চিরঞ্জীবের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এখনও ওখানেই আছে। ওর বাড়ির লোক কয়েকদিন পরেই এসে নিয়ে যাবে। আশা করি আপনি এই কয়েকটা দিন একটু কষ্টেসৃষ্টে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন'।

—'শিওর'।

—'সেকেন্ডলি, আমাদের এখানে অনেক দক্ষ ডাক্তার আছেন। কিন্তু যেহেতু অসীমের রেফারেন্সে এসেছেন সেহেতু আপনাকে বেস্ট ডাক্তারদের সাথেই কাজ করার স্কোপ দেওয়া উচিৎ। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ ও ডঃ ধৃতিমান হালদারের সাথেই কাজ করবেন আপনি। কাল সকালে দুজনের সাথেই আলাপ করিয়ে দেব'।

-'ওকে'।

—'থার্ডলি, অনেকের এমন ধারণা আছে যে অ্যাসাইলাম মানেই সব বদ্ধ পাগলের কান্ড কারখানা। এবং তাদের সবাইকেই ধরে ধরে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হয়'। ডঃ চৌধুরীর দাড়িগোঁফের মধ্য দিয়ে অল্প হাসির আমেজ ভেসে উঠল—‘ঘটনাটা কিন্তু তা নয়। এমন অনেক রোগী আছেন যারা পুরোপুরি উন্মাদ নন। কোনও কারণে, জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে তাদের মেন্টাল ব্যালান্স বিগড়ে গেছে। নানান থেরাপি, সাজেশন আন্ডার হিপনোসিস আর ওষুধের মাধ্যমে তাদের আবার সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায়। শকথেরাপিও অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা একদম লাস্ট স্টেজ। কোনও ডাক্তারই সেটা ব্যবহার করতে চান না। তবু মাঝেমধ্যে স্পেসিফিক কিছু কেসে খারাপ লাগলেও ব্যবহার করতেই হয়। সেটা আলাদা ব্যাপার। যেটা আসল বক্তব্য সেটা হল একজন ভালো সাইক্রিয়াট্রিস্ট তিনিই, যিনি সহানুভূতিশীল, মমত্ববোধযুক্ত এবং অবশ্যই আ ভেরি গুড লিসনার। কথায় কথায় ইলেক্ট্রিক শক দেওয়াটা সাইক্রিয়াট্রিস্টের ভূমিকা নয়। একজন বন্ধু, একজন শ্রোতা, পরামর্শদাতা ও সর্বোপরি একজন চিকিৎসক—এটাই একজন মনোবিদের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা'।

অর্চিষ্মান চুপ করে ডঃ চৌধুরীর বক্তৃতা শুনছিল। এর থেকেই বোঝা যায় মনোবিদের

অন্যতম গুণ,--ধৈর্য ধরে শোনার ক্ষমতা তার আছে। লেকচার আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু বিনয়ের প্রবেশে বক্তৃতায় বাধা পড়ল।

–'স্যার, দুজন পেশেন্টই এসে গেছে'।

–'এসে গেছে?' ঋজু ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ মনোহর চৌধুরী। অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন—'চলুন, আজই আপনার পেশেন্ট দেখার শ্রী গণেশ হয়ে যাক। দেখে নিন্, কি জাতীয় পেশেন্ট নিয়ে আমরা ঘর করি'।

–'ওকে স্যার'। অর্চিষ্মানও উঠে দাঁড়িয়েছে—'তবে একটা রিকোয়েস্ট ছিল। আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে বেশি ভালো লাগবে'।

তিনি হাসলেন—'বেশ, এসো'।

বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। অ্যাসাইলামের সামনে বেশ খানিকটা জল জমেছে। সেই জল ছেটাতে ছেটাতেই পরপর এসে দাঁড়াল একটা অ্যাম্বুলেন্স আর প্রিজন ভ্যান।

অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে প্রথমেই নেমে এলেন একজন ছোটখাটো চেহারার ভদ্রলোক। ইনিই ডঃ অশোক সিঙ্ঘানিয়া।

–'আর বলবেন না ডঃ চৌধুরী'! অ্যাম্বুলেন্স থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়েই ছপাৎ করে খানিকটা জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে একসা করলেন ডঃ সিঙ্ঘানিয়া।

—'এই পেশেন্টকে নিয়ে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। কোনওরকমে বাঁচিয়ে রেখেছি। এখন আপনার হেফাজতে রেখে যেতে পারলে বাঁচি'।

–'পেশেন্ট কোথায়?'

—'এই তো'। তিনি অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাঁক পাড়লেন—'কি হল? পেশেন্টকে নামাও'।

নার্সিংহোমের কয়েকজন ওয়ার্ডবয় স্ট্রেচারে করে নামিয়ে আনল রোগীকে। অর্চিষ্মান ও ডঃ চৌধুরী—দুজনেরই কয়েকমুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রূপের ছটায় অ্যাসাইলামের বিষণ্ণ পরিবেশ আলো করে নেমে এল প্রথম রোগী! অ্যাসাইলামের লোকেরা ততক্ষণে ট্রলি নিয়ে তৈরি।

—'সাবধানে রাখো'। ডঃ চৌধুরী অ্যাসাইলামের ওয়ার্ডবয়দের দিকে তাকিয়েছেন —'একদম হুড়ুম দুড়ুম করবে না। খুব যত্ন করে রাখো।

পেশেন্টকে ট্রলির উপর শোয়ানো হল। সে বোধহয় কোনও ঘোরের মধ্যে আছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় বিড়বিড় করে বলল—'আমি কো-থা-য়?'

ডঃ চৌধুরী সস্নেহে তার কপালে হাত রাখলেন। বছর সাতাশ-আঠাশের যুবক। অদ্ভুত রূপবান! দেখলে রোগী কম, ফিল্মের নায়ক বলেই বেশি মনে হয়। সুন্দর স্টাইলিশ রেশমের মত ঘন চুল বর্তমানে বিস্রস্ত। সুদীর্ঘ ও ঘন অক্ষিপল্লব, আয়ত চোখ, চোখা চোখা মুখের আদল যেন ঈশ্বর অনেক সযত্নে তৈরি করেছেন। দেহের কোথাও একটুও বাড়তি মেদ নেই! প্রায় ছ ফুটের উপর লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধ বুক, সরু কোমর, লম্বা লম্বা পা—একেবারে গ্রীক পুরুষালি সৌন্দর্যের নিদর্শন! কণ্ঠস্বরটিও চেহারার উপযুক্ত! যাকে বলে ব্যারিটোন!

—'হোয়াট আ বিউটি!' ডঃ চৌধুরী আক্ষেপমিশ্রিত স্বরে বলেন—'যার এইরকম রূপ—সে আত্মহত্যা করতে যায় কেন?'

অনিন্দ্যসুন্দর রোগীটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অর্চিষ্মান। রূপের সাথে বিষণ্ণতা মিশে গেলে যে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়—তা বোধহয় এই প্রথম দেখল সে। ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আচ্ছন্ন চোখ দুটো মাঝে মাঝে কি যেন খুঁজছে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত শূন্যতা।

প্রাথমিক অবস্থায় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও এইবার দুজনের চোখে পড়ল রোগীর দুহাত শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা! —'একি!' ডঃ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলেন—'এভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন?'

ডঃ সিঙ্ঘানিয়ার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ—'বিউটি দেখে গলবেন না ডক্টর। মহা বজ্জাত পেশেন্ট! সুযোগ পেলেই আত্মহত্যা করতে ছুটবে!'

অর্চিষ্মান লক্ষ্য করল যে ছেলেটির দুই কব্জিতেই ব্যান্ডেজ করা। ডঃ চৌধুরীরও সেটা চোখে পড়েছে। -'আপনি তো বলেছিলেন স্লিপিং পিল খেয়েছিল। তবে হাতে ব্যান্ডেজ কেন?'

ডঃ সিঙঘানিয়া আক্ষেপের সাথে বললেন—'প্রথমে তো তাই করেছিল। নার্সিংহোমে আনতে আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে বাঁচাতে পারতাম না। কোনমতে বাঁচিয়েছি। একটু একটু করে সুস্থ হয়েও উঠছিল। এ জাতীয় পেশেন্ট অনেক সময় ইমপালসিভ হয়ে সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট করে বটে। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। কিন্তু এর তেমন কোনও লক্ষণই নেই। বরং কালকেই ফের নিজের দুহাতের শিরা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছে!'

—'সে কি!' ডঃ চৌধুরী পেশেন্টের কব্জির ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করছেন——কি সর্বনাশ! কি মারাত্মক ভাবে কেটেছে!এখনও প্রাণে বেঁচে আছে এই অনেক!'

—'স্রেফ ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন'। তিনি বলেন—— আমাদের এক মেট্রন যখন ব্যাপারটা আবিষ্কার করলেন ততক্ষণে প্রচুর ব্লিডিং হয়ে গেছে। পেশেন্টের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। কপাল ভালো যে হাত গভীর ভাবে কাটলেও রেডিয়াল আর্টারিটা একটুর জন্য বেঁচে গেছে। ছুরিটা একদম রেডিয়াল আর্টারির সামান্য নীচ দিয়ে গেছে বলে এ যাত্রাও বাঁচাতে পেরেছি। চার বোতল রক্তও দিতে হয়েছে। এখন আপনিই ভরসা।

—'কেন এই সুইসাইডাল মেন্টালিটি?' ডঃ চৌধুরী বলেন—'জানেন কিছু? ছেলেটির মা-বাবা কারুর সাথে এ বিষয়ে কথা হয়েছে?'

—'আমি জানতাম আপনি এই প্রশ্নটাই করবেন'। ডঃ সিঙঘানিয়া হাসলেন—'তাই ছেলেটির মাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

ছেলেটির মায়ের কাছ থেকেই রোগীর পূর্ব ইতিহাস শোনা গেল। ছেলেটির অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হয়েছে সে। ব্যর্থতার জ্বালা আর সহ্য হয়নি তার।

ডঃ চৌধুরী আরেকবার পরম মমতায় পেশেন্টের মাথায় হাত বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন —— ভিতরে নিয়ে যাও ওকে। আপাতত গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাখো। সুইসাইডাল কেস। সিঙ্গল কেবিনে রেখো না। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ বোধহয় কেবিনে আছেন। ওনাকে বলো কেসটা হ্যান্ডল করতে।

বিনয় আস্তে আস্তে বলে—'কোন রুমে রাখবো স্যার? ছেলেদের ঘর তো ফাঁকা নেই। আজ সকালেই ভরে গেছে। আর তো সব সিঙ্গল কেবিন'।

তিনি একটু ভাবলেন—'আট নম্বরে একটা বেড খালি আছে না? মিসেস গুপ্তর উল্টোদিকের বেডটা?'

—'হ্যাঁ স্যার'। সে অবাক হয়ে গেছে—'কিন্তু ওটা তো মেয়েদের ঘর!'

—'আপাতত ওখানেই রাখো। পরে শিফট করিয়ে দেওয়া যাবে।

পেশেন্টকে নিয়ে ওয়ার্ডবয়রা চলে গেল।

অ্যাম্বুলেন্সের পিছনেই একটা প্রিজন ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সটা সরে যেতেই সেটা মেইন এন্ট্রান্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রিজন ভ্যানের দরজা খুলে এক সুদর্শন অফিসার গটগট করে নেমে আসে।

—'স্যার, আরেকজন সাইকোকে নিয়ে এসেছি'। সে বলল—'ডেঞ্জারাস লোক কিন্তু। অলরেডি আটটা খুন করেছে'।

—'যা সব নমুনায় আমার চারতলাটা ভরিয়ে রেখেছ, সে তুলনায় নতুন করে আর কি ডেঞ্জারাস আনবে!' তিনি নির্বিকার ভাবে বলেন—'দেখি, এবার কোন্ মারাত্মক স্পেশিজ এনেছ'।

প্রিজন ভ্যানের দরজাটা হাট করে খুলে যায়। প্রথমেই লোকটিকে দেখতে পেল না অর্চিষ্মান। শুধু একটা ঝন্‌ঝন্ ছন্‌ছন্ আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই আসামীকে দেখা গেল। তার হাতে পায়ে মোটা মোটা লোহার শিকল! যখন পা টেনে টেনে হাঁটছে তখনই শিকলের

ঝন্ঝন্ আওয়াজটা হচ্ছে।

একটু আগের রোগীকে দেখে অর্চিষ্মানের মনে হয়েছিল যে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষটিকে দেখছে। এইবার মনে হল পৃথিবীর কুৎসিততম মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! লোকটির দিকে তাকাতেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়।

আসামীটিকে দেখলে কাফ্রী বলেই মনে হয়। পিচের মত কালো রঙ। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাঁধ ছাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠের দিকে। গালে একটা দগদগে ঘা! দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন মুখে বীভৎস মোটা মোটা একজোড়া কুৎসিত ঠোঁটই প্রথমে নজরে পড়ে। তারপর তার কুৎকুতে অথচ অসম্ভব নিষ্ঠুর চোখ দুটো। কোনও মানুষের চোখ যে এরকম হতে পারে তা একে দেখার আগে অর্চিষ্মান দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটো বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত জিঘাংসায় চতুর্দিকটা মেপে নিচ্ছে। শিকলে বাঁধা হাতদুটো নিশপিশ করছে কারুর টুটি টিপে ধরার সুযোগের অপেক্ষায়!

-'চারতলায় নিয়ে যাও'।

খুনীটির দিকে একঝলক তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ডঃ চৌধুরী।

-'একদম কোণের ঘরটায় রাখো।

আসামীটি এগোতে চাইছিল না। সে গোঁয়ার বাইসনের মতো গোঁজ হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে পিঠে পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়ে পা টেনে টেনে ভিতরের দিকে এগোল। শিকল ফের জোরালো শব্দে আওয়াজ করে উঠেছে—'ঝন্ঝন্...ঝন্ঝন্.......

অর্চিষ্মান কি যেন ভাবছিল। সেটা লক্ষ্য করেই ডঃ চৌধুরী স্মিত হাসলেন।

—'কি ভাবছ?'

সে অন্যমনস্ক স্বরে বলে—— ভাবছি দুজন পেশেন্ট একদম অপোজিট! একজন ঈশ্বরের সৃষ্টি। অন্যজন শয়তানের'।

—'ফিলোজফি!' একটা চমৎকার শিশুসুলভ হাসি তার মুখে ফুটে উঠল—'বেশ...বেশ...! সবে তো দুটো নমুনা দেখলে। সকালে এলে আরও তিনজনকে দেখতে পেতে। এমন এখানে গুচ্ছ গুচ্ছ আছে। কয়েকদিন থাকলেই সব দেখতে পাবে...'।

ডঃ চৌধুরীর কথায় বাধা পড়ল। বিনয় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। সে উত্তেজিত!

—'আট নম্বরে ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। নতুন পেশেন্ট ভীষণ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে। হাতের দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে! ডঃ খাসনবিশ একা সামলাতে পারছেন না!'

ডঃ চৌধুরী দৌড়লেন। পিছন পিছন অর্চিষ্মান।

আট নম্বরে তখন রীতিমতো একটা দক্ষযজ্ঞ চলছে। সদ্য আগত নতুন পেশেন্ট ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। অপ্রকৃতিস্থের মতো চিৎকার করছে—'আমায় ছেড়ে দাও...আমায় মরতে দাও...আমি মরতে চাই...মরতে চাই...'।

তার চিৎকারের সাথে সাথেই মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত মড়াকান্না জুড়েছেন! সবমিলিয়ে সে এক কুরুক্ষেত্র!

-'ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও আমায়...নয়তো সবকটাকে খুন করে ফেলব...'। উন্মত্তের মত গর্জন করে উঠল যুবকটি—'ছেড়ে দাও বলছি'।

তার হাতের বাঁধন খুলে গেছে। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ তাকে জাপ্টে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেটির গায়ে কি অসীম শক্তি! সে এক ঝটকায় তাকে ছিটকে ফেলে দিল। ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে! চোখ রক্তাভ। আগের অপূর্ব সৌন্দর্য মুছে গিয়ে তাকে এখন উন্মাদ বলেই মনে হচ্ছিল।

ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ পেশেন্টের সাথে কোনমতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একেই সে ডক্টরের চেয়েও লম্বা, তার উপর শক্তিশালীও বটে। তাই একা তার সাথে পেরে উঠছিলেন না। তার মধ্যেই কোনমতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন

—‘সিস্টার, ক্যাম্পোজ ইঞ্জেকশন রেডি করুন...কুইক...’

ডঃ মনোহর চৌধুরী এক ঝলক ব্যাপারটা দেখে নিলেন। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে অদ্ভুত কায়দায় ছেলেটিকে পিছমোড়া করে বেকায়দায় ধরে ফেলেছেন। তার ঘাড়ের এমন একটা জায়গা চেপে ধরলেন যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না! ভীষণ আক্রোশে প্রায় ব্ল্যাকবেল্ট চ্যাম্পিয়নের মত ডঃ চৌধুরীকে উলটে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

ডঃ চৌধুরী কিন্তু তখনও তার ঘাড় ছাড়েননি। পেশেন্ট শতচেষ্টাতেও তাকে ছাড়াতে পারছে না। ঘাড় চেপে ধরলে যে কোনও লোক কাবু হয়ে পড়ে। অথচ এই লোকটি তখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

-‘বিনয়...অর্চিষ্মান...অমিতাভ...প্লিজ...!’তিনি কোনমতে সামলাতে সামলাতে বলেন—'তাড়াতাড়ি হাত লাগাও...গায়ে অসুরের মত জোর! বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবো না'।

তিনি বলার আগেই অবশ্য তারা ছুটে গিয়ে চেপে ধরেছে পেশেন্টকে। ছুটে এসেছে অন্যান্য ওয়ার্ডবয়রাও। সবাই মিলে চেপে ধরে জোর করে বিছানার উপর চিৎ করে ফেলেছে। পেশেন্টও ছাড়ার পাত্র নয়! কিন্তু দশ বারোজনের সাথে একা কতক্ষণ পারবে! বলপূর্বক তার হাত পা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল খাটের সাথে।

—‘ইউ অল্...ব্লাডি ফুলস্...’। প্রচন্ড ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠেছে সে।

ডঃ খাসনবিশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। পেশেন্টের সাথে হাতাহাতি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। চোখ থেকে চশমাটা প্রায় খুলেই পড়েছে। তার উপর এই জাতীয় গালাগালি।

কিন্তু একটুও উত্তেজিত না হয়ে শান্ত গলায় বললেন—'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট’। এবং সিস্টারের হাত থেকে ক্যাম্পোজ ইঞ্জেকশন নিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে পুশ করে দিলেন।

—‘সবকটাকে ঠ্যাঙা দিয়ে মারবো...আমি সবকটাকে ঠ্যাঙা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারবো।

প্রচন্ড আক্রোশে চেঁচাতে চেঁচাতেই সে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঘোরের মধ্যেই জাহাজের খালাসীর মতো বিড়বিড় করে বলতে শুরু করে—‘এক বাঁও মেলে না...দুই বাঁও মে-লে-না...

অর্চিষ্মান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোগীটির দিকে দেখছিল। এখন সে নেতিয়ে পড়েছে। অল্পসময়ের মধ্যেই তার বিড়বিড় করা বন্ধ হয়ে গেল।

তার সন্দেহ হচ্ছিল যে ছেলেটি শুধু ব্যর্থ অভিনেতাই নয়, রীতিমতো মার্শাল আর্ট এক্সপার্টও বটে! যেভাবে ডঃ চৌধুরী তাকে বেকায়দায় চেপে ধরেছিলেন, তাতে কোনও সাধারণ পেশেন্টের পক্ষে ছাড়ানো অসম্ভব। কিন্তু এই পেশেন্টটি যে কায়দায় ডক্টরের অমন দশাসই চেহারাটাকেও অনায়াসে উলটে ফেলল—তা একমাত্র মার্শাল আর্ট এক্সপার্টের পক্ষেই সম্ভব! সবাই মিলে চেপে না ধরলে ডঃ চৌধুরীর ব্যাকবোন ভাঙা প্রায় নিশ্চিৎ ছিল!

ডঃ চৌধুরী কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন—'কি দেখছ অর্চিষ্মান? এর থেকে শিক্ষা নাও। রোজ নিয়ম করে ডব্লু ডব্লু এফ দেখবে’।

অর্চিষ্মান তার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে। দুই ডাক্তারই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু সে স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। বিপরীত বেডের মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত ফের মড়াকান্না জুড়েছেন। রীতিমত বাচ্চা মেয়েদের মতো হেঁচকি তুলতে তুলতে কাঁদতে শুরু করলেন।

—‘আবার কি হল?’ ডঃ চৌধুরী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন। তার কণ্ঠস্বরে একটুও বিরক্তির ছাপ নেই। অঞ্জলি গুপ্ত হাপুশ নয়নে কাঁদছেন—'এই লোকটাকে এখানে রাখলেন কেন ডাক্তারবাবু? ও নির্ঘাৎ আমায় খুন করবে!'

—‘কিচ্ছু করবে না’। তিনি আশ্বাস দিলেন—'ঐ দেখুন, ওর হাত পা একদম শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। খুন করা তো দূর, ও একফোঁটা নড়াচড়াও করতে পারবে না’।

—‘কিন্তু বলল যে ঠ্যাঙা দিয়ে সবাইকে খুন করবে!'

ডঃ চৌধুরী হাসছেন—‘রেগে গিয়ে বলেছে। বেচারা ডিপ্রেশনের রোগী। বেশ কয়েকবার সুইসাইডের অ্যাটেম্পটও করেছে। কিন্তু আমরা ওকে মরতে দিচ্ছি না বলে ফিউরিয়াস হয়ে

আছে।

অঞ্জলির পাশের বেডের সুজাতা দত্ত এতক্ষণে মুখ খুললেন। কাতর গলায় বললেন—'ডাক্তারবাবু...আমার বুক ধড়ফড় করছে...পেইন হচ্ছে...'

ডঃ চৌধুরী তাকে হাত তুলে আশ্বস্ত করেন। তারপর অর্চিষ্মানের কানে কানে বলেন—'ওঁকে একটা ভিটামিন বি টুয়েলভের ক্যাপসুল দিয়ে দাও'।

সে অবাক হয়। নীচুস্বরে বলল—'কিন্তু স্যার, ওঁর তো মনে হয় কার্ডিয়াক প্রবলেম......

–'কিস্যু নেই'। তিনি মিটিমিটি হাসছেন——— স্রেফ বাতিক। যা বলছি তাই করো।

–'ওকে স্যার'। সে আর দ্বিরুক্তি করে না।

ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের সাথেও এই সূত্রেই পরিচয় হয়ে গেল। ভদ্রলোক দেখতে একটু অদ্ভুত ধরণের। গোল ফ্রেমের চশমায় তাকে আরও অদ্ভুত লাগে! অর্চিষ্মান লক্ষ্য করল, ইনিও দীর্ঘদেহী। এই নিয়ে তিনজন লোককে সে দেখল যাদের হাইট ছ'ফুট বা তারও বেশি। একজন নতুন পেশেন্ট, আর দুজন ডাক্তার!

–'গ্ল্যাড টু মিট ইউ'। উষ্ণ করমর্দন করলেন ডঃ খাসনবিশ—'আমাদের পাগলখানায় স্বাগতম। তুমি কদিন পরে পালাবে বলে ঠিক করেছো?'

অর্চিষ্মান হাসল। ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত হলেও বেশ রসিক।

-'অর্চিষ্মান তোমাকে আর হালদারকে অ্যাসিস্ট করবে।

ডঃ চৌধুরীর কথা শুনে ডঃ খাসনবিশ হেসে উঠেছেন—'ব্যস্, তাহলে তো হয়েই গেল! তিনদিনও টিঁকবে না আপনার নয়া ইনটার্ণ'!

ডঃ চৌধুরীও মিটিমিটি হাসছেন। অর্চিষ্মান বুঝতে পারল না যে দুজন ডাক্তারই এত হাসছেন কেন! তার মুখ দেখে মনের ভাব আঁচ করতে পেরেছেন ডঃ খাসনবিশ।

তিনি হাসতে হাসতেই বললেন— বোঝোনি? চব্বিশ ঘন্টা ডিউটিতে থাকতে হবে তোমায়। ডঃ হালদার দিনের বেলায় বেশি কাজ করেন। আর আমি সারারাত রাউন্ড দিয়ে বেড়াই। আমাকে নিশাচর বলতে পারো। তার উপর ডঃ হালদারের সাথে কাজ করা মানে কলার ট্রে নিয়ে পিছন পিছন ঘোরা! যদি বাহাত্তর ঘন্টার বেশি টিঁকে থাকতে পারো তবে আমি নিজের দুই কানই কেটে ফেলবো!'

–'কলার ট্রে!'

তার কাঁধে বন্ধুর মত আলতো করে হাত রাখলেন ডঃ খাসনবিশ।

-'রিল্যাক্স। কাজে নামলে সব নিজেই বুঝতে পারবে। এখনই টেনশন নেওয়ার দরকার নেই'।

কথাটা বলতে বলতেই তিনি ডঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়েছেন—'স্যার, একটা কথা ছিল। আট নম্বরের নতুন পেশেন্ট কিন্তু বেশ ভায়োলেন্ট। ঠ্যাঙাটা ও ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। ওটা ওর নজরে পড়েছে যখন, তখন রিস্ক না নেওয়াই ভালো'।

–'ঠ্যাঙা!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অর্চিষ্মান।

—'হ্যাঁ। ডঃ চৌধুরী বলেন—'তুমি লক্ষ্য করোনি? ঐ যে নতুন পেশেন্টটি বলছিল 'ঠ্যাঙা দিয়ে সবাইকে মারবো তার কারণ হচ্ছে এ বাড়ির প্রত্যেক রুমের সামনেই একটা করে ঠ্যাঙা বা খিল রাখা আছে। তখনকার দিনে আধুনিক লক সিস্টেম তেমন ছিল না। তাই ঠ্যাঙা, খিল বা ডাঁশা—যাই বলো, ওটাই ব্যবহার করা হত। যদিও ওটা ঘরের ভিতরেই থাকার কথা। কিন্তু কোনও পেশেন্ট যদি ভিতর থেকে আটকে দেয় তবে বিপদ! তাই আমরা ওটাকে ঘরের বাইরেই রাখি। বাইরেও অবশ্য খিল দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আমরা। পেশেন্ট ভায়োলেন্ট হয়ে গেলে তাকে আটকে রাখার জন্য প্রথমে ঠ্যাঙা দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিই। তারপর লক করা হয়। ঐ দেখো...

ডঃ চৌধুরীর অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ্য করে অর্চিষ্মান দেখল, দু পাশের সার সার ঘরের প্রত্যেকটার সামনেই সত্যিই এক একটা প্রমাণ সাইজের ঠ্যাঙা দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। সেগুলোর চেহারা দেখলেই ভয় লাগে! মাথায় একটা পড়লে স্বয়ং ঈশ্বরও বাঁচাতে পারবেন

না!

দুই ডাক্তার কথা বলতে বলতেই এগিয়ে গেলেন। অর্চিষ্মান তাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। সে আশেপাশের ঘরগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে যাচ্ছে। সবকটা ঘরের সামনেই একটা করে কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর ফাইল রাখা আছে। সম্ভবত ওগুলো রোগীদের মেডিক্যাল রেকর্ড। কে কোন অসুখের শিকার, কার কি মেডিকেশন চলছে, তাদের কারেন্ট স্টেটাস—সমস্তই নথিবদ্ধ করে রাখা হয় ফাইলে।

এগোতে এগোতেই হঠাৎ চোদ্দ নম্বর ঘরের সামনে থমকে গেল সে। একি! এরকম তো হওয়ার কথা নয়! প্রত্যেকটা ঘরের সামনেই একটা করে ঠ্যাঙা বা খিল রাখা আছে। অথচ এই ঘরটার সামনে নেই কেন?

সে আবার পিছিয়ে যায়। দুদিকের ঘরের সংখ্যা গুণতে গুণতে করিডোরের শেষপর্যন্ত গেল। অদ্ভুত ব্যাপার! সব মিলিয়ে দুদিকে বাইশটা ঘর আছে। অথচ ঠ্যাঙার সংখ্যা একুশ! একটা মিসিং! চোদ্দ নম্বর ঘরের ঠ্যাঙাটা নেই!

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রোগীটির শেষ কথাগুলো।'এক বাঁও মেলে না...দুই বাঁও মেলে না...!

সত্যিই ঠ্যাঙার হিসাবটা মিলছে না!

৪

ডঃ খাসনবিশের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ বিফল করে দিয়ে অর্চিষ্মান ঐ অ্যাসাইলামে পাঁচ পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিল।

ডঃ চৌধুরী রসিকতা করে ডঃ খাসনবিশকে বলেছিলেন— অমিতাভ, অর্চিষ্মান কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টার ডেডলাইন ক্রস করে ফেলেছে। তোমার কানের উপর এবার মারাত্মক রিস্ক এসে উপস্থিত!'

ডঃ খাসনবিশ মুচকি হাসেন—'আমি তো জন্ম থেকেই দু কান কাটা লোক! নতুন করে আর কাটার দরকার কি!'

প্রথম দুদিন অর্চিষ্মানের বেশ অসুবিধেই হয়েছিল। বিশেষ করে রাতের দিকটায়। সকালেও এ বাড়িতে খুব একটা আলো ঢোকে না। আর রাতে তো কথাই নেই! হলুদ মিটমিটে আলোয় এ বাড়িটাকে কোনও জীবন্ত মানুষের বাসভূমি বলে মনে হয় না! ডঃ খাসনবিশ আবার রাতেই রাউন্ড দিয়ে বেড়ান বেশি। ভারি অদ্ভুত লোক। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে বেড়ান। ঐ টিমটিমে আলোতেও তার দেখতে একটুও অসুবিধা হয় না। অর্চিষ্মান ঠিকমত ওষুধের নামও পড়ে উঠতে পারে না। অথচ ডঃ খাসনবিশ ঐ আলো আঁধারির মধ্যেই দিব্যি বেছে নিতে পারেন সঠিক ওষুধটা।

তিনি আবার তীব্র আলো একদম পছন্দ করেন না। রাতে দেখার সুবিধার জন্য সে একটা টর্চ এনেছিল। সেটা জ্বালতেই ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলেন--- 'একশো... নিরানব্বই... আটানব্বই... সাতানব্বই...'

ব্যাপারটা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি সে। চুপিচুপি এক ওয়ার্ডবয় এসে বলল—'টর্চের আলো দেখে উনি রেগে গেছেন। এক্ষুনি ওটা নিভিয়ে দিন স্যার। ঐ যে উলটো গুনছেন না? এর মানে হল উনি রাগ কন্ট্রোল করছেন!'

ডঃ ধৃতিমান হালদার অবশ্য সেদিক দিয়ে বেশ মজাদার লোক। প্রথম সাক্ষাতেই তাকে দেখে বললেন—'বাঃ, এ তো রীতিমত হ্যান্ডসাম ডাক্তার দেখছি! তুমি কলা খাও?'

অর্চিষ্মান আকাশ থেকে পড়ে—'কলা!'

—'হ্যাঁ কলা'। বলতে বলতেই তার হাতে একটা ট্রে ধরিয়ে দিয়েছেন। ট্রে ভর্তি সিঙাপুরী কলা।

–'কলা খাওয়া উচিৎ। কলার মতোন উপকারী ফল আর নেই'। তার হাতে ট্রে টা ধরিয়ে দিয়েই বললেন—'ফলো মি'

কলার ট্রে হাতে নিয়ে তার পিছন পিছন গেল অর্চিষ্মান। ট্রে থেকে একটা একটা করে কলা তুলে নিচ্ছেন ডঃ হালদার, আর এক এক করে পেশেন্ট দেখছেন।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের বেশির ভাগ পেশেন্টই ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, ম্যানিয়া বা অবসেশনে ভুগছে। ডঃ হালদারের রোগী দেখার ভঙ্গীটি ভারি সুন্দর। বড় সস্নেহে মিষ্টি ভাষায় রোগীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের কথা খুব মন দিয়ে শোনেনও। রোগী দেখা শেষ হয়ে গেলে তাদের হাতে একটা করে এক্লেয়ার্সও ধরিয়ে দিচ্ছেন।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে চারজন পেশেন্টকে দেখে নিয়ে বললেন তিনি—'চলো, এবার হাতাহাতি করার জন্য প্রস্তুত হও'।

সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে—'হাতাহাতি!'

—'ইয়েস, এবার আমরা ডাইরেক্ট চারতলায় যাবো'। ডঃ হালদারের মুখে উদ্বেগের ছাপ —'এ বাড়ির সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ। ওখানে এক একজন এক এক সাইকো। ওখানে কেউ যেতেই চায় না। গেলেও হরিনাম জপ করতে করতে যায়। তুমি নতুন এসেছ। তাই খুব সাবধান'।

এ বাড়িতে লিফট নেই। সাদা ঝকঝকে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই ডক্টর বললেন—'একতলার পেশেন্টরা তেমন মারাত্মক নয়। বরং তুলনামূলক নিরীহই বলতে

পারো। এদের খুব সহজেই সুস্থ করে তোলা সম্ভব। দোতলায় তুলনায় একটু ক্রিটিক্যাল কেসগুলো থাকে। ওখানে বেশিরভাগই ডরমেটরি। হিস্টিরিয়া, মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, স্কিজোফ্রেনিয়া, সোমনামবুলিজম, অপটিক্যাল অডিটারি হ্যালুসিনেশন, প্যারানয়েড ডিল্যুশন, ডিল্যুশন অফ রেফারেন্স, ডিল্যুশন অব পারসিকিউশন, সিস্টেমেটাইজড ডিল্যুশন—সব নমুনা পাবে। তিনতলাটা আবার কিডজ জোন'। তিনি একটা একটা করে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছেন।

-'আমরা চারতলা থেকে নামার সময় সব ফ্লোরগুলোতেই ঢুঁ মারবো। তখন দেখে নিও। তবে শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে ততটা নয়। এই রোগগুলো আবার একটা আরেকটার সঙ্গে রিলেটেড। যে হ্যালুসিনেশনে ভুগছে সে আবার ডিল্যুশনেও একই সাথে ভুগতে পারে। স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীর সেকেন্ডারি হিসাবে হ্যালুসিনেশনও থাকতে পারে। সব মিলিয়ে ভয়াবহ দশা! সুস্থ করা যে অসম্ভব তা বলছি না। কিন্তু সেটা নির্ভর করে রোগীর অবস্থার উপর!'

-'আচ্ছা স্যার...'। সে খুব বিনীত ভাবে জানতে চায়—'হ্যালুসিনেশন, ডিল্যুশন কি ইল্যুশনেরই রকমফের?'

—'একদম নয়'। তিনি সজোরে মাথা নাড়লেন—'ইল্যুশনটা কোনও রোগই নয়। ওটা যে কোনও সুস্থ মানুষেরই হতে পারে'।

—'তবে ইল্যুশন, ডিল্যুশন, হ্যালুসিনেশনের মধ্যে পার্থক্য কি?'

তিনি হেসে ফেলেন—'সবকটার মধ্যে একটা 'ল্যু' আর 'শন্' কমন আছে বলে সবকটাকে মাসতুতো-পিসতুতো ভাই বলে মনে হল তোমার?'

অর্চিষ্মান লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে। মানসিক রোগের বিষয়ে সে একদম অজ্ঞ! তার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে ডঃ হালদার হাসলেন— ডোন্ট ওরি মাই বয়। প্রথম প্রথম আমিও এমন হাবুডুবু খেতাম। তখন আমারও তোমার মতই মাথাভর্তি চুল ছিল। সব বুঝতে বুঝতে শেষে এই দশা হল!' নিজের টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—'নেহাৎ ডঃ সেনগুপ্ত ছিলেন তাই.........'।

বলতে বলতেই আচমকা থেমে গেলেন ভদ্রলোক। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেছে। মুখটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেছে। ডঃ সেনগুপ্তের প্রসঙ্গ অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে গেলেন! জোর করেই যেন হাসিটা ফের ফুটিয়েছেন—

—'চারতলা অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে যতটা সময় লাগবে তার মধ্যেই ফারাকগুলো ছোট্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পরে দোতলার লাইব্রেরী থেকে না হয় তোমায় ডিটেলস কয়েকটা কেস হিস্ট্রি আর ভালো কয়েকটা বই দিয়ে দেওয়া যাবে।

-'ওকে স্যার'।

ডঃ হালদার সোৎসাহে বোঝাতে শুরু করলেন—' প্রথমে ইল্যুশন আর হ্যালুসিনেশনের ফারাকটা তোমায় বুঝিয়ে দিই। 'অপটিক্যাল ইল্যুশন' কি জিনিস তা স্কুলের ছাত্ররাও জানে। একটা লাঠিকে জলে ডুবিয়ে রাখা হল। তোমার হঠাৎ করে দেখে মনে হল যে লাঠিটা ভাঙা! আসলে কিন্তু তা নয়। জল ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক বা রিফ্লাকটিভ ইনডেক্স আলাদা হওয়ার জন্য অমন দেখাচ্ছে। কিন্তু তুমি লাঠিটাকে একঝলক দেখেই ভাঙা ভাবলে! দিজ্ কলড্ ইল্যুশন। সাধারণ বিভ্রম যাত্র। এটা সাধারণভাবে কোনও রোগই নয়। তবে কখনও কখনও কিছু মানসিক রোগে ইল্যুশনটা আবার সেকেন্ডারি হিসাবে চলে আসে। কিন্তু শুধু ইল্যুশনটা ধর্তব্য নয়'।

—'আর হ্যালুসিনেশন?'

—'হ্যালুসিনেশন অবশ্যই একটা রোগ। ইল্যুশনের ক্ষেত্রে একটা বস্তু বা বাস্তব মাধ্যম থাকে। হঠাৎ একটা দড়ি দেখে তুমি প্রথমে সাপ ভেবে আঁৎকে উঠলে। তারপর ঠিক ভাবে দেখেই ভুলটা বুঝলে। এক্ষেত্রে দড়ির মত একটা রিয়েল মেটিরিয়াল বা যাকে বলে উদ্দীপক —সেটা হাজির রয়েছে, যেটাকে তুমি ভুল দেখেছ'। ডঃ হালদার একটু শ্বাস টেনে বলেন

—"কিন্তু হ্যালুসিনেশনে কোনও রিয়েল মেটিরিয়ালই থাকে না। পেশেন্ট জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার যত কাল্পনিক বস্তু দেখে বা শোনে। কিন্তু যা দেখছে সেটা যে বাস্তব নয় তা তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না!'

অর্চিষ্মান মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা তার কাছে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

—'আর ডিল্যুশন?'

—'ওরে বাবা!' সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ডঃ হালদার হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন— সে আরেক ঝামেলা! ঐ যে একজন নতুন সাইকো কিলার এসেছে না? ঐ যে যার অভ্রান্ত ধারণা যে পরিবারের সবাই তাকে খুন করার মতলব করছে—তাই সবাইকে ধরে কচুকাটা করে ফেলেছে..!'

—'হ্যাঁ। তার চোখের সামনে কাফ্রীর মতন চেহারার সাইকো কিলারের ছবিটা ভেসে ওঠে —' মনে আছে।

—'ও–ই ডিল্যুশনের পেশেন্ট। বাংলায় যাকে বলে— ভ্রান্তি। রোগীর মিথ্যা ধারণা ও মতামত। তুমি শত তর্ক করে, ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়েও এই মিথ্যা ধারণা দূর করতে পারবে না। হ্যালুসিনেশনের সঙ্গে আবার ডিল্যুশন সেকেন্ডারি হিসাবেও আসতে চায়। ডিল্যুশনের দুটো টাইপ মেইনলি দেখতে পাবে। আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি বা ডিল্যুশন অব রেফারেন্স। আর নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি বা ডিল্যুশন অব পারসিকিউশন'।

-'যেমন?'

—'বলছি..........বলছি.......' ডঃ হালদার ট্রে থেকে একটা কলা তুলে নিয়েছেন —'ডিল্যুশন অব রেফারেন্সের রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাবতে শুরু করে যে আশেপাশে যা ঘটছে সবই তার সঙ্গে রিলেটেড! তারা ভাবে—'ওরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন? নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে! এরা কানে কানে কি কথা বলল? নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে কথা বলছে'।-- এইরকমই নানান অপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তির উপসর্গ দেখা যায় রোগীর মধ্যে। তিনি বললেন—'ডিল্যুশন অব পারসিকিউশনের রোগীদের আবার ভ্রান্ত অথচ বদ্ধমূল ধারণা হয় যে কয়েকজন লোক তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে! অথবা খুন করার চক্রান্ত করছে বা খাবারে বিষ মেশাচ্ছে—এইসব। কিন্তু কে ক্ষতি করবে বা খুন করবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। এই নতুন সাইকোটিরও সেই অবস্থা!'

ডঃ হালদারের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অর্চিষ্মান তার পুরো বক্তব্যটাই মন দিয়ে শুনছিল। তার মাথায় একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসছিল। অনেক ভেবেচিন্তে প্রশ্নটা করেই ফেলে

-'আচ্ছা স্যার,...' আমতা আমতা করে বলে সে—'আট নম্বরের ভদ্রমহিলারও তো এইরকমই একটা প্রবলেম! উনিও তো ভয় পান যে ওঁকে কেউ খুন করবে! তবে তো উনিও ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারেন!'

—'সর্বনাশ!' ডঃ হালদার টাক চাপড়ালেন—'তুমি ঐ নিরীহ ভদ্রমহিলাটিকে সাইকো ভাবছ না কি!'

-'না...না...' সে অপ্রস্তুত—'আমি আসলে জানতে চাইছিলাম যে ওনার পক্ষেও ঐ সাইকো কিলারটির মত ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠা সম্ভব কি না!'

—'একদম না'। তিনি বলেন—'উনি বড়জোর কান্নাকাটি চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে হিস্টিরিক হয়ে উঠতে পারেন। তার বেশি কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়'।

-'কেন?'

ডক্টর সরু দৃষ্টিতে তাকে একবার মেপে নিলেন। সে একটু অস্বস্তিবোধ করে।

—'কারণ দুজনের রোগ আলাদা। আট নম্বরের মহিলা ও ঐ সাইকোর ভয় একই। কিন্তু দুজন দু টাইপের। সাইকোটি ডিল্যুশনের পেশেন্ট। আর ঐ মহিলা 'অবসেশন' বা আবেশের রোগী। অবসেশন আর ডিল্যুশনকে আপাতদৃষ্টিতে একইরকম মনে হয় বটে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যেটা সাইক্রিয়াট্রিস্টরা বুঝতে পারেন'।

কথা বলতে বলতেই দুজনেই চারতলায় উঠে এসেছেন। ডঃ হালদার জোরে জোরে শ্বাস

ফেলছেন—'আজকের মতো ক্লাস শেষ হল। উফফফফ...এই চারতলার সিঁড়ি ভেঙেই প্রাণ যাওয়ার জো হয়েছে। এখন কি আর খুনীদের সাথে মারপিট করার এনার্জি থাকে!' তিনি আপনমনেই বকবক করতে থাকেন—'ডঃ চৌধুরী সবাইকেই নিজের মত ভাবেন! কিছুতেই বুঝবেন না যে আমারও বয়েস হয়েছে। কতবার বলেছি একটা লিফট বসানোর কথা......!'

চারতলাটা খুব খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে অর্চিষ্মান। অন্যান্য ফ্লোরগুলোর তুলনায় এই ফ্লোরটা একদম আলাদা! প্রথম দর্শনেই তার মনে হল যে সে নরকে এসে পড়েছে! দিনের বেলাতেও এই ফ্লোরে একফোঁটা আলো ঢোকে না। পুরো অন্ধকার! করিডোরে আলো জ্বলছে ঠিকই। কিন্তু তা নেহাৎই সামান্য। পরিবেশটাও নোংরা। ভয়ের চোটে এখানে সহজে কেউ আসতেই চায় না। তাই সাফ-সাফাইয়ের প্রশ্নও ওঠে না। দেওয়ালে, ছাতে মোটা মোটা ঝুলের প্রলেপ। মেঝের উপর ভুক্তাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আরশোলারা ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল। অর্চিষ্মানের পা বেয়ে একটা ওঠার চেষ্টা করছিল। সে ঘেন্নায় কুঁকড়ে গিয়ে পা ঝাড়ে।

অর্চিষ্মান ডঃ হালদারের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। একটা পচা দুর্গন্ধ বারবার তার নাকে এসে ধাক্কা মারছে। গা গুলিয়ে উঠছে। তার সাথে অদ্ভুত সব আওয়াজ! এর মধ্যে একটা আওয়াজের সাথে সে পূর্বপরিচিত। শিকলের ছছন্ ঝন্ঝন্ আওয়াজ! এখানে আওয়াজটা অনেক বেশি জোরে। এবং একটা নয়—এ -একাধিক শিকলের আওয়াজ! কয়েদীরা অস্থিরভাবে পা টেনে টেনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সে ঘরগুলোর দিকে তাকাল বটে। কিন্তু ভিতরের বাসিন্দাদের স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রত্যেকটা ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। করিডোরের দিকে মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া দরজা আছে বটে, তবে কোনও জানলা নেই। বাইরের আলো, হাওয়া আসার উপায়ও নেই। সব মিলিয়ে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

তার মধ্যেই ছায়া ছায়া দীর্ঘ কয়েকটা চেহারা আবছা ভাবে চোখে পড়ল তার। প্রত্যেকেই আন্দাজ ছ'ফুট বা তারও বেশি লম্বা। অদ্ভুত প্রলাপ বকতে বকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।

—'এই ফ্লোরটা বোধহয় ব্রিটিশ আমলে বোধহয় অন্ধকূপ হিসাবে ইউজড হত'। ডঃ হালদার তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন—'লক্ষ্য করেছ? একটা জানলাও নেই এখানে!'

তার অদ্ভুত লাগছিল। এখানে যারা শিকলের আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা যেন কেউ পৃথিবীর মানুষ নয়। সব অন্ধকারের জীব! ভীষণ প্রতিশোধস্পৃহায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল দেওয়ালে কয়েকটা বীভৎস দর্শন হান্টার টাঙানো। সাধারণ চাবুকের মত দেখতে নয়। বরং একদম অন্যরকম।

–'ওগুলো ইলেক্ট্রিক হান্টার!' ডক্টর জানালেন—'বেশি ভায়োলেন্ট হয়ে গেলে ওগুলো দিয়েই চাবকাতে হয়। তাতেও ঠান্ডা না হলে ইলেক্ট্রিক শক্'।

ইতিমধ্যেই দৃশ্যপট সামান্য পাল্টেছে। অন্ধকারের প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই বোধহয় মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে। অর্চিষ্মান দেখল গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে বেশ কয়েকটা মুখ!

কিন্তু সে কি মুখ! হলদেটে আলোয় যা দেখা গেল তাতে সাধারণ কোন মানুষের হৃৎকম্প হওয়ার কথা! দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে আচ্ছন্ন কতগুলো হিংস্র মুখ। উদ্ভ্রান্ত অথচ উন্মত্ত চোখ। একজন তাকে দেখে হিংস্রভাবে হেসে উঠল। তার দাঁতগুলো নোংরা। কালো কালো ছোপ পড়েছে তার দাঁতে। আরেকজনের মুখে আবার লোহার খাঁচা! গর্গর্ করে ফুঁসছে! এরই ধারালো দাঁতের কামড় খেয়েছিলেন ডঃ মিত্র! সে আচমকা গরাদের ফাঁক দিয়ে দুটো হাত বের করে চেপে ধরল অর্চিষ্মানের অ্যাপ্রন!

–'অর্চিষ্মান!' ডঃ হালদার আঁৎকে ওঠেন—— ওর কাছে যেও না। মুখের খাঁচা কোনওভাবে খুলে গেলে কামড়ে মাংস তুলে নেবে!'

অর্চিষ্মানের ওর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে কোনওভাবেই নেই! কিন্তু তাকে হিড়হিড় করে টেনে

কাছে নিয়ে এসেছে লোকটি। অন্যান্য সাইকো কিলাররা একসাথে হর্ষধ্বনি করে উঠল। যেন নতুন শিকার ফাঁদে পড়েছে! চতুর্দিকের গরাদের ফাঁক দিয়ে আরও কয়েকটা উদ্যত হাত বেরিয়ে এসেছে। চেপে ধরেছে তার কলার। পৈশাচিক উল্লাসে একজন চেঁচিয়ে উঠল —'দশ...দশ...দশ........'।

অর্চিষ্মান ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কি অসম্ভব জোর এদের গায়ে! তার অ্যাপ্রণ আর কলার ধরে যে রকম আসুরিক শক্তিতে টানছে তাতে কতক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এদের হাতের নখগুলোও রাক্ষসের মত! বেশ কয়েকটা নখের আঁচড়ে তার ঘাড় আর হাত অসম্ভব জ্বালা করে উঠল!

সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। অনেকগুলো হাত এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চেপে ধরেছে। প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে চায়! যেন ছিঁড়ে খাবে! দশ...দশ...দশ...শব্দটার অর্থ কি! লোকটা ন'টা খুন ইতিমধ্যেই করেছে! দশ নম্বর কি সে! তাকেই পরবর্তী টার্গেট করেছে?

আরও কতক্ষন এইরকম টানাটানি চলত কে জানে! কিন্তু শেষমেষ রক্ষা করলেন ডঃ হালদারই। বিদ্যুৎগতিতে একটা হান্টার নামিয়ে এনে সপাং সপাং করে নির্দয়ভাবে হাতগুলোর উপর মারতে লাগলেন।

—'রাস্কালস্... নিষ্ঠুরভাবে চাবকাতে চাবকাতেই দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—'কিছুতেই সিধে হবে না। কিছুতেই না!'

চাবুকের ঘা খেয়ে হাতগুলো কুঁকড়ে গিয়ে সরে গেল। অর্চিষ্মান ভয়ে, আশঙ্কায়, ঘেন্নায় কাঁপছিল। সে প্রায় মেঝের উপরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ডঃ হালদার ছুটে এলেন তার দিকে। ব্যাকুলস্বরে বললেন—'ঠিক আছো.........? ঠিক আছো তুমি? আর ইউ ওকে?'

কোনওমতে বলল অর্চিষ্মান—'আই অ্যাম ওকে স্যার'।

বলতে বলতেই তার নজরে পড়ে কোণের ঘর থেকে আরেকটা মুখ উঁকি মারছে। এই সেই নতুন সাইকো! ডিল্যুশনের পেশেন্ট। কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল অবিন্যস্ত। মোটা মোটা বীভৎস ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল হিংস্র দন্ত পংক্তি!

ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল অর্চিষ্মানের!

৫

আট নম্বরের নতুন ডিপ্রেশনের রোগী এখন অনেকটাই ধাতস্থ হয়ে এসেছে। তার হিংস্রতা অনেকটাই কমের দিকে। বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে লাফালাফি করে বিশেষ লাভ নেই। বরং বেশি বেগড়বাঁই করলে এরা তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখে দেবে।

বর্তমানে সে অনেক শান্ত। মাঝেমধ্যে হুইলচেয়ারে বসিয়ে তাকে বাইরে ঘোরানোও হয়। বাগানে পার্কে তাকে নিয়ে ঘোরে সিস্টার বা ওয়ার্ডবয়রা।

সে অবশ্য বিশেষ কথাবার্তা বলে না। বরং কি যেন অদ্ভুত ঘোরে তাকিয়ে চারদিকটা দেখে।

ঠিক তার মতই আরেকটি রোগীও আছে। তাকেও একইরকম ভাবে হুইলচেয়ারে করে পার্কে ঘোরানো হয়। কিন্তু সে মানুষটি একটু বয়স্ক। চেহারাটাও রীতিমত চোখে পড়ার মত। অত্যন্ত ক্ষীণ চেহারার মানুষটির মুখ দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক কোনও সাধারণ রোগী নন। চোখের রঙটাও অদ্ভুত। সচরাচর বাঙালীদের মধ্যে এমন কটা চোখ দেখা যায় না। খুব স্নিগ্ধ সবুজাভ নীল রঙের চোখ। এমন তীক্ষ্ণ মুখও সহজে চোখে পড়ে না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁকে কোনও ওয়ার্ডবয় বা সিস্টাররা নিয়ে আসে না। বেশিরভাগ সময়ই ডঃ চৌধুরী বা ডঃ খাসনবিশ স্বয়ং ভদ্রলোককে নিয়ে আসেন! এর থেকেও বেশি অদ্ভুত ঘটনা যে, ভদ্রলোকের অমন সুন্দর চোখদুটোর দিকে তাকাতে যেন সবাই ভয় পায়! এমনকি স্বয়ং ডঃ চৌধুরীও ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকান না! তাঁর সাথে কথা বললেও সবসময় উলটো দিকে তাকিয়ে কথা বলেন!

অথচ মানুষটি কিন্তু পুতুলের মতই স্থির! কোনও কিছুই যেন দেখছেন না, শুনছেন না! একটা অদ্ভুত ঘোরে তলিয়ে আছেন!

ছেলেটি প্রথমদিকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি। পরে যখন দেখল তখন তার মনে হল ঐ হুইলচেয়ারের মালিককে সে আগে কোথাও দেখেছে। মুখটা অত্যন্ত চেনা!

তার মনের ভাব বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিলেন ডঃ খাসনবিশ। ডিপ্রেশনের পেশেন্টটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বারবার ভদ্রলোককে দেখছে দেখে বুঝতে পারলেন যে ছেলেটির কৌতুহল হয়েছে। একদিন নিজে থেকেই বললেন—'তুমি ওঁকে চেনো?'

ডিপ্রেশনের রোগী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ চেনে না।

–'উনি নিজেই একজন জিনিয়াস সাইক্রিয়াট্রিস্ট ছিলেন। ডঃ পুলক সেনগুপ্তর নাম শুনেছ?'

ছেলেটি ফের মাথা নাড়ে।

–'হিপনোসিস কিং নামে ডাকা হত ওঁকে'। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ বলেন-" -'ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার ছিলেন। ওঁর ধারে কাছে কেউ ছিল না!'

এরপরও অনেকবার মুখোমুখি হয়েছে দুই পেশেন্ট। ডঃ সেনগুপ্তকে দেখলেই ডিপ্রেশনের ছেলেটির একটাই অমোঘ শব্দ বারবার মনে পড়ে—'হিপনোসিস কিং!

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

তার নতুন ডিপ্রেশনের পেশেন্টটির প্রতি বাচ্চাদের আকর্ষণের মাত্রা দেখলে এই প্রবাদ বাক্যটার মর্মার্থ বুঝতে পারেন ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ। সামান্য মেডিকেশন, মিউজিকথেরাপি আর কাউন্সিলিং চালিয়ে পেশেন্টের উগ্রভাব অনেকটা কমিয়ে এনেছেন তিনি। সে দ্রুত উন্নতি করছে। আর এই উন্নতির পিছনে বাচ্চাদের অবদানও নেহাৎ কম নয়! বাগানে ঘোরানোর সময় ছেলেটি চিলড্রেন্স পার্কের দিকেই তাকিয়ে থাকে। বাচ্চারা পার্কে খেলাধুলো করে। সে চুপ করে তাই দেখে। দেখতে দেখতেই তার বিষণ্ণ মুখে সুন্দর একটা ছেলেমানুষী হাসি ভেসে ওঠে।

ডঃ খাসনবিশ এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছেন। বাচ্চাদের সান্নিধ্যে গেলেই সে যেন খুশি হয়। বাচ্চারাও তাকে পছন্দ করে। বিশেষ করে কুক্কু ও পুপু এই রোগীটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। তাকে দেখতে পেলেই 'কাকু...কাকু...' বলতে বলতে বাচ্চাদুটো ছুটে আসে।

অনর্গল কথা বলে যায়। কাকু চুপ করে তাদের কথা শোনে। এ বাড়ির বেশির ভাগ কাকু জ্যেঠুরাই কিছু শোনে না। উলটে নিজেরাই বিড়বিড় করে। তাই এত ভালো শ্রোতা বাচ্চাদুটো আগে কখনও পায়নি। সেইজন্যই 'নতুন কাকু' সম্পর্কে তাদের এত উৎসাহ!

কুক্কুর বয়েস প্রায় দশ। তার মাথার চুল জট পাকানো। কতদিন মাথায় চিরুনি পড়েনি তার হিসেব নেই। অথচ কথাবার্তায় সে যথেষ্টই চটপটে। একদিন এসে বিষণ্ন গলায় বলল —'নতুন কাকু, আমার ব্যাটটা হারিয়ে গেছে জানো?'

নতুন কাকুর দৃষ্টিতে একটু জিজ্ঞাসু ভাব ফুটে ওঠে। তার হুইলচেয়ার ধরে দাঁড়িয়েছিল ওয়ার্ডবয় পরাশর। সে-ই নতুন কাকুর তরফ থেকে উত্তর দেয়।

—'কিভাবে হারিয়ে গেছে সেটাও কাকুকে বলে দাও'।

—'জানি না'। সে সরলভাবে দু হাত উল্টায়-'কি করে যেন হারিয়ে গেছে!' বলতে বলতেই প্রসঙ্গ পালটে যায়—'তোমার হাতে ব্যান্ডেজ কেন?'

পরাশর উত্তর দেয়—'কাকুর হাত কেটে গেছে'।

—'কি করে কাটল?'

—'খেলতে গিয়ে কেটে গেছে'।

-'কি খেলতে গিয়ে?'

পরাশর ভেবে পায় না কি উত্তর দেবে। কি খেলতে গিয়ে হাত কাটতে পারে সে সম্পর্কে তার ধারণা নেই। অনেক ভেবেচিন্তে গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়

—'বক্সিং!

—'টোমার হাট বাঢ়া কেন?'

পাশ থেকে পুপু প্রশ্ন করে। সে কুক্কুর চেয়ে একটু বড়। বছর বারো বয়েস হবে তার। সে কথা বলার সময় সামান্য তোৎলায়। 'ত' কে 'ট' বলে। 'দ' কে 'ড'! আগে তো তার কথা তেমন বোঝাই যেত না। মনে হত হিব্রু বলছে। স্পীচ থেরাপি করার পর এখন একটু স্বাভাবিক।

—'কাকু দুষ্টু করছিল'। পরাশর গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—'তাই ডাক্তারবাবু হাত বেঁধে রেখেছেন'।

কথাটা শুনেই কুক্কুর দু চোখ যেন জ্বলে উঠল। সে চাপা আক্রোশে বলে—'ডাক্তারবাবু পচা! বিশ্রি! জানো আমাকেও বেঁধে রাখে! এই তোমার মতো করে! আর খালি চুল কেটে দেয় ....

রোগীটি তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায়। অবিকল কুক্কুর মতই মাথা নেড়ে বলল —'ডাক্তারবাবু পচা'।

—'হ্যাঁ, পচা, বাজে!'

নতুন কাকুও তার সাথে একমত—'পচা, বাজে!'

ব্যস্, এরপর থেকেই দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। কুক্কু বোধহয় বুঝতে পারল যে এই 'নতুন কাকু'টি তার সমব্যথী। একেও ডাক্তারবাবুরা বেঁধে রাখে। এর কাছেও ডাক্তারবাবুরা 'পচা! বাজে!'। অতএব এই লোকটার সাথেই বন্ধুত্ব করা যায়।

এই বাড়িতে এমনিতে যেখানে সেখানে অবাধে যাতায়াত করার অধিকার একমাত্র বাচ্চাদেরই আছে। তারা হিংস্র নয়, পাগলও নয়। খুনের ঘটনার পর অবশ্য রাত্রে তাদের উপর থেকে নীচে নামতে দেওয়া হয় না। আর চারতলায় যাওয়া নিষেধ। এছাড়া সর্বত্রই তাদের বিচরণ।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল কুক্কু ও পুপু 'নতুন কাকুর' ঘরে প্রায়ই হাজির হচ্ছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার! ডিপ্রেশনের আত্মহত্যাপ্রবণ রোগীটিও যেন তাদের পথ চেয়েই বসে থাকে। বাচ্চাদের কলকলানিতে নিজেও যোগ দেয়। তাদের খিলখিল হাসির সাথে তাল মিলিয়ে সে নিজেও হাসে।

ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ একদিন তাকে দেখতে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তার চক্ষু

চড়কগাছ! কুক্কু ছেলেটির বুকের উপর জমিয়ে বসে তার সাথে 'হালুম হালুম' করে বাঘ বাঘ খেলছে। আর পুপু তার কোলের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। ছেলেটি ব্যাপারটা দিব্যি উপভোগ করছে। থেকে থেকে হেসেও উঠছে।

-'কাকু,...তুমি আমাদের সাথে ক্রিকেট খেলবে?'

ছেলেটির হাসিমুখ ম্লান হয়ে যায়। সে তার বাঁধা হাত দুটোর দিকে ইশারা করল।

দৃশ্যটা ডঃ খাসনবিশ আড়াল থেকেই দেখলেন। এবং চুপিচুপি ডঃ চৌধুরীকেও ডেকে এনে দেখালেন।

—'শৈশব!' ডঃ চৌধুরীর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—শৈশবের চেয়ে সুন্দর জিনিস আর নেই অমিতাভ। ছেলেটির হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও। তবে কড়া নজরে রাখো। বাচ্চাদুটোর সাহচর্যে ওর ডিপ্রেশন খানিকটা হলেও কেটেছে হয়তো। কিন্তু সাবধানের মার নেই'।

–'ওকে মহিলাদের ঘরে আর কতদিন রাখবো স্যার? তার চেয়ে কিডজ্ জোনে রাখলে হয় না?'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি—'ভেরি গুড আইডিয়া! ইনফ্যাক্ট ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। ওকে কিডজ্ জোনেই রাখো। দুশো তিনের পাশে দুশো চারটা ফাঁকা আছে। দুশো চারেই রেখে দাও'।

সেদিনই 'নতুন কাকু' একতলা থেকে উঠে এল তিনতলায়। কুক্কু ও পুপুর পাশের ঘরটা তার জন্য বরাদ্দ হল। কুক্কু ও পুপুর একেবারে পোয়াবারো। তারা আদর, জুলুম ও শাসন করার জন্য এই লোকটাকেই পেয়েছে। এমনকি এই লোকটার উপর ডাক্তারিও ফলানো চলে।

–'টুমি একুনও কাওনি কেন?' পুপু শাসনের ভঙ্গিতে বলে—'এক্কুনি কাও, টাপ্পর ওটুড কাও'।

কাকুর হয়তো কোন কারণে মন খারাপ হয়েছিল। সে উদাসভঙ্গিতে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। কুক্কুর ধমকে তার সম্বিৎ ফিরল।

—'এক্ষুনি খেয়ে নাও। তুমি লক্ষ্মী ছেলে না? নয়তো বকবো কিন্তু।'

বলেই চোয়াল শক্ত করে, গোল গোল চোখ দুটোতে রাগ ফুটিয়ে, নরম নরম গাল ফুলিয়েছে সে।

ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে 'নতুন কাকু' বলল—'ওরে বাবা!...ভয় পাই..

–'তাহলে এক্ষুনি খাও'। কুক্কু চোখ লাল করে—'খেয়ে নাও বলছি। তারপর আমি তোমার নাড়ি দেখবো'। –'নাঃ'। সে ঘাড় নাড়ছে—'আমার গরম লাগছে'।

-'গরম লাগছে কেন?'

সে নিজের রেশমের মতো উস্কোখুস্কো লম্বা চুলে আঙুল চালায়।

–'চুল বড় হয়ে গেছে। কেউ কেটে দিচ্ছে না। তাই গরম লাগছে।

কুক্কুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে ভয়ার্ত গলায় বলে—'চুল কাটতে নেই'।

–'কে বলল কাটতে নেই?' কাকু প্রতিবাদ করল—'আমি তো প্রতিমাসে চুল কাটি'।

–'তুমি প্রতিমাসে চুল কাটো!' কুক্কুর যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না।

-'হ্যাঁ'। সে মুখে একটা মজার ভঙ্গি করেছে—'প্রতি মাসেই নতুন নতুন স্টাইলে চুল কাটি। কখনও শাহরুখ খান ছাঁট, কখনও আমীর খান, আবার কখনও ঋত্বিক রোশনের মত চুল কাটি'।

কুক্কু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার বিশ্বাস হয় না যে এই লোকটা প্রতিমাসে চুল কাটে!

-তোমার চুল ওঠে না?'

—'হ্যাঁ.......ওঠে'। সপ্রতিভ জবাব—'আবার নতুন চুল গজিয়েও যায়। নয়তো তো টাক পড়ত। দেখো, আমার মাথায় কি টাক আছে?'

-'যাঃ। তুমি মিথ্যে কথা বলছ'। সে বলে——তোমার চুল কাটতে ভয় করে না?

—'মোটেও না। ভয় করবে কেন?' কাকুর উত্তর—'আমি বীরপুরুষ। ভিতু নই'। –'মিথ্যে কথা!'

–'একদম না'। কাকু বীরপুরুষের মতোই বলল—'দাঁড়াও প্রুভ করে দিচ্ছি'।

সে তার বিছানার পাশের বেলটা বাজায়। বেল বাজতে না বাজতেই একজন দশাসই চেহারার কালো কুচকুচে চেহারার ওয়ার্ডবয় এসে দাঁড়াল।

-'কি হয়েছে?'

নতুন কাকু সদর্পে বলে—'কুক্কু আমার মাথার চুল কাটবে। এক্ষুনি একটা কাঁচি এনে দাও'।

ওয়ার্ডবয় মাথা নাড়ায়। সুইসাইডাল পেশেন্টকে কাঁচি, ব্লেড বা ছুরি দেওয়ার নিয়ম নেই। চুল কাটবে না হাত কাটবে—তার ঠিক কি!

–'কি বিপদ! বললাম না, কুক্কু আমার মাথার চুল কাটবে'।

–'কুক্কু কাটবে কেন? আমি কেটে দিচ্ছি'।

—'না। কুক্কুই কাটবে'।

ওয়ার্ডবয় ও মানবে না। কাকুও ছাড়বে না। সে যতবার মাথা নাড়িয়ে চলে যায় ততবারই কাকু বেল বাজিয়ে বাজিয়ে তাকে বিরক্ত করে। কুক্কু অবাক! একটা লোক নিজের মাথার চুল কাটার জন্য কি কান্ডই না করছে! শেষমেষ ওয়ার্ডবয়টি অতিষ্ঠ হয়ে বলেই ফেলে —'আপনার প্রবলেমটা কি?

–'কাঁচি চাই'।

এবার অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল যে কাঁচি দেওয়া হবে। কিন্তু ওয়ার্ডবয় সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখবে। আর পেশেন্টের হাত দুটো বেঁধে দেওয়া হবে।

কাকু রাজি হয়ে গেল। ওয়ার্ডবয় তার হাতদুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। কুক্কুর হাতে কাঁচি। তার দিকে ঘনচুলওয়ালা মাথাটা এগিয়ে বলল কাকু

—'ওয়েলকাম টু কুক্কুস সেলুন। নাও...কাটো...'।

কুক্কুর মুখে প্রচন্ড আতঙ্ক। তার মুখে ঘামের বড় বড় ফোঁটা। সে ঢোক গিলছে বারবার।

–'কি হল? কাটো'।

হাত থরথর্ করে কাঁপছে। কুক্কু ভয়ে দু চোখ বুঁজে কাঁচি চালাল। কুচ করে একটা শব্দ। কয়েককুচি চুল খসে পড়ল।

–'ভালো করে কাটো'। কাকু তাকে উৎসাহ যোগায়—'বেশি বেশি করে। ঐটুকু করে কাটলে চলবে না।

-'কাকু...'। সে কাতরস্বরে বলল। তার ছোট্ট পাতলা দুটো ঠোঁট কাঁপছিল—'আমি পারবো না'।

—'কোনও কথা হবে না। চুল না কাটলে তোমার সাথে আড়ি'।

বাধ্য হয়ে কাঁচি চালাল কুক্কু। তার নতুন কাকু মহা আরামে চোখ বুঁজে আছে। সে আনাড়ি হাতে এদিক ওদিক যেখানে যতটা পারল, কাটল। ওয়ার্ডবয় দেখল যে স্টাইলিশ চুলের সাড়ে সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে! লোকটার কি আক্কেল! মাথার অবস্থা কি হচ্ছে সেদিকে খেয়ালও নেই। বাচ্চাটার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে আছে। এ লোকটা বদ্ধ পাগল!

আস্তে আস্তে সযত্ন লালিত চুলের দফারফা হয়ে গেল। অবস্থা দেখে যখন ওয়ার্ডবয়ের নিজেরই প্রায় কান্না পেতে চলেছে ঠিক তখনই থামল কুক্কু। চতুর্দিকে কাটা চুলের রাশ! চুলের মালিক তখনও চোখ বুঁজে আছে। যেন ঘুমোচ্ছে।

–'কাকু, হয়ে গেছে'। ভয়ে ভয়ে ডাকে সে। তার কন্ঠস্বর স্খলিত। মুখ ফ্যাকাশে।

কাকু কোনও উত্তর দেয় না। তার দু চোখ বোঁজা।

-'কাকু...'

কোনও সাড়া নেই। কুক্কুর মুখ কাগজের মত সাদা। সে মহা আতঙ্কে তাকিয়ে আছে কাকুর মুখের দিকে। একবার ভয়ার্ত, সজল দৃষ্টিতে পুপুর দিকে তাকায়। পুপুও উৎকন্ঠিত!

-'কা-কু...!'

কান্নাভেজা আর্তচিৎকার করে উঠল সে। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল—

-কি হল? কথা বলছ না কেন? ও কা-কু'।

হয়তো বাচ্চাটা ভয়ে অজ্ঞানই হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই ধড়মড় করে উঠে বসেছে তার নতুন কাকু

–'এই রে! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম'। সে কুক্কুর দিকে হাসিমুখে তাকায়—'হয়ে গেছে? দেখি কেমন হল?'

ওয়ার্ডবয় ভয় পাচ্ছিল যে চুলের এই ছাঁট দেখে রোগী আবার আত্মহত্যা করতে না ছোটে! কিন্তু দেখা গেল যে তার ভয় অমূলক। বরং সামনের আয়নায় নিজের মাথার অবস্থা দেখে মহাখুশি হয়ে বলল—'বাঃ! বেশ হয়েছে তো! একদম লালুপ্রসাদ মার্কা ছাঁট। এইবার চুলটা ভালো করে আঁচড়ে দাও'।

কুক্কু বিলক্ষণ ভয় পেয়েছিল। তার দেহ থরথর্ করে কাঁপছে। সে আর পারল না। কাকুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। কান্না মাখা গলায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—'তুমি উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?...আমি ভাবলাম...আমি ভাবলাম তুমি'।

–'কি ভাবলে?' কাকুর চোখে কৌতুকের ঝিলিক—'ভাবলে আমি মরে গেছি?

জলভরা বিস্মিত দুটো স্বচ্ছ চোখে তাকায় কুক্কু! তার মনের কথা কাকু জানল কি করে?

—'বোকারাম! মাথার চুল কাটলে কেউ মরে নাকি!' সে বলল—'আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি। তুমি নিজেই তো আমার মাথার চুল কাটলে। কই আমি তো মরিনি'।

কুক্কু তখনও তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। সে আলগোছে তার মাথায় হাত রাখল।

–'কাকু তো প্রমাণ করে দিল যে সে বীরপুরুষ। এখন কথা হচ্ছে কুক্কু কি ভীতু?'

কুক্কু তার বুকের ভিতর থেকেই উত্তর দেয়—'না'।

–'উঁহু'। সে মাথা নাড়ল—'মুখে বললে হবে না। কাকু প্রমাণ দিয়েছে। কুক্কুকেও প্রমাণ দিতে হবে।

কুক্কু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকায়। তার চোখে ভয়।

–'তাহলে কুক্কু ভীতু?'

বাচ্চাটা দুহাতে চোখ মুছে তীব্র গলায় বলে—'না। কুক্কুও বীরপুরুষ!'

বিকেলবেলা ডঃ খাসনবিশ রাউন্ড দিতে এসে হাঁ হয়ে গেলেন! তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন যে কুক্কু বিছানায় শুয়ে মহানন্দে কমিকস পড়ছে। তার মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা ও পরিপাটি করে আঁচড়ানো!

অসম্ভব বিস্ময়ে তিনি শুধু বলেন—'আবিলিভেল্...! এটা সম্ভব হল কি করে!'

নতুন কাকু কুক্কু ও পুপুর সঙ্গ পেয়ে ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মধ্যে তখনও কোথাও একটা বিষণ্ণতা কাজ করছিল। মাঝেমধ্যেই সে পার্কের পাশের পুকুরটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জানলা দিয়ে ভাসাভাসা চোখে নিষ্পলকে সেদিকে দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

তার এই তন্ময়ভাব অর্চিষ্মান লক্ষ্য করেছে। অনেকবার এ বিষয়ে প্রশ্নও করেছে। কিন্তু সে কোন জবাবই দেয় না। বরং পুকুরটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

অর্চিষ্মান তার সেই আত্মমগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, লোকটা ঐ পুকুরটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে কেন? সারাদিন কি এত ভাবে ওটার দিকে চেয়ে! যখন সে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন মনে হয় বোধহয় ও নিজের দেহে নেই! অদ্ভুত তার ভাবভঙ্গি।

অর্চিষ্মানের প্রশ্নটার উত্তর পেতে অবশ্য বেশি দেরী হল না!

সেদিনও রুটিনমাফিক বাচ্চারা চিলড্রেন্স পার্কে খেলা করছিল। অন্যান্য পেশেন্টদেরও নিয়ম করে পার্কে ঘোরানো হয়। তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নতুন কাকু, কুক্কু ও পুপুদের সাথে ক্রিকেট খেলছিল। সে বেশ ভালোই ক্রিকেট খেলে। ব্যাট করতে তাকে কখনও দেখেনি অর্চিষ্মান। কিন্তু সে দারুণ ফিল্ডার। অসাধারণ রিফ্লেক্স! ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন কয়েকটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরল যা দেখে অবাক হতেই হয়।

অর্চিষ্মান পার্কের সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ডঃ খাসনবিশ তাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছেন। ডিপ্রেশনের রোগীটিকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ আছে। তাই একটু দূরে দাঁড়িয়েই সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল।

অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় পুপু ভালো ব্যাটসম্যান। একটা বাউন্সারকে হুক করল। পরের ডেলিভারিটাই ফুল টস্। সে এক পা এগিয়ে এসে সবার মাথার উপর দিয়ে তুলে দিয়েছে বলটা। একদম ওভার বাউন্ডারি!

বলটা চিলড্রেন্স পার্কের সীমানা টপকে গিয়ে পড়েছে পুকুরটার সামনে। পুকুরপাড়ের সবুজ ঘাসের মধ্যে পড়ে থেমে গেল বলটা।

-'কাকু-উ-উ-উ-উ...' কুক্কু উইকেটকিপারের পজিশনে ছিল। সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল—'বলটা নিয়ে এসো।

কাকু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে এগিয়ে যায় পুকুর পাড়ের দিকে। বলটা ঘাসের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খুঁজে পেতে অসুবিধা হওয়ার কথাই নয়। কিন্তু সে পুকুরের সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল। অর্চিষ্মান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল যে লোকটির বলের দিকে কোনও মনোযোগই নেই। বরং সে আবেশগ্রস্তের মত তাকিয়ে আছে পুকুরের জলের দিকে! তার চোখে আগের স্বাভাবিক দৃষ্টিটা নেই। বরং যেন একটু উদ্ভ্রান্ত! কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণে চেয়ে আছে স্বচ্ছ টলটলে জলের দিকে।

—'কি হল?' পুপু অধৈর্য হয়ে বলে—'বলটা এডিকে ডাও!'

৬.

লোকটির যেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। সে সম্মোহিতের মত এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে পুকুরের দিকে! অর্চিষ্মানের স্নায়ু-পেশী নিমেষে শক্ত হয়ে ওঠে! কি করতে চায় ও!

কয়েকমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই 'ঝপাং' করে একটা শব্দ! লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুকুরে!

সর্বনাশ! ফের সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট!

কুক্কু চিৎকার করে উঠেছে। পুপু স্তম্ভিত। অন্যান্য বাচ্চারা ছুটে গেছে পুকুর পাড়ের দিকে। অর্চিষ্মানও বিদ্যুৎবেগে দৌড়ল সেদিকেই। তিনজন ওয়ার্ডবয় ততক্ষণে লাফিয়ে পড়েছে পুকুরে। জল তোলপাড় করে খুঁজতে লাগল পেশেন্টকে।

একেই প্রাচীন গভীর পুকুর—তার উপর দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও নেহাৎ কম নয়। ওয়ার্ডবয়রা ডুব সাঁতার দিয়ে খুঁজেও প্রথমে লোকটাকে পেল না। জলের উপরে উঠে একটু দম নিয়ে ফের ডুব মেরেছে তারা। অর্চিষ্মানের প্রায় দম বন্ধ অবস্থা!....এত বড় পুকুরে কোথায় মরণঝাঁপ মারল সে! ওয়ার্ডবয়রা এখনও খুঁজে পাচ্ছে না কেন! পুকুরটা বড় ঠিকই—কিন্তু লোকটাও তো নেহাৎ ছোটখাট নয়। অতবড় লম্বা লোকটা কি হাপিশ হয়ে গেল....... না একদম জলের তলায় তলিয়ে গেল......!

প্রায় দেড়মিনিট দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশেষে একজন ওয়ার্ডবয় ভেসে উঠল জলের উপর।

-পেলে?'

অর্চিষ্মানের উদ্বিগ্ন উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে একটু অদ্ভুত ভাবে মাথা নাড়ল——পেয়েছি স্যার! কিন্তু বেঁচে আছে কি না বুঝতে পারছি না'।

তার বুকের ভিতরটা যেন অবশ হয়ে আসে। কোনমতে বলে—'উপরে তুলে আনো। দেখছি'।

দুজন ওয়ার্ডবয় মিলে কোনমতে জলের উপর টেনে তুলল তাকে। সে বোধহয় সাঁতার জানত না। তাই একদম তলিয়ে গিয়েছিল।

–'শ্যাওলায় একদম জড়িয়ে গিয়েছিল'। একজন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—— টেনে তুলতেই পারছিলাম না! ভীষন ভারি!'

স্বাভাবিক! ছ'ফুটের উপর লম্বা একটা জোয়ান লোক ভারি তো হবেই। তিনজন ওয়ার্ডবয় মিলেও তাকে ডাঙায় তুলতে পারছে না দেখে বাকি ওয়ার্ডবয়রা এবং অর্চিষ্মানও হাত লাগাল। অবশেষে ধরাধরি করে তাকে ডাঙায় তুলে আনা হল।

ওয়ার্ডবয় পরাশর ব্যাকুলভাবে অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়েছে—'পেশেন্টের নিঃশ্বাস পড়ছে না স্যার!'

–'পেটে জল গেছে বোধহয়'। অর্চিষ্মান ক্ষিপ্রভাবে এগিয়ে আসে। পেশেন্ট সম্পূর্ণ নিস্তেজ। তার দেহে জীবনের কোন লক্ষণই নেই! তাকে উপুড় করে পিঠের উপর চাপ দিতেই মুখ দিয়ে গলগল করে জল বেরোতে শুরু করল। প্রায় একপেট জল খেয়েছিল সে! অথচ জল বের করে দেওয়ার পরেও তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু হল না! অর্চিষ্মান তার নাকের সামনে আঙুল রেখে মাথা নাড়ে। নাঃ, এখনও শ্বাস পড়ছে না।

–'তোমরা কেউ একবার ডঃ খাসনবিশকে খবর দাও'। সে ওয়ার্ডবয়দের দিকে তাকায় ——— আমি ততক্ষণ আর্টিফিশিয়াল ব্রিদিং দিয়ে দেখছি।

বিনয় ও পরাশর সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তারা দৌড়ল ডঃ খাসনবিশকে ডাকতে। অর্চিষ্মান পেশেন্টের মুখে মুখ লাগিয়ে বুকে ম্যাসাজ দিতে দিতে আর্টিফিশিয়াল ব্রিদিং দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশ কয়েকবার চেষ্টার পরও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হল না। সে এবার ঝুঁকে পড়ে মরিয়া হয়ে তার মুখে মুখ রাখতে যায়। পেশেন্টের চোখ তখনও বোঁজা। সর্বাঙ্গ ভিজে চুপচুপে। কিন্তু ঝুঁকে পড়তেই শুনতে পেল একটা ক্ষীণ স্বর। ফিফিস্ করে পেশেন্ট তার কানে কানে বলল

—'ওটা ওখানেই আছে। আমি এইমাত্রই দেখে এলাম। আজ রাতেই তুলবো। কভার দিও।

অর্চিষ্মান আশ্বস্ত হয়। ততক্ষণে ডঃ খাসনবিশও চলে এসেছেন। উদ্বেগে তার মুখ থমথমে। এসেই সভয়ে প্রশ্ন করলেন—'আছে?'

সে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে সাফল্যের হাসি হাসে—' আছে স্যার। তবে সেন্সলেস'।

–'স্টুপিড বয়!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ওয়ার্ডবয়দের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন——পেশেন্টকে ঘরে নিয়ে যাও। একদম হাত পা বেঁধে রাখবে। খবর্দার, বাইরে বের করবে না!'

পেশেন্টকে তার নিজের ঘরে পৌঁছে দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এল অর্চিষ্মান। এই ঘরটা আগে ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র ছিল। বর্তমানে এখানে সে বসবাস করছে।

একটা বেডরুম। ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ছোট্ট একটা কিচেন আর বেডরুম অ্যাটাচড্ টয়লেট। এইটুকুই পরিসর। অবশ্য একজন ব্যাচেলরের পক্ষে যথেষ্ট। এমনিতেই ডিউটির যা বহর তাতে নিজের কোয়ার্টারে ফেরার সময় কই! সকালবেলায় ডঃ হালদারের পিছন পিছন কলার ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। বিকেলে ঘন্টাখানেকের বিশ্রাম। তারপর আবার ডঃ খাসনবিশের সাথে রোগী দেখে যাওয়া। বিচিত্র সব রোগী! আরও বিচিত্র তাদের হাবভাব! একতলার পেশেন্টরা তবু ঠিকঠাক। কিন্তু দোতলার বাসিন্দারা ভয়াবহ!

দোতলায় একপাশে লম্বা লম্বা ডরমেটরি। অন্যদিকে হিপনোসিস রুম, নানা থেরাপির রুম, প্যাথোলজিক্যাল ইউনিট, লাইব্রেরী প্রভৃতি।

ডরমেটরির কোনোটা ছেলেদের, কোনোটা মেয়েদের। মোটামুটি ছ'টা ডরমেটরিতে প্রায় বাষট্টি-তেষট্টি জন পেশেন্ট আছে। পেশেন্টের সংখ্যা এই ফ্লোরেই সবচেয়ে বেশি। আর তাদের কি সব উদ্ভট উদ্ভট কান্ড! কেউ আপনমনেই ফিসফিস্ করে বকে চলেছে। কেউ বা লাগাতার ক্রিকেট খেলে চলেছে এবং নিজেই নিজের খেলার কমেন্ট্রি দিয়ে যাচ্ছে। আবার এক মাছি গোঁফওয়ালা লোক কোথা থেকে যেন হুড়মুড় করে প্রায় ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে বলল-

-'জার্মান মানুষ আমার নেতৃত্বের উপযোগী নয়।...সব জেনারেলকে বরখাস্ত করবো...আমিই সৈন্যবাহিনী লিড করবো... সমস্ত জার্মান মানুষের জীবন মৃত্যু আমার হাতে। তোমার জীবন মৃত্যুও আমার হাতে...তুমি কি জার্মান না ইহুদী?'

অর্চিষ্মান এই জাতীয় খাতিরে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। আকাশ পাতাল ভেবেও বুঝল না কি বলবে!

ডঃ হালদার সসম্মানে উত্তর দিলেন—'হের হিটলার। উনি জার্মান!'

তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে লোকটা চলে যায়।

-মাল্টি পার্সোনালিটি ডিস অর্ডার!' অর্চিষ্মানকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি——ও এখন নিজেকে অ্যাডল্ফ হিটলার ভাবছে।

অন্য আরেকটি ডরমেটরিতেও তখন হুলুস্থুলু কান্ড। একটি ছেলে পরণের সব জামাকাপড় খুলে ফেলছে। তার ধারণা যে সে আন্দামানের জারোয়া! সভ্য মানুষেরা জোর করে জামাকাপড় পরিয়ে রেখে তার পবিত্রতা নষ্ট করছে।

–'মহা মুশকিল স্যার!' ওয়ার্ডবয় কাঁচুমাচু মুখে বলে—'যখন তখন জামা কাপড় খুলে ফেলছে। সিস্টাররাও পর্যন্ত অপ্রস্তুত! কি যে করি!'

–'সোজা হিপনোসিস রুমে পাঠিয়ে দাও'। ডঃ হালদার হাসলেন—'দেখি, জারোয়াগিরি কমানো যায় কি না!'

একজন রোগী অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে জানলার দিকে তাকিয়েছিল। পাথরের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। তার ভঙ্গিটা দেখে মনে হয়, যেন ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

ডঃ হালদার তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে বলল—'দেখেছেন? ... ডাক্তারবাবু... দেখেছেন? ... ঐ যে আমার মা!...ঐ যে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারা করে ডাকছে। আপনি দেখেছেন?...আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!'

তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়েছেন। সে অস্ফুট স্বরে বলে—'অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশন'।

-'কারেক্ট'।

উল্টোদিকের রোগীটির অবস্থা আরও খারাপ। সে একটু বয়স্ক লোক। ক্ষীণদেহী। নিজের কান দুই হাতে চেপে ধরে চিৎকার করছে —'ডাক্তারবাবু ...ওদের থামতে বলুন...ওরা কেন এত চিৎকার করছে!...কেন আমার নাম ধরে ডাকছে!...ওদের থামান...প্লিজ, ওদের থামান...নয়তো আমি পাগল হয়ে যাবো...' বলতে বলতেই দেওয়ালে পাগলের মতো মাথা ঠুকতে শুরু করল। ওয়ার্ডবয়রা তাকে ধরে না ফেললে বোধহয় মাথাটাই ফেটে যেত।

– এটা কি বলতে পারবে?'

—'অডিটারি হ্যালুসিনেশন?'

—'পার্শিয়ালি কারেক্ট'। তিনি বলেন—'কিন্তু পুরোটা আগে দেখে নাও। ওয়াচ কেয়ারফুলি। সাইক্রিয়াট্রিস্টদের দেখার চোখটাও থাকতে হয়'।

ওয়ার্ডবয়রা ধরে ফেলতেই রোগীটি একদম নিস্তেজ হয়ে গেল। প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করল না। তাকে যখন বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল তখন সে একদম অন্য মানুষ! একটা পুতুলের মত স্থির, অচেতন, অনড়! যেন সম্পূর্ণ সম্মোহিত! একটু আগেই যেমন চেঁচামেচি করছিল তার লক্ষণই নেই এখন। চোখের পলক পড়ছে না। কথাও বলছে না। মূর্তির মতো স্থির!

—'এখন বলতে পারবে?'

—'এ তো স্কিজোফ্রেনিয়ার সিম্পটম!'

–'ইয়েস'। তার পিঠ চাপড়ালেন তিনি—'স্কিজোফ্রেনিয়া উইথ অডিটারি হ্যালুসিনেশন। অডিটারি হ্যালুসিনেশনটা সেকেন্ডারি। এই তো আস্তে আস্তে শিখে যাচ্ছ।

প্রশংসাবাক্যে অর্চিষ্মানের ফর্সা মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

–'তুমি তো মেয়েদের মত ব্লাশ করছ দেখছি!' ডঃ হালদার হাসলেন—'গুড। ঐ দেখো, পরপর বেডে যতজনকে দেখতে পাচ্ছো, সব স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট। তার সাথে সেকেন্ডারি হিসাবে অন্যান্য রোগও আছে। তবে স্কিজোফ্রেনিয়াই মেইন। এই রোগটাই সবচেয়ে জটিল, আর এর পেশেন্টও সবচেয়ে বেশি।

সে ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরটার দিকে তাকায়। আজ বিকেলটা তার অফ্। ডঃ খাসনবিশ ছুটি দিয়েছেন। যেদিন থেকে সে এখানে এসেছে তারপর থেকেই চলছে হাড়ভাঙা খাটুনি। এর মধ্যেই গোটা কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু এমন কিছু পায়নি যা সন্দেহজনক। ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এমনকি কম্পিউটারটাও ঘেঁটেছে। তাতেও এমন কিছু নেই যা থেকে ভদ্রলোকের মৃত্যুর কারণটা স্পষ্ট হয়। যেভাবে নিজের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতেন তাতে মনে হয় যে তিনি রীতিমত অগোছালো প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভুলে যাওয়ার অভ্যাস ছিল বলেই কোন রিপোর্ট কাকে দিতে হবে সেটাও একটা ছোট্ট নোটবুকে টুকে রাখতেন। সে নোটবইটাও ঘেঁটে দেখেছে অর্চিষ্মান। কিন্তু তাতে শুধু একটার পর একটা রিপোর্টের নম্বর আর কাকে দিতে হবে সে সব নথিবদ্ধ করা আছে। মৃত্যুর দিন তিনটে রিপোর্ট দুজনকে দেওয়ার কথা লিখেছিলেন ডঃ মিত্র। একশো দশের পেশেন্টের সিটি স্ক্যান দেওয়ার কথা ছিল ডঃ হালদারকে। একশো সাত আর দুশো তিনের এম আর আই স্ক্যান আর এক্সরে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ডঃ অমিতাভ খাসনবিশকে। রিপোর্টগুলো নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছিল। না হলে এই কোয়ার্টারেই পাওয়া যেত।

অর্চিষ্মান গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। দুশো তিনের এম আর আই আর এক্সরে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল ডঃ মিত্র'র। সে রাতে তিনি ডঃ চৌধুরীকেও দুশো তিন সম্পর্কে কোনও কথা বলতে চেয়েছিলেন। সেটা কি রিপোর্ট কেন্দ্রিক? কি ছিল রিপোর্টে?

সে আলগোছে কপালের রগ টিপে ধরে। এই গোটা কেসেই 'দুশো তিন' নম্বরটা ঘুরে ফিরে আসছে কেন?

৭

তখন রাত বারোটা। একতলার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা পড়ছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতা এতটাই বেশি যে একটা পিন পড়লেও বোধহয় শব্দ পাওয়া যাবে।

ওয়ার্ডবয়-সিস্টারদের শিফ্টও এখন চেঞ্জ হওয়ার কথা। ওয়ার্ডবয় আর সিস্টারদের দুটো শিফ্ট। একটা বেলা বারোটা থেকে রাত বারোটা অবধি। আরেকটা রাত বারোটা থেকে দুপুর বারোটা অবধি চলে।

ডে-শিটের ওয়ার্ডবয় সিস্টাররা চলে গেল। নাইট শিফ্টের লোকদের আসার সময় হয়েছে। বড়জোর কুড়ি থেকে ত্রিশ সেকেন্ডের বিরতি মাঝখানে।

তার মধ্যেই লম্বা একটা ছায়ামূর্তি সাঁৎ করে চলে গেল করিডোর বেয়ে। তার হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। সরীসৃপের মত সাবধানী অথচ ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে গেল চারতলার দিকে।

চারতলার করিডোরে ম্যাটম্যাটে হলুদ আলো জ্বলছে। কোনোটা জ্বলছে, কোনোটা জ্বলছে না। কোনোটা আবার দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে-নিভছে।

সাইকোরা তখনও ঘুমোয়নি। এই রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের পায়ের শিকলের আওয়াজ গোটা চারতলাটাকে ভৌতিক করে তুলছিল। যেন পায়ে ঘুঙুর পরে কোনও অতৃপ্ত আত্মা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ছন্‌ছন্‌...ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজটা কেমন যেন অতিলৌকিক শিহরণ বয়ে আনে।

দীর্ঘদেহী আগন্তুকটি কিন্তু দিব্যি নিঃশব্দ পায়ে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল। তার কাঙ্খিত দরজাটির সামনে গিয়ে থেমে গেছে সে। গরাদে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে বলল---এসেছি'।

৮

ভিতরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসে প্রত্যুত্তর—‘এতদিনে মনে পড়েছে?'

-'পড়েছে।

একটা আলতো শব্দ। চাবির আওয়াজ। তারপরই খুলে গেল গরাদওয়ালা দরজা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মাঝারি সাইজের আরেকটা ছায়া! একজন সাইকো!

—‘চাবি পেয়েছ দেখছি।

—‘ম্যানেজ করেছি’। লম্বা লোকটি বলে—'নষ্ট করার মত সময় নেই। এখনই বেরোতে হবে'।

—‘বেরোব কি করে?’ কয়েদীটি রাগতস্বরে বলে——এই হুলিয়া নিয়ে? দেখতে পেলেই ওয়ার্ডবয় বা ডাক্তাররা হান্টার দিয়ে পেটাবে!’

—‘তারা চিনতে পারলে তো’! লোকটি হাতের প্যাকেট থেকে দুটো ডাক্তারের অ্যাপ্রণ আর স্টেথোস্কোপ বের করে এনেছে।

সাইকোটি হিংস্রভাবে হাসছে—'অলরেডি রেকর্ড অনুযায়ী আটটা খুন করে ফেলেছি। পারলে ন' নম্বর তোমাকেই বানাই'।

অন্যজন ক্ষিপ্রহাতে পোষাক পাল্টাচ্ছে। ডাক্তারের অ্যাপ্রণ গায়ে চাপাতে চাপাতে বলে—'হঠাৎ এমন শুভকাজের প্ল্যানিং কেন?’

—‘মাথা ফাটিয়ে দেখতে চাই যে ভিতরে ঠিক কি জাতীয় মালপত্তর আছে। বাই দ্য ওয়ে, আমার কিট বক্স কোথায়?’

—‘সব আছে'। লম্বা লোকটি অবিকল অমিতাভ খাসনবিশের উদ্ভট গোল ফ্রেমের চশমার মত একজোড়া চশমা চোখে পরে নিল—'এখন বলুন, আমায় কেমন লাগছে?’

কয়েদীটিও পোষাক পাল্টাতে পাল্টাতে বলে—‘শ্রী কার্তিক, প্রত্যেকবার নিজের রূপের

প্রশংসা শোনা কি খুব জরুরী?

প্রথমজন হাসতে হাসতে তাদের দুজনের জামাকাপড় প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে রেখে দিল।

-'এখন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা। গেট রেডি...একি!'

প্রথম লোকটি কিছু বোঝার আগেই পাশের ঘরের গরাদ দিয়ে দুটো হাত বেরিয়ে এসে তাকে এক হ্যাঁচকা টান মারল। সাঁড়াশির মতো একটা হাত তার গলা বেষ্টন করেছে। অন্যটা কোমর চেপে ধরেছে।

—'পেয়েছি!' গরাদের ওপ্রান্তে দেখা গেল হাতের মালিকের মুখ। হিহিসিয়ে বলে- –'তুই কে রে? নতুন ডাক্তারটা না?'

আগন্তুক কিন্তু সেই লৌহবেষ্টনীর মধ্যে পড়েও ঘাবড়ায় না। বরং ঠান্ডা গলায় বলল —'এটা কি জাতীয় ভদ্রতা?'

—'এটা আমার স্টাইল'। সাইকোটি অপ্রকৃতিস্থ হাসি হেসে ওঠে——কেমন লাগল?'

-'ভালো'।

বলেই সে সাইকোটির কাঁধে আলতো করে হাত রেখেছে। খুনীটির হঠাৎ কি হল কে জানে! তার হাত পা অবশ হয়ে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ধড়াস্ করে কাটা কলাগাছের মতন মেঝেতে উলটে পড়েছে। নিস্পন্দ...নিথর!

দীর্ঘদেহী লোকটি শান্তগলায় বলে—“তবে আমার স্টাইলটা আরও ভালো'।

একতলায় ততক্ষণে শিফ্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। রাতের ওয়ার্ডবয়-সিস্টাররা যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। পেশেন্টরা নিদ্রাচ্ছন্ন।

আজ বিকেল থেকেই আকাশের মুখ থমথম করছিল। বেশ গুমোট পরিবেশ! এতক্ষণ গাছের একটা পাতাও নড়ছিল না। কিন্তু বারোটার ঘন্টা পড়ার সাথে সাথেই যেন তান্ডব শুরু হল।

প্রথমে দমকা হাওয়া। তারপরই প্রকৃতি যেন নিজেই নিজেকে লন্ডভন্ড করতে মেতে উঠল। চতুর্দিক তছনছ করতে করতে এক উন্মত্ত শক্তি এসে আছড়ে পড়েছে। পার্কের গাছগুলো প্রাণপণে সেই শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সাঁই সাঁই আওয়াজ, মেঘের গুরুগর্জন আর অ্যাসাইলামের জানলা কপাটের ধুম ধাম শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে তছনছ করে দিল। তার মধ্যেই অ্যাসাইলামের করিডোরগুলোয় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে পেশেন্টদের ভয়ার্ত চিৎকার! বাইরের উন্মত্ত ঝড়ের তান্ডবে তাদের ঘুম ভেঙে গেছে।

ওয়ার্ডবয়, সিস্টাররা দৌড়ে দৌড়ে সমস্ত ঘরের জানলা দরজাগুলো বন্ধ করছিল। ঝড় ততক্ষণে মার মার কাট কাট করে এসে পড়েছে। বিদ্যুতের রেখা মাঝেমধ্যেই উদ্যত শাণিত তরবারির মত ঝলসে ওঠে। নিষ্ঠুর কড়কড় আওয়াজে বুঝিয়ে দেয় যে আজ আর কারুর রক্ষা নেই!

এই রকম ঝড়ের দাপাদাপির মধ্যেই হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল অ্যাসাইলামের আলোগুলো। লোডশেডিং!

ঘুটঘুটে অন্ধকার করিডোরগুলোয় আছড়ে পড়ে ওলোট পালোট হাওয়া। হা হা করে বাতাসের অট্টহাসি দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচন্ড শব্দে কোথায় যেন বাজ পড়ল। তার আওয়াজে থরথর্ করে কেঁপে উঠল দরজা জানলার কাঁচগুলো।

তিনতলার বাচ্চারা সমস্বরে কেঁদে ওঠে। তারা ভয় পেয়েছে। ডঃ চৌধুরী হাতে টর্চ নিয়ে ছুটে এলেন। সামনে যে ওয়ার্ডবয়টিকে পেলেন, তাকেই ধমকে বললেন—'আলো নিভে গেল কেন? জেনারেটর ব্যাক আপ কোথায়?'

–'স্যার'। সে নিরূপায়ভাবে বলে—'প্রদীপ এই ঝড়ের মধ্যেই জেনারেটর ঘরের দিকে গেছে। কিন্তু বোধহয় এখনও পৌঁছতে পারেনি!'

ডঃ চৌধুরী চিন্তায় পড়লেন। এই মারকাটারি ঝড়ের মধ্যে যে কোনও মানুষের পক্ষেই

জেনারেটর রুম অবধি পৌঁছনো মুশকিল। যে ওয়ার্ডবয়টি বেরিয়েছে সে ঝড়ের ধাক্কায় এখনও পৌঁছে উঠতে পারেনি।

অগত্যা হাতে টর্চ নিয়ে তিনি নিজেই তিনতলার দিকে ছুটলেন। বাচ্চাগুলো অন্ধকারে ভয় পেয়ে গেছে। ওদের থামানো দরকার।

ঝড়ের উন্মত্ত দাপাদাপির সাথে এবার শুরু হল বৃষ্টি। ঝঝম শব্দে পাগলের মত এদিক ওদিক সাপ্টে নিয়ে তীব্র গতিবেগে ঝরে পড়ছে জলধারা। হাওয়ার ধাক্কায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। কখনও ছাঁট এদিকে আসছে, কখনও ওদিকে। যেন গতিপথ ঠিক করে উঠতে পারছে না!

নাইটশিটের যে ওয়ার্ডবয়টির সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলেন ডঃ চৌধুরী, সে অস্থিরভাবে বাইরের দিকে তাকায়। একেই এরকম ঝড়, তার উপর আবার বৃষ্টি নামল। বাইরের দৃশ্যপট ঝাপসা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না!

প্রদীপ কি এর মধ্যে পৌঁছতে পারবে? না তার নিজেরও একবার দেখা উচিৎ?

এরমধ্যেই করিডোরে দুজোড়া পায়ের শব্দ। সে সচকিত হয়ে ওঠে। কারা যেন এদিকেই আসছে। ডঃ চৌধুরী কি ফিরে এলেন? না অন্য কেউ? কোনও সিস্টার নয়। তাহলে তাদের হিলের খটখট শব্দ শোনা যেত। এ শব্দ কোনও বুটজুতোর।

সে কৌতুহলী হয়ে টর্চ জ্বালল। টর্চের জোরালো আলোয় বোঝা গেল যে দুজন আছে। কিন্তু আলোর ফোকাসটা পড়েছে একজনের মুখের উপর। আরেকজন তার চওড়া পিঠের আড়ালে আবছা।

আলো যার মুখে পড়েছে, সে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করেছে। ওয়ার্ডবয় দেখল দীর্ঘ চেহারার লোকটির পরণে সাদা অ্যাপ্রণ। মুখ ঢাকা সত্বেও চোখে গোল ফ্রেমের চশমাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গলায় ঝুলছে স্টেথোস্কোপ। তার সাথেই কানে এল একটা মৃদু কন্ঠস্বর—'একশো...নিরানব্বই...আটানব্বই...সাতানব্বই...'।

এই রে! ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ! রেগে গেছেন!

সে জিভ কেটে সঙ্গে সঙ্গেই টর্চটা নিভিয়ে দেয়। অনুতপ্ত গলায় বলে—'সরি স্যার'।

ডঃ খাসনবিশ কোনও উত্তর না দিয়ে গট্গট্ করে হেঁটে চলে গেলেন। তার পিছন পিছন দ্বিতীয় লোকটিও গেল। বোধহয় কোনও জুনিয়র ডাক্তার।

কিন্তু ওয়ার্ডবয়টি ভেবে পেল না যে এই মারাত্মক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে স্যার কোথায় গেলেন! তাও আবার ছাতা ছাড়া!

ডাক্তাররা ওয়ার্ডবয়কে পেরিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। লম্বা চেহারার লোকটি ঝড় বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই হনহন করে এগিয়ে গেল। পিছনের মানুষটি তখন কি যেন বিড়বিড় করে বলে চলেছে।

–'কি বিড়বিড় করছেন?' চাপা স্বরে বলে প্রথমজন—'চু-উ-প! লোকে পাগল ভাববে'।

মুখে বৃষ্টির ফোঁটা প্রায় তীরের ফলার মত এসে বিঁধছে। দামাল হাওয়া পিছনদিকে ধাক্কা মেরে উলটে ফেলার উপক্রম করে। তার উপর আবার চতুর্দিক অন্ধকার! সামনের দৃশ্যপট কিছুই দেখা যাচ্ছে না! শুধু কানে আসছে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ আর বিদ্যুতের কড়কড়ানি! তার মধ্যেই মৃদু ভয়ার্ত উত্তর এল

–'হনুমান চল্লিশা পড়ছি'।

—'হনুমান চল্লিশা!' একটা বিটকেল এক্সপ্রেশন ফুটে ওঠে প্রথম লোকটির মুখে —'কেন?'

–'মাথায় ঠ্যাঙা পড়ার হাত থেকে যদিও বা রক্ষা পাই, তবে নির্ঘাৎ বাজ পড়ে মরবো। –'রিস্ক না নিলে চলবে কেন?'

–'এত রিস্ক নেওয়ার দরকার কি!' দ্বিতীয়জন ভয়ে ভয়ে বলে—'পরে এলে হত না?'

–'না আজই দরকার'।

আজই দরকার! দ্বিতীয়জন মনে মনে গরগর করে। যেদিন মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা

বেশি, সেইদিনই এই লোকটার সব 'দরকার'! যেদিন আবহাওয়া সাফ সুতরো থাকবে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দেবে—সেদিন যে কেন এই 'দরকার'গুলো পড়ে না কে জানে!

দুজন হাঁটতে হাঁটতে পুকুরটার সামনে এসে পড়েছে। বৃষ্টির ধারায় পুকুরের জলও তখন অশান্ত হয়ে উঠেছে। রীতিমত তোলপাড় চলছে। পুকুরটা দেখলেই ভয় লাগে। যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত।

–'তুমি এই পুকুরে নামবে!'

—'হ্যাঁ। এটা ধরুন'।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। দীর্ঘ লোকটির হাতে একটা বাক্স ছিল। সে দ্বিতীয়জনকে সেটা ধরিয়ে দেয়। জলের ভিতরে তখন তান্ডব চলছে। লোকটি তার পরোয়া না করে অন্ধকারে নেমে পড়ল পুকুরে। ছপ্ করে একটা আওয়াজ।

দ্বিতীয়জন পুকুরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির ঝাপ্টায় চোখ খুলে রাখাও মুশকিল। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মাথার উপর ফের কড়কড় করে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তার মৃদু আলোতেই দেখা গেল পুকুরের জল উত্তাল! এখন, এই অন্ধকারে পুকুরে নামা সত্যিই বিপজ্জনক।

কিন্তু এই লোকটির ডিকশনারীতে 'বিপজ্জনক' বা 'অসম্ভব' শব্দটাই নেই! দ্বিতীয়জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এখন ভালোয় ভালোয় জিনিসটা পেলে হয়। সে দুরুদুরু বক্ষে সেদিকেই তাকিয়ে থাকে।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হল। তারপরই একটা মাথা জলের উপরে ভেসে ওঠে। আস্তে আস্তে সাঁৎরে পাড়ে উঠে এল গোটা মানুষটা। এতক্ষণ ডুবসাঁতার দিয়ে জিনিসটা খুঁজছিল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। মুখ, নাক চুঁইয়ে পড়ছে ঠান্ডা জলের ফোঁটা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—'গট ইট'।

দ্বিতীয়জন একটা মিনিটর্চ জ্বালিয়েছে। সেই টর্চের আলোতেই দেখা গেল প্রথমজনের হাতে একটা দশাসই ঠ্যাঙা বা খিল! ওটার গা থেকে জল ঝরে পড়ছে। গায়ে শ্যাওলাও জমেছে। তবে তার মধ্যেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওটার একটা জায়গা বেশ ভালোরকম চিড় খেয়েছে।

–'কি সাঙ্ঘাতিক!' দ্বিতীয়জন বলে—'এর একটা বাড়ি খেলে মৃত্যু অবধারিত!মনে হচ্ছে, এটাই। দাঁড়াও'।

সে তার হাতের বাক্স থেকে একটা বোতলের মত কিছু বের করে ঠ্যাঙাটার গায়ে স্প্রে করে। স্প্রে করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার ভিজে গায়ে উজ্জ্বল নীলাভ ছাপ ফুটে উঠল।

–'ল্যুমিনল টেস্ট পজিটিভ'। সে বলল—'রক্তের দাগ আছে। কোনও সন্দেহ নেই যে এটাই আসল মার্ডার ওয়েপন -ব্যাটটা নয়। কিন্তু...'

-'আবার কিন্তু...!'

–'ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না'। দ্বিতীয় লোকটি হতাশভাবে মাথা নাড়ে—'জলে ধুয়ে গেছে'।

প্রথমজন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দপ্ করে জ্বলে উঠল অ্যাসাইলামের আলো। জেনারেটর চালু হয়ে গেছে!

—'সর্বনাশ!' দ্বিতীয়জন কুঁইকুঁই করে—'এবার কি ভয় পাওয়া অ্যালাউড?'

–'একদম না'। প্রথমজন তার হাতে একটা চাবি ধরিয়ে দিয়েছে—'ডঃ অর্চিষ্মান দত্তর ঘর ফাঁকা আছে। মার্ডার ওয়েশ্টাও ওখানেই রাখা ভালো'।

-'কিন্তু তুমি...?'

সে হেসে তাকে বাড়ির পিছনদিকের জলের পাইপ আর কার্নিশ দেখায়।

–'ওগুলো বেয়ে উঠবে!' দ্বিতীয়জন স্তম্ভিত—'তুমি কি আগের জন্মে বেবুন ছিলে? না চোর?'

লোকটি হেসে ওঠে—'আমি পৌঁছে যাবো। ডোন্ট ওরি'।

দ্বিতীয়জন আশ্বস্ত হতে গিয়েও হতে পারে না। একটু কিন্তু কিন্তু করে বলে—'যদি বাই এনি চান্স আমার খোঁজ পড়ে।

প্রথমজন মিটিমিটি হাসে—'চিন্তা নেই। ব্যাক আপ আছে'।

জেনারেটর ধপধপ শব্দ করে চলতে শুরু করল। অ্যাসাইলামের আলো জ্বলে উঠেছে। ডঃ চৌধুরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ওয়ার্ডবয়-সিস্টাররাও হাতে টর্চ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছিল। তারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ডঃ চৌধুরী দোতলায় ছিলেন। বাচ্চাদের শান্ত করার জন্য প্রথমে তিনতলার দিকেই যাচ্ছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই দোতলায় চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ! এক অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগী ভয়ে দাপাদাপি করছিল। তার সাথে এক ডিল্যুশনের পেশেন্টের আর্ত চিৎকার! সব মিলিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি!

তিনতলায় আর যাওয়া হল না তার। দোতলাতেই আটকে গেলেন।

হ্যালুসিনেশনের পেশেন্টের মুখ ফ্যাকাশে গিয়েছিল। ডঃ চৌধুরী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই শোনে না। চিৎকার করতে করতে বলে—'আমি দেখেছি...আমি দেখেছি...'

-'হ্যাঁ...হ্যাঁ...দেখেছেন'। ডক্টর বললেন—'কিন্তু কি দেখেছেন?

-'আমি দেখেছি...দেখেছি...' সে হাঁফাচ্ছে—'একটা ছায়া...করিডোরের মেঝেতে একটা লম্বা ছায়া...!'

--'কোথায়?'

পেশেন্টটি দরজার সামনের মেঝের দিকে কাঁপা কাঁপা আঙুলে নির্দেশ করল—'ঐ ওখানে'।

—'মেঝেতে! কার ছায়া দেখেছেন?

–'একটা লম্বা ছায়া...' লোকটি উত্তেজিত—'একটা বিরাট লম্বা ছায়া...তার হাতে একটা বিরাট লম্বা ছুরি!' ডিল্যুশনের পেশেন্টটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জড়িয়ে ধরেছে ডঃ চৌধুরীকে। হাউমাউ করে কেঁদে বলল—'ডাক্তারবাবু...ও নিশ্চয়ই আমাকেই মারতে আসছে...ও নিশ্চয়ই আমাকেই মারবে!'

তার জাপ্টে ধরার চোটে ডঃ চৌধুরীর প্রায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম! গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না! কোনওমতে হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন—'কেউ মারবে না আপনাকে...প্লিজ...আমাকে ছাড়ুন'।

রোগীটি আরও জোরে চেপে ধরে ডাক্তারবাবুকে—'না...ওরা আমায় মারবে...মেরে ফেলবে.....আমি কি করব?...কি করব? আমিও ওদের মারব...!'

ডঃ চৌধুরী সেই ভীম আলিঙ্গনে নিজেই চোখে সর্ষেফুল দেখছিলেন। ওয়ার্ডবয়রা এসে লোকটিকে টেনে সরিয়ে নিয়ে তাকে বাঁচাল। তিনি জোরে জোরে দম নিচ্ছেন। হাত তুলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন রোগীটিকে। কিন্তু সে কিছুতেই শোনে না। তার উন্মাদনা ক্রমশই হিংস্র রূপ ধরছে দেখে শেষ পর্যন্ত সেডেটিভ ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াতে হল।

হ্যালুসিনেশনের রোগীটি তখনও বিছানায় বসে কাঁপছে। ডঃ চৌধুরী তার কাছে ফিরে গেলেন। শান্ত গলায় বললেন—'কি দেখেছেন? স্পষ্ট করে বলুন তো'।

সে ভয়ার্তস্বরে বলেন—'ওদিকে টর্চের আলো জ্বলছিল...টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম...হঠাৎ দেখি সেই আলোর মধ্য দিয়ে একটা লম্বা ছায়া চলে গেল...হাতে একটা বড় ছুরি!...এই করিডোরের মেঝেতে...দরজার সামনে ছায়াটা...একটা লম্বা ছায়া...হাতে ছুরি...'।

–'ছায়া!' ডঃ চৌধুরীর কপালে ভাঁজ পড়ল—'আর আপনার মাকে দেখেননি? আপনার মা তো রোজই জানলায় এসে দাঁড়ান। আজ দেখেননি তাকে?'

ভয়ার্ত চোখদুটো তুলে রোগী বলে—'না। মাকে দেখিনি। ছায়া দেখেছি...লম্বা ছায়া.

......হাতে লম্বা ছুরি!'

ডাক্তারবাবুকে চিন্তিত দেখাল। তিনি জানতে চান—'কতক্ষণ আগে দেখেছেন?'

লোকটি মনে করার চেষ্টা করে—'মিনিট দশ আগে'।

এর মধ্যেই দপ করে জ্বলে উঠল আলো। ডঃ চৌধুরী নিশ্চিন্ত হলেন। হ্যালুসিনেশনের পেশেন্টটিকে নিয়ে কি করতে হবে তা সিস্টার আর ওয়ার্ডবয়দের বুঝিয়ে দিয়ে নেমে এলেন নীচে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মনে পড়ল ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের সাথে তাকে একবার দেখা করতে হবে। তার কি যেন জরুরী বক্তব্য আছে। ডঃ খাসনবিশ তো আবার নিশাচর! আশা করা যায় এখন হয়তো রাউন্ডে আছেন।

একতলায় নেমে আসতেই ফের দেখা হয়ে গেল আগের ওয়ার্ডবয়টির সাথে। সে অন্যদিকের কোনও ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সামনে পড়তেই তাকে প্রশ্নটা করলেন ডঃ চৌধুরী।

–'ডঃ খাসনবিশ কোন ফ্লোরে আছেন জানো?'

–'ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ!' সে অবাক হয়ে তাকায়——তিনি তো একটু আগেই একজন জুনিয়র ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন!'

—'বেরিয়ে গেলেন মানে?' বিস্ময়ের পাহাড় ভেঙে পড়ল তার মাথায়—'এই ঝড়জলের মধ্যে বাইরে গেছেন? কেন?'

–'জানিনা স্যার'। ওয়ার্ডবয়টি মাথা নাড়ে—'কিছু বলেন নি'।

বিরক্ত হয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ কি মনে হতেই থম্‌কে দাঁড়ালেন অমিতাভ খাসনবিশের কেবিনের দরজার সামনে। তখনও ঝোড়ো হাওয়া বইছে। হাওয়ায় তার কেবিনের দরজার পাল্লাটা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছিল।

একি! ডঃ খাসনবিশের ঘরের দরজা খোলা! তবে কি তিনি ফিরে এসেছেন?

সন্তর্পণে ঘরের দরজাটা খুললেন মনোহর চৌধুরী। ভিতরে জমাট অন্ধকার। আর খুব মৃদু একটা গানের সুর। আশ্চর্য হলেন না তিনি। ডঃ খাসনবিশের অন্ধকারই বেশি পছন্দ। দিন হোক কি রাত—তার কেবিন সবসময়ই অন্ধকার! ভদ্রলোকের উপস্থিতি একমাত্র টের পাওয়া যায় পার্সোনাল মিউজিক সিস্টেমের মৃদু শব্দে। অন্ধকার ঘরে খুব আস্তে গান চালিয়ে রাখেন তিনি। সচরাচর সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী বা গজলের মতোই ঠান্ডা, শান্ত গান হয়।

আজও মৃদু গানের সুর কানে এল তার। মিউজিক সিস্টেমে বাজছে—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান'।

–'অমিতাভ...' ডঃ চৌধুরী আস্তে ডাকলেন—'আছো?'

কোনও উত্তর এল না। গান বেজেই যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে গলা একটু চড়িয়েই ফের ডাকেন তিনি——অমিতাভ, আমি এসেছি'।

এবারও কোনও উত্তর নেই! শুধু কোনও অজ্ঞাতনামা গায়িকা গা একেবারে ঢেলে দিয়ে গাইছেন—'মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট, রক্তকমলকর, রক্ত অধরপুট

অবাক হলেন ডঃ চৌধুরী। তবে কি অমিতাভ কেবিনে নেই? লোডশেডিঙের মধ্যে মিউজিক প্লেয়ারটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে বোধহয়। জেনারেটর চলার দরুণ সেটা ফের বেজেই চলেছে।

তিনি ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলেন। জেনারেটরের পাওয়ার এভাবে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। মিউজিক সিস্টেমটা বন্ধ করা দরকার।

কিন্তু আলো জ্বলে উঠতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন ডঃ চৌধুরী। যা দেখলেন তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল! বজ্রাহতর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ঝপ্ করে বসে পড়েছেন মেঝের উপর! তার মুখ থেকে বেরোল একটাই স্খলিত শব্দ

-'অ-মি-তা-ভ!'

অমিতাভ খাসনবিশ চেয়ার শুদ্ধ উলটে পড়ে আছেন মেঝের উপর! চোখদুটো খোলা!

গোল ফ্রেমের চশমাটা তখনও তার চোখেই আছে। কিন্তু চশমার পিছনের চোখদুটো একদম স্থির। যেন বিস্মিত হয়ে কিছু দেখছেন!

তার সাদা অ্যাপ্রণ তাজা রক্তে লাল। আর বুকে গেঁথে আছে একটা ছুরি! বাঁটটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। বাদবাকিটা ভিতরে......

৮

ছুরিটা কিন্তু তেমন বড় নয়। বরং বেশ ছোটই। জুনিয়র অফিসার অনেক চেষ্টা করেও সেটা বের করতে পারল না। বাধ্য হয়েই স্বয়ং অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ী অতিকষ্টে ছুরিটা টেনে বের করলেন ভিকটিমের বুক থেকে। একদম আমূল গেঁথে গিয়েছিল। এত জোরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সহজে বের করা যাচ্ছিল না!

–'একদম ফুল ফোর্সে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অফিসার লাহিড়ী গ্লাভস হাতে ছুরিটাকে নেড়েচেড়ে দেখছেন। —'এটা তো বড় কোনও ছুরি নয়! বরং কোনও বাটার নাইফ বলেই মনে হচ্ছে'।

জুনিয়র অফিসার আর পুলিশের টিম পটাপট লাশের ছবি তুলছে। ফ্ল্যাশের ঝলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। ডঃ চৌধুরী ক্লান্ত ও করুণ দৃষ্টিতে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগীটি বড় কোনও ছুরি দেখেছিল। কিন্তু এ ছুরিটা বড় নয়। তাদের কিচেনে এরকম বাটার নাইফ অনেক আছে।

–'কিচেনটা একবার দেখতে পারি?

—'শিওর'। তিনি বললেন—'একতলার একদম লাস্টের হলটাকেই আমরা কিচেন হিসাবে ব্যবহার করি।

—'থ্যাঙ্কস'।

জুনিয়র অফিসার কিচেনের সমস্ত বাটার নাইফ বের করে একটা একটা করে গুনল। অফিসার লাহিড়ী যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। একটা বাটার নাইফ মিসিং!

–'বিকেল থেকেই ওটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না স্যার'। একজন কুক আমতা আমতা করে বলে—'বিকেলেই লক্ষ্য করেছি যে ওটা নেই'।

অফিসার কিছু বলার আগেই রাগে চেঁচিয়ে ওঠেন ডঃ চৌধুরী।

–'লক্ষ্য করলে, অথচ কাউকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না?' তার শান্ত মুখমন্ডল রাগে উগ্র হয়ে উঠেছে— এটা একটা মেন্টাল অ্যাসাইলাম! যে কেউ যখন তখন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারে! সুইসাইডাল পেশেন্ট আছে! তার উপর চারতলায় সাইকো কিলাররা হেঁটে বেড়াচ্ছে! এর মধ্যে একটা ছুরি হারানোর অর্থ বোঝো তুমি! ছেলেখেলা পেয়েছ? ইউ আর ফায়ার্ড! ইউ আর জাস্ট ফায়ার্ড ফ্রম দিস মোমেন্ট!'

তার গলা ভেঙে গেছে। রাগে কাঁপছেন! এই মুহূর্তে তাকে উন্মাদ বলেই মনে হচ্ছিল। পাচকটির মুখ ফ্যাকাশে! কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

—'আমি ভেবেছিলাম...' সে বলার চেষ্টা করে—'ভেবেছিলাম আমাদের মধ্যেই বোধহয় কেউ ওটাকে এদিকে ওদিকে কোথাও রেখেছে, তাই খুঁজে পাচ্ছি না।

রাগে, উত্তেজনায় ডঃ চৌধুরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মাথায় একবার রাগ চড়লে তার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

–'ইউ স্টুপিড!' লোকটার দিকে প্রায় তেড়ে গেছেন তিনি—'আর একমুহূর্তও এখানে থাকলে তোমাকেই খুন করবো। তোমার একটা ব্লান্ডারে অমিতাভ........

হয়তো সত্যি সত্যিই কুকটিকে কয়েক ঘা বসিয়েই দিতেন! তার আগেই তাকে জাপ্টে ধরেছেন অফিসার লাহিড়ী। কুকের যা চেহারা, তাতে ডাক্তারবাবুর শক্তিশালী হাতের এক থাপ্পড় খেলেই উড়ে যাবে!

–নো ডক্টর!...' তিনি কোনমতে ভদ্রলোককে সামলাতে সামলাতে বললেন—'এখন নয়। প্লিজ আপনি একটু বাইরে গিয়ে বসুন। আমরা জেরাটা সেরে নিই।

ডঃ হালদারও এগিয়ে এসেছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে একমাত্র তিনিই পারেন ডঃ চৌধুরীকে শান্ত করতে। কোনমতে তাকে তখনকার মত নিরস্ত করে কিচেন থেকে বের করে নিয়ে গেলেন।ডঃ চৌধুরী যাওয়ার আগে শুধু রক্তচোখে কুকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই না! গেট আউট ফ্রম হিয়ার...গেট আউট..!'

পাচকটির ওতেই অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ভয়েই আধমরা! তার মধ্যেই অফিসার লাহিড়ীর সপাট প্রশ্ন—'বিকেলে যখন তুমি দেখলে যে এখানে ছুরিটা নেই, ঠিক তার আগে কিচেনে কেউ এসেছিল?'

তার মাথা কাজ করছিল না! তবু সামান্য ভেবে বলে—'বাচ্চারা এসেছিল স্যার'।

-'বাচ্চারা!'

—'তিনতলার বাচ্চারা'। পাচকটি জানায়— 'অনেকক্ষণ ছিল এখানে'।

-'কেন এসেছিল?

—'বলছিল যে ওদের বিকেলবেলায় স্যুপ খেতে একদম ভালো লাগে না'। তার মুখে বিরক্তি—'একেকজনের এক এক রকম আবদার। কেউ চাউমিন খেতে চায়, কেউ পিজা! বলুন তো স্যার, এখানে কি ওসব তৈরি করা সম্ভব?'

অফিসার চাউমিন, পিৎজা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না। বরং কঠোর গলায় জানতে চান—'কজন বাচ্চা ছিল?'

—'ঠিক গুনিনি। দল বেঁধে এসেছিল। তবে আট-নজন তো হবেই।

—ওদের মধ্যে দুশো তিনের বাচ্চাটা ছিল? কি যেন নাম?'

—'কুক্কু স্যার'। সে বলে—'আলবাৎ ছিল। ওকে নিয়েই যতো ঝামেলা। ওর কোনও খাবারই পছন্দ হয় না! সর্বক্ষণই 'এটা খাবো না', 'ওটা খাবো না', 'এটা বাজে', 'ওটা পচা' লাগিয়েই রেখেছে!'

অফিসার কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন। তার আর কোনও প্রশ্ন নেই। এভিডেন্স ব্যাগটায় রক্তমাখা ছুরিটার দিকে একবার তাকালেন। ফরেনসিক অবধি যাওয়ার দরকার নেই। তিনি ছুরিটার হাতল ভাল করে চেক করে নিয়েছেন। হাতলে আঙুলের ছাপ নেই! এবং যেভাবে ওটা লাশের বুকে এঁটে বসেছিল তাতে ফরেনসিক প্রথমেই কি বলবে তা তার ভালোই জানা আছে। তিনি স্পষ্ট কল্পনা করলেন ডঃ চ্যাটার্জী বলছেন—— কোনও বাচ্চা ছেলের গায়েই এত জোর থাকা সম্ভব নয়!'

—'হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট সম্পর্কে কি বলছিলেন যেন?'

প্রশ্নটার উদ্দেশ্য ডঃ চৌধুরী। তখন তার মাথার ঠিক নেই। চেষ্টা করছেন নিজেকে শান্ত করার। কিন্তু থেকে থেকে মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। তবু আস্তে আস্তে বললেন—'একজন অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট বলছিল যে রাতে সে একটা লম্বা ছায়াকে একটা লম্বা ছুরি নিয়ে নীচের দিকে যেতে দেখেছে'।

—'লম্বা ছুরি!' অফিসার চিন্তিত মুখে বলেন—'কিন্তু এটা তো লম্বা নয়। বরং বেশ ছোট ছুরি!

—'কিন্তু সে বলেছে, ছুরিটা বড়ই ছিল'।

—'চলুন, তাকেও একবার জেরা করে দেখি।

হ্যালুসিনেশনের রোগীটি বিছানার উপর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। প্রকান্ড চেহারার পুলিশ অফিসারকে দেখে আরও ঘাবড়ে গেল। তোৎলাতে তোৎলাতে বলল—'আমি...আমি কিছু জানি না...আমি খুন করিনি...'।

অফিসার একটা পেল্লায় ধমক দিলেন—'আমি কি বলেছি যে আপনি খুন করেছেন? যা জিজ্ঞাসা করা হয়, তার সঠিক উত্তর দিন। ধমক খেয়ে তার অবস্থা আরও শোচনীয়! সে ফ্যাকাশে মুখে ঠোঁট চাটছে। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নিরাপত্তা খুঁজছিল। ডঃ চৌধুরী তার পাশে গিয়ে বসলেন। সস্নেহে বললেন—'অফিসারকে বলে দিন,

রাতে আপনি কি দেখেছেন?'

সে যেন এবার একটু ধাতস্থ হয়। আস্তে আস্তে বলে—'একটা লম্বা ছায়া... তার হাতে একটা লম্বা ছুরি...'

অফিসার হঠাৎ এভিডেন্স ব্যাগটা তুলে ধরেছেন——‘এই ছুরিটা?’

তিনি ব্যাগটা তুলে দেখাতেই ঘরে শোরগোল পড়ে গেল। হ্যালুসিনেশনের পেশেন্টটি ‘রক্ত রক্ত...ছুরি...ছুরি!' বলতে বলতেই ডঃ চৌধুরীর গায়ে এলিয়ে পড়েছে। অন্যদিকের একটি রোগীও গোঁ গোঁ করতে করতে ধপ্ করে পড়ে গেল! তার দেহ ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে! মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে সাদা ফেনা!

বাদবাকিদের সম্মিলিত ভয়ার্ত চিৎকারে সবার কানের পর্দা ফাটার উপক্রম হল!

অফিসার লাহিড়ী বোধহয় মনে মনে সাইকো কিলারদের কাউকেই সম্ভাব্য খুনী ভেবে রেখেছিলেন। কারণ দোতলার পেশেন্ট যখন তাকে দেখেছে তখন সে একতলার কেউ নয়। দোতলা, তিনতলা বা চারতলা থেকেই তার নেমে আসার সম্ভাবনা বেশি। দোতলায় ঐরকম দীর্ঘদেহী কেউ নেই। তিনতলায় একজন আছে। আর চারতলায় একাধিক আছে।

কিন্তু চারতলায় পৌঁছে যেন ধাক্কা খেলেন তিনি। সবকটা সাইকো কিলারই সেখানে উপস্থিত! কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ বা হেঁটে বেড়াচ্ছে। সবার হাত পায়েই শিকলের শক্ত বেড়ি পরানো। যা নিজে থেকে খুলে ফেলা অসম্ভব!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কোণের ঘরটায় একজনের মুখ। আগেরবার ঘরটা ফাঁকা ছিল! এখন ওখানে নতুন লোক এসেছে।

তিনি টর্চ জ্বেলে কয়েদীটির মুখে আলো ফেললেন। একটা ভয়ঙ্কর মুখ! কুচকুচে কালো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল! দাড়ি গোঁফের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট মোটা ঠোঁট। গালে একটা দগদগে ঘা! চূড়ান্ত কুৎসিত!

–‘ও নতুন এসেছে'। সংক্ষেপে সারলেন ডঃ চৌধুরী—‘এখানে কেউ মিসিং নয়'।

অফিসার এবার নীচের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন—'ফার্স্ট ইনসিডেন্টটার পর একজন নতুন সাইকো এসেছে, একজন নতুন পেশেন্ট এসেছে...

—'একজন নয়। আরও অনেক পেশেন্টই এসেছে'। ভুলটা শুধরে দেন ডঃ চৌধুরী।

—'যাই হোক্। নতুন আরও কেউ এসে থাকলে সেটাও বলে দিন্'। –‘ওঃ হো!’ তার কি যেন মনে পড়ল—‘অর্চিষ্মানের কথা তো একদম ভুলেই গেছি! সে বোধহয় এখনও কিছুই জানে না। আজ রাতে তার অফ ছিল। ওকে সব জানানো জরুরী।

–‘এই অর্চিষ্মানটি কে?’

–‘একজন নতুন ডাক্তার'। তিনি বললেন—‘সম্প্রতিই এসেছে। আজ রাতে ওকে ছুটি দিয়েছিলেন ডঃ খাসনবিশ। সে বোধহয় তার কোয়ার্টারেই আছে।

–‘তার হাইট কি ছ'ফুটের উপরে?’

-'না'।

-'তবে তার সাথে পরে কথা বলা যাবে। আগে তিনতলার ডিপ্রেশনের রোগী আর বাচ্চাদের দেখি'।

তিনি ডঃ চৌধুরীর দিকে ফিরলেন—'ততক্ষণে আপনি দোতলার যে কোনো একটা বড়সড় ঘরে সবাইকে জড়ো করুন। আজ রাতে যারা যারা অনডিউটি ছিল, ডাক্তার- সিস্টার- ওয়ার্ডবয়- পাহারাদার, সবাইকে ওখানে একসাথে দেখতে চাই আমি। অফডিউটির লোকদের সাথে পরে কথা বলব। আর পেশেন্টদের সবাইকে নিজেদের ঘরে থাকতে বলুন। করিডোরে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে যদি আবার কেউ খুন হয়, তবে তার দায় পুলিশ নেবে না। কেউ নিজের কেবিন বা ডরমেটরি ছেড়ে বেরোবে না। দিস্ ইজ মাই অর্ডার'।

ডঃ চৌধুরীর শিঁড়দাড়া বেয়ে হিমবাহের স্রোত বয়ে গেল। আবার তৃতীয় খুনের সম্ভাবনা!

–‘কেউ ঘর থেকে বেরোবে না'। তিনি এস্তব্যস্ত হয়ে নীচের দিকে নেমে গেলেন—‘আমি বলে দিচ্ছি সবাইকে...'

—'কাকু ,... শুনেছ?'

কুক্কু ও পুপু নতুনকাকুর ঘরে সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে ঢুকে পড়েছে। নতুন কাকু তখন বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠ গুনছিল। তার হাত-পা বাঁধা। বাচ্চাদের ডাক শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কুক্কু তার কোল ঘেঁষে বসে কানে ফিস্ফিস্ করে জানায়—'পুলিশ এসেছে'।

–'পুলিশ এসেছে!' কাকু অবাক—'কেন?'

–'জানি না'। পুপু আধো আধো উচ্চারণে বলল——শুটু শুনেঠি পুলিশ এসেঠে'।

আর কিছু বলার সুযোগ মিলল না। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা ভারি বুটের শব্দ করিডোর ধরে এদিকেই এসে পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরে ঢুকলেন ডঃ চৌধুরী, তার পিছনে ডঃ হালদার। আর সবশেষে সিনিয়র ও জুনিয়র অফিসার।

জুনিয়র অফিসারের হাবভাব ভিজে বেড়ালের মত। পেশেন্টের মুখের দিকে তাকিয়েই সে মাথা নীচু করে ফেলেছে। যেন এই মুহূর্তে অন্য কিছু দেখার চেয়ে নিজের বুটের ডগাটা দেখাই বেশি জরুরী।

ডাক্তার দুজনের অসহায় দশা। ডঃ চৌধুরী করুণ মিনতি মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন। ডঃ হালদার বাচ্চা দুজনকে দেখে বললেন—'ও, তোমরাও আছো এখানে'।

অফিসার লাহিড়ী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেপে নিলেন চতুর্দিকটা। বাচ্চাদুটোর দিকে দেখেও যেন দেখলেন না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রোগীটির মুখের দিকে।

–'কিছু মনে করবেন না'। সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন তিনি—— জানেন বোধহয়, আরেকটা খুন হয়ে গেছে। তাই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে'।

'আরেকটা খুন' শব্দটা শুনেই বাচ্চাদুটো ভয়ে কুঁকড়ে গেছে! কুক্কু আর্তনাদ করে মুখ লুকোয় কাকুর বুকে। পুপুর মুখও ফ্যাকাশে। সে দরদর করে ঘামছে! নতুন কাকু দুজনকেই শান্ত করার চেষ্টা করে। তার মুখে চিন্তার ছাপ। এই পরিবেশটা বাচ্চাদের জন্য ঠিক নয়। তাদের মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। কোনও ভাবে পরিবেশটাকে যদি একটু লঘু করে দেওয়া যেত...

সে কিছু ভাবতে ভাবতে বলে—'বলুন'।

–'লোডশেডিঙ হয়ে যাওয়ার সময় থেকে আলো আসা অবধি আপনি কি করছিলেন?'

-'নাচছিলাম'।

এত দুঃখের মধ্যেও ডঃ হালদার ফিক করে হেসে ফেলেছেন। ডঃ চৌধুরী ছাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কিছুই শোনেননি। অফিসার লাহিড়ী রেগে গিয়ে বললেন—'আর ইউ কিডিং! এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নড়াচড়াও করা যায় না! আর আপনি বলতে চান যে, আপনি নাচছিলেন?'

–'যখন জানেনই যে নড়াচড়া করা যায় না...' পেশেন্ট অদ্ভুত রকমের শান্ত—'তখন কি করছিলাম তা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

অফিসার ঢোঁক গিললেন। একটু ভেবে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেন—'এই বাচ্চাদুটো এখানে কতক্ষণ আছে?'

নিরীহমুখে মিথ্যে বলল সে—'লোডশেডিঙের পর থেকেই'।

—'কেন? এত রাতে নিজেদের ঘর ছেড়ে এ ঘরে ওদের আসতে হল কেন?'

কাকুর মুখে একটা দুষ্টুহাসি ভেসে উঠেছে—'আসলে আমি একটু ভীতু মানুষ তো! হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়েছিলাম। তাই ওরা আমাকে পাহারা দিচ্ছিল'।

প্রণবেশ লাহিড়ী তার মুখের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। যেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

–'আপনি বলতে চান যে আপনি ভয় পেয়ে কাঁদছিলেন!' তিনি বাচ্চাদের দিকে নির্দেশ

করলেন—'আর এই দুটো বাচ্চাছেলে আপনাকে পাহারা দিচ্ছিল!'

—'হ্যাঁ' সে সস্নেহে কুক্কু ও পুপুর দিকে তাকায়—'ওরা খুব সাহসী ছেলে!'

অফিসার মনে মনে বললেন—'ওভারস্মার্ট!'

—'আপনার হাইট?

—'ছ'ফুট চার ইঞ্চি'।

অফিসার আর কথা বাড়ালেন না। এখন তার দৃষ্টি বাচ্চা ছেলেদুটোর উপরে পড়েছে।

—'তুমি কুক্কু না?'

কুক্কু মাথা নাড়ল।

অফিসার কর্কশ গলাকে যতদূর সম্ভব নরম করে ফেলেছেন— —'তুমি আজ বিকেলে দলবল বেঁধে কিচেনে গিয়েছিলে?'

-'হ্যাঁ'। বাচ্চাটা ঢোঁক গিলল—'গিয়েছিলাম।

--'কেন?'

-'আমার বিকেলবেলায় স্যুপ খেতে ভালো লাগে না। তাই বলতে গিয়েছিলাম'।

—'তুমি কখনও বাটার নাইফ দেখেছ?'

ডঃ চৌধুরী প্রশ্নটায় আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। অফিসার হাত তুলে তাকে থামালেন।

—'বাটার নাইফ!' কুক্কু প্রায় আকাশ থেকে পড়েছে।

—'হ্যাঁ, এইরকম ছুরি'। অফিসার রক্তমাখা ছুরিটা এভিডেন্স ব্যাগশুদ্ধ সামনের টেবিলে রেখেছেন।

ছুরিটা দেখে আঁৎকে উঠল কুক্কু। পুপু কেঁদে উঠেছে।

—'আপনি কি বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন অফিসার?' ডঃ চৌধুরী ফের অধৈর্য। এই মাথামোটা পুলিশকর্মীটির মাথায় একটা সহজ কথাও কি ঢোকে না! তিনি ফের তাকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে এনেছেন সেখান থেকে—'যথেষ্ট হয়েছে! আর জেরা করা চলবে না। চলুন...চলুন এখান থেকে...'।

জেরা অসমাপ্ত রেখেই বুটের আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। নতুনকাকু কুক্কুর দিকে তাকাল। -'আচ্ছা কুক্কু...' সে বলল- -'তুমি বিকেলে সত্যিই দলবল নিয়ে কিচেনে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ গিয়েছিলাম তো। কুক্কু বলল——ঐ স্যুপ খেতে আমার ভাল লাগে না। একদম পচা খেতে! তাই সবাইকে নিয়ে নালিশ করতে গিয়েছিলাম'।

—'সবাইকে নিয়ে কেন?'

—'আমি একা বললে তো কেউ শুনবে না। তাই সবাই মিলে বলেছি।

—'বাঃ, এ তো রীতিমত নেতাগিরি!' নতুন কাকু হাসল—— এ বুদ্ধি কি তোমার? না কেউ ফুস্যন্তর দিয়েছে?'

—'না, আমার না'। সে পুপুর দিকে দেখায়—'দাদা বলেছিল দল বেঁধে যেতে।

নতুন কাকু উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পুপুর দিকে দেখল—'অ! তাহলে এই দুষ্টু বুদ্ধি তোমার!'

—'হ্যাঁ'। পুপু ফিকফিক করে হাসছে—'আমিই বলেঠিলাম'।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজকালকার বাচ্চারাও এক একটি যন্তর! এই বয়েসেই ইউনিয়নবাজি শিখে ফেলেছে। এ ছেলে বড় হলে নির্ঘাৎ পলিটিশিয়ান হবে!

কুক্কু হাসতে হাসতেই হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ পড়েছে টেবিলের দিকে।ওখানে এখনও রাখা আছে এভিডেন্স ব্যাগ! তার মধ্যে রক্তমাখা ছুরিটা!

—'ও কাকু...'। সে সেটার দিকে দেখিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলে—'ঐ দেখো, পুলিশটা ওটা ফেলে গেছে'।

নতুন কাকুরও সেদিকে চোখ পড়েছে। অফিসার মার্ডার ওয়েপন্টা নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।

—'ওটার দিকে তাকিও না'। সে চিন্তিত গলায় বলে—'অফিসার ডাক্তারবাবুর টানাটানিতে ওটার কথা বোধহয় ভুলে গেছেন। পরে এসে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

—'কিন্টু টোখে পড়টে ডে!' পুপুর ব্যাকুল উত্তর।

—'তাহলে ওটাকে কোথাও সরিয়ে রেখে দাও। এমন জায়গায় রাখো যাতে তোমাদের চোখে না পড়ে।

—'আলমারির মাথায় রেখে দেবো?

কুক্কুর কথায় সে হেসে ফেলেছে। আলমারির মাথায় এই ছোট্ট বাচ্চাটার হাত যাবে কি করে? তার হাত পা খোলা থাকলে সে নিজেই রেখে দিতে পারত। কিন্তু সে উপায় নেই।

—'বাঁটকুল দি গ্রেট!' নতুন কাকু সকৌতুকে বলে—'আলমারির মাথায় তোমার হাত পৌঁছবে কি করে শুনি?'

—'আমি মোট্টেও বাঁটকুল নই!' কুক্কু দুষ্টু দুষ্টু হাসে—'আমি তোমার চেয়েও লম্বা হতে পারি'।

—'তাই নাকি?' নতুন কাকুর চোখে এবার বিস্ময় ও কৌতুহল দুই-ই একসাথে ফুটে উঠেছে—'কি করে?'

-'একদম সোজা।

কুক্কু বিছানা থেকে নেমে এসে প্রথমে এভিডেন্স ব্যাগটা টেবিল থেকে ভয়ে ভয়ে তুলে নিল। তারপর দিব্যি টুক্ করে লাফিয়ে উঠে পড়ল টেবিলের উপরে। তার হাত এবার অনায়াসেই পৌঁছে গেল আলমারির মাথায়।

—'এইভাবে'। কুক্কু উচ্ছ্বল হাসিতে ভেঙে পড়ে। যেন ব্যাপারটা ভারি মজার।

—'এইবার দেখো, আমি তোমার চেয়েও লম্বা!'

নতুন কাকু সবিস্ময়ে তার কান্ডটা দেখল। তারপরই সে চোখ খুঁজেছে। তার বন্ধ চোখের সামনে একতলার করিডোরের চেহারাটা ভেসে ওঠে। করিডোরের প্রত্যেকটি ঘরের সামনে একটা করে দশাসই ঠ্যাঙা বা খিল রাখা। তার পাশেই ফাইল রাখার জন্য একটা কাঠের টেবিল। যেখানে চিরঞ্জীব মিত্র'র দেহ পড়ে ছিল তার সামনেও একটা টেবিল ছিল। এই চিন্তাটা তার মাথায় আগে আসেনি কেন!

সে চোখ মেলে আস্তে আস্তে বলে- -'বুঝেছি'।

কুক্কু টেবিল থেকে নেমে এসেছে। কাকুর কাছে এসে বলল—'কাকু, আজ আমরা এখানেই ঘুমোব? ও ঘরে যেতে ভয় করছে'।

পুপুও মাথা নেড়ে সমর্থন করল কথাটা।

—'হ্যাঁ, এখানেই শুয়ে পড়ো। কাকু বলে—ও ঘরে গিয়ে কাজ নেই'।

পুপু ও কুক্কু দিব্যি গুটিশুটি মেরে তার দুই পাশে শুয়ে পড়ল। নিজেদের মনেই কিছুক্ষণ বক্রবক্ করল। তারপর দুজনেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

নতুন কাকুর চোখে তখনও ঘুম নেই। তার রাতজাগা দুটো চোখে রাজ্যের চিন্তা। যে ছ'ফুট লম্বা খুনীর খোঁজ চলছিল সে যে বাস্তবে নেই তা এই দশ বছরের বাচ্চাটা আজ প্রমাণ করে দিল। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, কেউ একজন টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে সোজা ঠ্যাঙাটা বসিয়ে দিয়েছে ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র মাথা লক্ষ্য করে। এক্ষেত্রে হাইট কোনও ফ্যাক্টর নয়! কোনও বাচ্চা ছেলেও কাজটা করতেই পারে। কোনও সাড়ে পাঁচফুটের লোকও পারে। কারুর ক্ষেত্রেই অসম্ভব নয়।

কুক্কু ঘুমের মধ্যেই কখন যেন আস্তে আস্তে উঠে এসেছে তার বুকের উপর। কচি কচি হাতদুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে তাকে। কি অসহায়, সরল মুখ! ঘুমের মধ্যেই আস্তে আস্তে বলল—'কাকু...আই লাভ ইউ'।

সে তার বাঁধা হাত জোড়া ছেলেটার মাথায় আলগোছে রাখে।

—'মি টু ডিয়ার'।

তার বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই বাচ্চাদুটোকে বাঁচানোর জন্যই এত চেষ্টা, এত

পরিশ্রম, এত ঝুঁকি নেওয়া। তিনটে লোক দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ সে এখনও অন্ধকারে! এখন অন্ধকার আরও বাড়ল বৈ কমল না। হাইটটা বাদ গেল। পূর্ণবয়স্ক লোক এখানে অনেক আছে। এখন ভরসা— শুধু ডঃ চ্যাটার্জীর একটা কথাই —খুনী লেফটি, তথা বাঁ হাতি!

দোতলায় তখন হিপনোসিস রুমে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। লাল উর্দি পরা প্রহরীরা সবাই জানাল যে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তারা কেউ কিছু দেখতে পায়নি। আলো নিভে যাওয়ার আগে শুধু ডে শিফ্‌টের ডাক্তার- ওয়ার্ডবয়- সিস্টারদের তাদের কোয়ার্টারের দিকে যেতে দেখেছে। পেশেন্টদের কাউকে দেখেনি।

একজন ওয়ার্ডবয় জানাল যে, লোডশেডিঙের ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ একজন জুনিয়র ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

–'বুঝলে কি করে যে ওটা ডঃ খাসনবিশই? অন্য কোনও ডাক্তার নন? মুখ দেখতে পেয়েছিলে?'

ওয়ার্ডবয়টি বলল—'মুখ দেখিনি স্যার। তবে অত লম্বা ডাক্তার এখানে দুজনই ছিলেন। ওনার চোখে গোল ফ্রেমের চশমা ছিল। ওরকম উদ্ভট চশমা উনি ছাড়া আর কেউ পরে না। তাছাড়া...

-'তাছাড়া...?'

–'তাছাড়া ওঁর মুখে টর্চের আলো পড়ামাত্রই উনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে একশো থেকে উলটো গুনছিলেন। ডঃ খাসনবিশ ছাড়া আর কেউ ওরকম করে না'।

-'একশো থেকে উলটো গুনছিলেন মানে?'

ডঃ হালদার উলটো গোনার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললেন। অফিসার বলেন —'অভিনব ব্যাপার! তার মানে তুমি যাকে দেখেছ তিনি যে ডঃ খাসনবিশই ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই'।

একজন জুনিয়র ডাক্তার এতক্ষণ সবকথা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বলে ওঠে –'ইম্পসিব্‌ল্! ওটা ডঃ খাসনবিশ হতেই পারেন না!'

অফিসার চোখ কুঁচকে তাকিয়েছেন—'হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন আপনার?'

–'কারণ লোডশেডিঙ হওয়ার আগে থেকে শুরু করে তারও পরে, আন্দাজ আরও কুড়ি মিনিট অবধি তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন'।

–'সে কি!' তিনি সোজা হয়ে বসলেন—'ডক্টর আপনার সঙ্গেই ছিলেন! সে কি করে সম্ভব!'

–'স্যার, বিশ্বাস করুন। উনি আমার সঙ্গেই ছিলেন'। ডাক্তারটি বলে—— অন্যান্য দিন ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত ওনাকে অ্যাসিস্ট করেন। কিন্তু আজ রাতে ডঃ দত্ত'র অফডিউটি ছিল। তাই আমিই স্যারের সাথে ছিলাম। উনি দোতলায় রাউন্ড দিচ্ছিলেন'।

দোতলার সিস্টার ওয়ার্ডবয়রাও সমস্বরে সম্মতি জানাল। ডঃ খাসনবিশকে রাউন্ড দিতে তারাও দেখেছে।

-'লোডশেডিঙ হওয়ার পরও কি উনি রাউন্ডেই ছিলেন?'

—'হ্যাঁ'। জুনিয়র ডাক্তার বলল—'অন্ধকারে বা সামান্য আলোতেও ওঁর দেখতে কোনও অসুবিধে হত না। বরং আলোই তিনি পছন্দ করতেন না। অন্ধকারে বেশি কমফর্ট ছিলেন'।

--'তারপর?'

–'তারপর আরও মিনিট কুড়ি রাউন্ড দেওয়ার পর উনি ওনার কেবিনে ঢুকে গেলেন। আমিও ছিলাম ওঁর সাথে। আমাকে ওষুধ বুঝিয়ে উনি ছেড়ে দিলেন। আমি কেবিন থেকে বেরিয়ে আসি। আর কিছু জানি না!'

অফিসার হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন। এটা কি করে সম্ভব! একজন লোক একই সময়ে দু জায়গায় একই সাথে কি করে উপস্থিত থাকতে পারে! এদের দুজনের মধ্যে কেউ মিথ্যে

বলছে বলে তো মনে হয় না! তাহলে একসাথে দুজন অমিতাভ খাসনবিশ এলেন কোথা থেকে?

এক্ষেত্রে একটা জিনিসই হতে পারে। জুনিয়র ডাক্তারটির সঙ্গে যিনি লোডশেডিঙের আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন, তিনিই আসল ডঃ খাসনবিশ। আর সেই সময়ে যে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে ডক্টরের ছদ্মবেশে ছিল। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের হাবভাব এত সুন্দর রপ্ত করেছিল যে ওয়ার্ডবয়টিও চিনতে ভুল করেছে।

কিন্তু যদি লোডশেডিং না হত তাহলে এই ছদ্মবেশ টিঁকত না। অন্ধকার ছিল বলেই সন্দেহ হয়নি। টর্চের আলোয় একঝলক দেখে চেনা অসম্ভব! কিন্তু টর্চের বদলে যদি জোরালো আলো থাকত তবে হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত সে।

কিন্তু লোকটি জানল কি করে যে তখনই লোডশেডিঙটা হবে? অফিসার লাহিড়ীর সন্দেহ হয়। তার কানে জেনারেটরের ধপ ধপ আওয়াজ তখনও আসছে। অর্থাৎ এখনও কারেন্ট আসেনি।

–'আপনাদের গোটা এরিয়ার পাওয়ার বক্স কোথায় থাকে?' ডঃ চৌধুরী তাকে ইলেক্ট্রিক রুমে নিয়ে গেলেন। জেনারেটর রুমের পাশেই ইলেক্ট্রিক রুম। সার সার মিটার, ফিউজবক্স—সবই এখানে থাকে। এখান থেকেই গোটা এরিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই হয়।

অফিসার একটু খুঁটিয়ে দেখেই মুখ দিয়ে সন্তোষজনক আওয়াজ করলেন। —যা ভেবেছি। লোডশেডিং নয়'। তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন—'ঐ দেখুন, ইলেক্ট্রিকের মেইন তারটাই কেউ কেটে দিয়েছে।

জুনিয়র অফিসারের দিকে ইশারা করছেন তিনি—'দেখো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাও কি না'।

জুনিয়র অফিসার অনেকক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হতাশ গলায় বলে

—'নাঃ স্যার, নেই!'

-'কি ব্যাপার!'

ডঃ চৌধুরী, ডঃ হালদার ও অফিসার লাহিড়ীকে দেখে অর্চিষ্মান যেন প্রায় মহাশূন্য থেকে পড়ল—'এনি এমার্জেন্সি স্যার?

ডঃ চৌধুরী তাকে গোটা ব্যাপারটা খুলে বললেন। শুনে সে স্তম্ভিত! অফিসার লাহিড়ী তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। খুব মামুলি কিছু প্রশ্ন করে জেরা শেষ করলেন। যেহেতু তার আজ অফ ডিউটি ছিল সেহেতু জটিল কোনও প্রশ্ন করেননি।

শুধু চলে যাওয়ার আগে হঠাৎ তার ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুমে রাখা কম্পিউটার টার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'ওটা কি আপনার কম্পিউটার?

-'না...ঠিক আমার নয়...' সে একটু ইতস্তত করে-'আমি আসার আগে থেকেই ছিল'।

—'ইন্টারনেট আছে? আপনি ইউজ করেন?'

অর্চিষ্মান বুঝতে পারল আসলে অফিসার কি জানতে চাইছেন। সে বলে

–'হ্যাঁ। আমি ডেইলি ওটাতে ই-মেল চেক করি'।

—'গুড'।

তিনি আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলেন।

অবশেষে প্রায় ভোর পাঁচটা নাগাদ পুলিশি হাঙ্গামা শেষ হল। যদিও বিশেষ কিছু সূত্রই পাওয়া গেল না। তবু রুটিনমাফিক সব কর্তব্য শেষ করে, লাশ ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে, গাড়িতে চড়ে বসলেন অফিসার লাহিড়ী।

অ্যাসাইলামের গেটে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ির ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া দেখছিলেন ডঃ চৌধুরী ও ডঃ হালদার। ডঃ চৌধুরী অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—'যে বলেছিল, পুলিশ আর যমদূত দুই-ই সমান, সে ঠিকই বলেছিল হালদার'।

ডঃ হালদার আস্তে আস্তে বলেন—'এটা আগে কেউ বলেনি স্যার। আপনিই প্রথম বললেন'।

–‘আমিই প্রথম বললাম?' তিনি করুণ হাসলেন—‘ঠিকই বলেছি।

তার দৃষ্টি এবার রাস্তা ছেড়ে আকাশের দিকে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়েই কি যেন এক অব্যক্ত বেদনায় উচ্চারণ করেন –‘অমিতাভ!’

ডঃ হালদার নীরবে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

৯

দ্বিতীয় মৃত্যুর পর তিনদিন কোনমতে কেটে গেল।

অ্যাসাইলামের পরিবেশ অস্বাভাবিক থমথমে। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের মৃত্যুতে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছেন ডঃ চৌধুরী। তবে তার কর্তব্যে কোনও গাফিলতি নেই। নিয়মমাফিক সকালে সন্ধ্যায় রাউন্ড দিচ্ছেন, রোগী দেখছেন। কিন্তু মুখে সেই শান্ত হাসিটা আর নেই।

এখন অর্চিষ্মান শুধু ডঃ হালদারের সাথেই কাজ করে। ডঃ হালদারের প্রাণবন্ত, খুশি খুশি ভাবটাও কেমন যেন মরে গেছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার! কলা খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক! কেমন যেন প্রাণহীন রোবটের মত কাজ করে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যেই অফিসার লাহিড়ী তাকে ই-মেল করে লাশের ছবি, পোস্টমর্টেমের ফটো সব পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে কম্পিউটারে ছবিগুলো আপলোড করে সেখান থেকে নিজের মোবাইলের মেমোরি কার্ডে নিয়ে নিয়েছে। সেদিন বিকেলেই দুশো চারের ডিপ্রেশনের রোগীটির ঘরে হানা দিল সে। এটা অমিতাভ খাসনবিশের কেস ছিল। দেখছেন ডঃ ধৃতিমান হালদার। এখন দুশো চারের রোগীটি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। অর্চিষ্মানের পায়ের শব্দেও ফিরে তাকাল না। যখন সে একমনে কিছু চিন্তা করে তখন তার চোখটা কেমন যেন রাগী রাগী লাগে। মনে হয়, যেন রেগে আছে। এখন তার চোখে সেই রাগ রাগ ভাব! অর্চিষ্মান নিশ্চিত হয়—সে কিছু সূত্র পেয়েছে। এ দৃষ্টি তার পরিচিত! অর্থাৎ কিছু পাওয়া গেছে।

ডঃ খাসনবিশ তাকে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ হালদারের চিকিৎসাপদ্ধতি আলাদা। তিনি রোগীর হাত পা খুলে দিতে বললেন। এখন তার মিউজিক থেরাপি ও জোরদার মেডিকেশন চলছে। হাত পা খুলে দেওয়া হলেও সে অবশ্য নিজের ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না। ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে তার শরীর খারাপ লাগছে। তাই বেশিরভাগ সময়টাই নিজের ঘরেই কাটায়। আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে চিলড্রেন্স পার্কের দিকে। আজও সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

–‘কেমন আছেন?’ অর্চিষ্মান তার মনোযোগ আকর্ষণ করে—‘শরীর কেমন?’

–‘কি যে ওষুধ দেন আপনারা!’ রোগীটি নিস্তেজ স্বরে বলল—‘সবসময়ই ঘুম ঘুম পায়'।

সে একটু হেসে এদিক ওদিক সন্তর্পণে দেখে নেয়। আশেপাশে এখন কেউ নেই। সেই ফাঁকেই টুক্ করে রোগীটির বুক পকেটে নিজের মোবাইলটা চালান করে দিয়েছে। পেশেন্ট কিন্তু তার দৃষ্টি খেলার মাঠ থেকে ফেরায় না। সেই দিকেই তাকিয়েই খুব নীচু স্বরে বলল—'হঠাৎ বেজে উঠলে কেলেঙ্কারি হবে! ওয়ার্ডবয় সর্বক্ষণই চোখে চোখে রাখছে।

অর্চিষ্মানও ফিসফিস্ করে বলে—'সাইলেন্ট মোডে আছে। বাজবে না। কাল ভোরে এসে নিয়ে যাবো'। তারপরই গলা চড়িয়েছে—'এখন আপনার সুন্দর সুন্দর গান শোনা উচিৎ, সুন্দর সুন্দর ছবি দেখা উচিৎ

-'আমি ছবি দেখে কি করবো?’ রোগীটি শান্তভাবে বলে—‘দেখবে তো উপরওয়ালা!’

অর্চিষ্মান অবাক হয়ে বলে—'উপরওয়ালা?’

সে এবার আয়ত চোখদুটো এদিকে ফিরিয়ে মিষ্টি হাসল। তারপর আঙুল দিয়ে চারতলার দিকে নির্দেশ করে।

–‘ও, উপরওয়ালা!’ অর্চিষ্মান হাসল। সে বুঝেছে।

তার চোখদুটো ফের খেলার মাঠের দিকে ঘুরে গেছে। বাচ্চা ছেলের বায়না জুড়ে দেওয়ার সুরে বলল সে—" –'আমি ওখানে যাবো।

অর্চিষ্মান একটু আমতা আমতা করে—‘কিন্তু আপনার শরীরটা ভালো নেই। নিজেই তো বলছেন—মাথা ঘুরছে।

–‘ঘুরুক। তবু আমি যাবো'। জেদী কণ্ঠস্বরে কথাটা বলেই সে উঠে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু হাতে পায়ে যথেষ্ট জোর না থাকায় টলে পড়ে যাচ্ছিল। অর্চিষ্মান তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে তাকে। তার খারাপ লাগছে! কি অবস্থা লোকটার! তিনদিনেই যেন চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে।

ডিপ্রেশনের ওষুধ গিলে গিলে কাহিল! ডঃ খাসনবিশ তেমন ওষুধ দিতেন না। কিন্তু ডঃ হালদার ভয়াবহ কড়া ডোজের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছেন। খেলেই দেহ অবশ হয়ে আসে। বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করে। সমস্ত নার্ভ শিথিল হয়ে যায়। রোগীর চিন্তাশক্তিটুকুও কেড়ে নেয় এই জাতীয় ওষুধ!

এই পরিস্থিতিতে কোনও পেশেন্টকেই ঘর থেকে বের করা উচিৎ নয়। কিন্তু এ লোকটা যখন একবার জেদ ধরেছে তখন ছাড়বে না।

—'বেশ, চলুন। আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি'।

সে রোগীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তাকে ধরে আস্তে আস্তে সযত্নে ঘরের বাইরে বের করে এনেছে। ওয়ার্ডবয়রা ব্যাপারটা খেয়াল করলেও কিছু বলল না।

রোগীটি ডঃ দত্ত'র কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে। তার দেহের ভারসাম্য যে পুরোপুরি নেই তা দেখলেই বোঝা যায়। হাত পা কাঁপছে! অর্চিষ্মান তার হাত ধরেই বুঝতে পারল যে হাতে তেমন জোর নেই! তালু ঘামছে। সে উদ্বিগ্ন হয়। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? মাথা ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে যদি পড়ে যায়...

তার মনের কথা যেন পেশেন্ট বুঝতে পারে। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ক্লিষ্ট হাসল—'ভয় নেই। পড়বো না। আমি জাতে মাতাল, তালে ঠিক'

সে চাপা গলায় বলে—'কতটা এগোলেন স্যার?'

রোগী সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা মেপে নিচ্ছে—'খানিকটা বুঝেছি। একটা থিওরি ও দাঁড় করানো গেছে। কিন্তু মোটিভ এখনও আননোন্। শুধু থিওরি নিয়ে বেশিদূর এগোনো যাবে না। মোটিভ চাই। প্রমাণ চাই'।

–'তবু...' অর্চিষ্মান বলে—'সাসপেক্টের বর্ণনা অনুযায়ী তো খুনী ছ'ফুট লম্বা! এখানে ছ'ফুট হাইটের তো খুব কম লোকই...'।

–'হাইটের কথা ছাড়ো'। সে একটু দম নিয়ে নেয়। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কথা কখনও জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু বলল—'হাইটটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। খুনী চারফুট থেকে ছ'ফুট—যে কোনও উচ্চতারই হতে পারে'।

–'সেকি! তবে তো সাসপেক্টের সংখ্যা অগুনতি!'

—না, অগুনতি নয়। একটা মোক্ষম পয়েন্ট এখনও বাকি আছে। খুনী একজন লেফট হ্যান্ডার। এখানে নিশ্চয়ই গাদা গাদা লেফ্‌টি নেই। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই অবাধে হেঁটে চলে বেড়াতে পারো। লক্ষ্য করে দেখো যে ডাক্তার-পেশেন্ট-ওয়ার্ডবয়দের মধ্যে কারা কারা লেফ্‌টি'।

—'এই মুহূর্তে দুজন লেফ্ট হ্যান্ডারকেই আমার মনে পড়ছে'। অর্চিষ্মান উত্তেজিত—'ডঃ চৌধুরী আর ডঃ হালদার—দুজনেই লেফ্‌টি। দুজনকেই বাঁ হাতে প্রেসক্রিপশন লিখতে দেখেছি'।

–'ডঃ চৌধুরী আর ডঃ হালদার'! সে একটু ভাবে—'কিছুই অসম্ভব নয়! ওদের দুজনের কাউকে কি কখনও কমলা রঙের শার্ট পরতে দেখেছো?'

অর্চিষ্মানের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। ডঃ হালদারকে কমলা রঙের শার্ট পরতে সে দেখেছে।

–'তাহলে ঐ আট নম্বরের মহিলাটি.... ? –ওঁর সাথে খুনীর কোনও যোগাযোগ নেই এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি। উনি খুনীকেই দেখেছেন। আমাদের সেকেন্ড অপশনটাই সঠিক ছিল। খুনী ওনার সামনে দিয়েই হেঁটে গেছে। যেমন পরের বার অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের পেশেন্টের ঘরের পাশ দিয়ে গেছে'।

অর্চিষ্মান নীরবে তার কথা শোনে।

-'এক্ষেত্রে কমলা রঙের জামাটা একটা ক্লু। একটু খুঁজে দেখো তো...!' সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার দীর্ঘদেহ নুয়ে পড়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—'একটু দাঁড়াও। দম নিয়ে নিই'।

অর্চিষ্মানের রীতিমত কান্না পেয়ে যায়। এমন সুস্থ, সবল মানুষটার ডিপ্রেশনের ওষুধ

খেয়ে কি অবস্থা!

—'ওয়েট...ওয়েট...তুমি ঠিক কোন্ রঙের শার্ট পরেছ? সবুজ না নীল?'

অর্চিষ্মান অবাক—'নীল। কেন?'

–'তবে আমি সবুজ দেখছি কেন?' সে বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার শার্টের দিকে। হতবাক হয়ে চোখ কুঁচকে কি যেন দেখছে। পরক্ষণেই অবাক দৃষ্টিতে মাথার উপর করিডোরের আলোগুলোর দিকে তাকাল। যেন হঠাৎ এগারশো ভোল্টের বিদ্যুত তরঙ্গ বয়ে গেল মস্তিষ্কের মধ্যে! উত্তেজিত স্বরে বলল—'ওঃ ঈশ্বর! এতদিন বুঝিনি কেন? আগেই বোঝা উচিৎ ছিল আমার!'

-'কি স্যার?'

-'করিডোরের আলোগুলো হলুদ! করিডোরের সব আলোই হলুদ!' পেশেন্ট যেন উত্তেজনায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে—'আমার ঘরের আলোটা সাদা। তাই তোমার শার্টের রঙ নীলই দেখেছি। যেটা শার্টটার আসল কালার! কিন্তু করিডোরে বেরিয়ে দেখলাম শার্টটা সবুজ লাগছে! করিডোরের হলুদ আলো নীল শার্টটাকে সবুজ দেখাচ্ছে! এর মানে বুঝলে?'

-'কি?'

-'এর মানে হল...' তার দু চোখ জ্বলে উঠল——— কমলাটা আদৌ কমলা ছিল না। যে রঙটা অঞ্জলি গুপ্ত দেখেছিলেন সেটা অরিজিনালি কমলা নয়! করিডোরের হলুদ আলোয় সেটাকে কমলা লেগেছে। একমাত্র একটা রঙকেই হলুদ আলোর সামনে আনলে কমলা লাগে। লাল! খুনী যে জামাটা পরেছিল সেটা আসলে লাল রঙের। অর্চিষ্মানের সাহায্য ছাড়াই এবার পেশেন্ট গগট্ করে এগিয়ে গেছে। অশান্তভাবে ছট্‌ফট্ করতে করতে বলল—'লাল রঙ...লাল রঙ...কোথায় যেন দেখেছি...কোথায় যেন...'।

অর্চিষ্মান শান্ত গলায় বলে—'তিন জায়গায় দেখেছেন স্যার। ওয়াচ টাওয়ারের গার্ডদের লাল উর্দি। ডঃ চৌধুরী ও ডঃ হালদারের লাল শার্ট। আর ঐখানে...'।

মাঠে বাচ্চা আর তুলনামূলক বড়দের মধ্যে একটা ম্যাচ হচ্ছিল। দুটো টিমে ভাগ হয়ে তারা ক্রিকেট খেলছে। দু দলই জার্সি পরে আছে। বড়দের জার্সির রঙ কালো। বাচ্চাদের দলের গায়ে লাল রঙের জার্সি!

পেশেন্ট থম্‌কে দাঁড়ায়। অর্চিষ্মানের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—'রাইট!'

তার মুখে একটা অসহায়তা ছায়া ফেলল। প্রত্যেকবারই বাচ্চারা কোনও না কোনও ভাবে কেসটার সাথে জড়িয়ে পড়ছে কেন!

কুক্কু মাঠে ব্যাট করতে নেমেছিল। তার পরণে লাল জার্সি। সে তার দাদার মত অত ভালো ব্যাটসম্যান নয়, কিন্তু খুব খারাপও খেলে না! অথচ আজকে তার পারফরম্যান্স দেখে অবাক হল অর্চিষ্মান। সে যেন বলটা ঠিকমত দেখতেই পাচ্ছে না! একটা দুটো বল কোনরকমে নড়বড় করতে করতে খেলল। রোগীটির দৃষ্টি আপাতত তার দিকেই নিবদ্ধ। কুক্কু যেন ঠিকমতন নড়তে চড়তেই পারছে না। ভীষণ আড়ষ্ট!

——'ছেলেটার ব্যাডপ্যাচ চলছে'। রোগী দুর্বল স্বরে স্বগতোক্তি করে—'জঘন্য ফুটওয়ার্ক। টাইমিং আরও খারাপ! এক্ষুনি বোল্ড হল বলে'।

তার কথা শেষ হতে না হতেই কুক্কু আউট! একদম ক্লিন্ বোল্ড! স্কোর জিরো!

—'ক্যাপ্টেন সাহেব শেষে হাঁস নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন!' তার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসিটা ভেসে ওঠে। অর্চিষ্মান আড়চোখে তার রোগীর দিকে তাকিয়েছে। তার হাল খারাপ! যেন অতিকষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। তার মধ্যেও রসিকতা করার অভ্যেস যায়নি! সেই অবস্থাতেই বলল—'কুক্কুর জায়গায় এবার পুপু নেমেছে। 'ট' 'ট' করলে কি হবে? ব্যাটা ভালো খেলে'।

তার কথাকে সত্যি প্রমাণ করে পুপু ওভারের তৃতীয় বলটাতেই সজোরে ব্যাট হাঁকাল। পরের বলটা বাউন্সার! একদম ওস্তাদ ব্যাটসম্যানের মত ডাক্ করেছে। পঞ্চম বলটা হাফ ভলি। আবার সজোরে ব্যাট চালাল সে। বল একদম ব্যাটের মাঝখানে লেগে কড়াৎ করে

শব্দ করল। এবার ওভার বাউন্ডারি! লাল রঙের জার্সি পরা বাচ্চাগুলো উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছে।

উল্টোদিক থেকে কুক্কু জিরোতেই আউট হয়ে বিষণ্নমুখে হেঁটে আসছিল। 'নতুন কাকু'কে দেখতে পেয়েই বিমর্ষ মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে। 'কাকু...কাকু...' বলে ডাকতে ডাকতে এদিকেই ছুটে এলো।

কাকুও সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চাটা একেবারে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে। কাকু একটু হাসার চেষ্টা করে।

–'কি হল নিধিরাম সর্দার? গোল্লাতেই আউট!'

—'তোমার নতুন ব্যাটটাই পচা!' কুক্কু অনুযোগ করে—'একদম বাজে'।

অর্চিষ্মান অবাক হয়ে তাকায়। নতুন কাকু কুক্কুকে নতুন ব্যাট গিফট করেছে, এই তথ্যটা তার জানা ছিল না! কাকু কুক্কুর মাথার চুল সস্নেহে ঘেঁটে দিতে দিতে বলল— –'পুঁচকিটার নতুন ব্যাট হারিয়ে গেছে বলে দুঃখে মরছিল। তাই আমি ডঃ হালদারকে বলে দুদিন আগেই আরেকটা ব্যাট আনিয়ে নিয়েছি। সেটাই ব্যাটাকে গিফট্ করেছিলাম। নিজে খেলতে পারে না, আবার ব্যাটকে দোষারোপ করা হচ্ছে!'

—'না, ওটা পচা ব্যাট'। বলেই কুক্কু উৎকন্ঠিত দৃষ্টিতে তাকাল কাকুর দিকে—'তোমার শরীর এখন ভালো?'

—'কেন? আমার আবার কি হল?' কাকুর চোখে কৌতুক।

–'সকালবেলা আমরা তোমার ঘরে গিয়েছিলাম'। কুক্কুর মুখে খই ফুটছে—'তুমি চোখ বুজে শুয়েছিলে। কত ডাকলাম। তুমি শুধু 'উঁ..উঁ.......হুঁ.......হুঁ.......' করে গেলে'।

-'তোমরা এসেছিলে?' সে অবাক হয়ে বলে—'কই, টের পাইনি তো!'

—'এসেছিলাম তো'। কুক্কু বলল—'কত ডাকলাম। তুমি শুধু 'হুঁ...হুঁ' করলে। তারপর ঐ কালো রাক্ষসটা এসে আমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল'।

কুক্কু একটি কালো রঙের দশাসই চেহারার ওয়ার্ডবয়কে 'কালো রাক্ষস' বলে ডাকে। সে অবিকল ওয়ার্ডবয়টির হাবভাব নকল করে গম্ভীরভাবে বলে——— বলল যে—'কাকুর শরীর খারাপ। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন। কাকু ঘুমোচ্ছে। এখন হাঁকডাক করে তাকে জ্বালিওনি বাপু! যাও, নিজেদের ঘরে গিয়ে খেলা করো গে!' কুক্কু নরম হাতদুটো দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে—'তোমার কি হয়েছে?'

—'কিচ্ছু না।

–'তাহলে আমাদের সাথে খেলবে?' তার মুখ বিষণ্ন—'দাদা ছাড়া আর কেউ খেলতে পারছে না! তুমি আমাদের হয়ে না খেললে আজ আমরা হারবো।

অর্চিষ্মান সভয়ে তার রোগীর দিকে তাকায়। এই অবস্থায় ক্রিকেট! ডঃ হালদার জানতে পারলে তাকে মেরেই ফেলবেন! আর যদি কোনমতে খারাপ কিছু হয়ে যায়! অপোনেন্টের বোলিং ভয়াবহ হচ্ছে। একটা বাউন্সার যদি বেকায়দায় লাগে...

পেশেন্ট কিছু বলার আগেই সে হাঁ হাঁ করে ওঠে—'একদম না! এই অবস্থায় আপনাকে নীচে নামানোটাই রিস্কি! তার উপর ক্রিকেট! ডঃ হালদারের কানে গেলে আমায় আস্ত রাখবেন না। কুক্কু, কাকুকে আজ ছেড়ে দাও। অন্য কোনও দিন হবে।

কুক্কুর মুখ ম্লান হয়ে যায়। নতুন কাকুর ভীষণ অবসন্ন লাগছিল। মনে হচ্ছে এখনই তাকে একটা বালিশ এনে দিলে ভালো হয়। তবু সে কুক্কুর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে! এখন পৃথিবী উলটে গেলেও ম্যাচটা তাকে খেলতেই হবে। স্নেহ কি বিষম বস্তু!

—'আমি খেলবো।

যে শব্দদুটো শোনার ভয় পাচ্ছিল অর্চিষ্মান ঠিক সেই দুটো শব্দই উচ্চারণ করল তার পেশেন্ট।

–'কিন্তু...এই অবস্থায়...'

তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছে কুক্কুর 'নতুন কাকু'–'কোন কথা হবে না'। সে কুক্কুর

দিকে তাকাল—— আমি খেলবো, শুধু তোমার জন্য। কিন্তু তারপর তোমায় আমার জন্য একটা কাজ করে দিতে হবে। করবে তো?'

–'কি কাজ?' কুক্কু কৌতুহলী

—'এখন বলবো না। করবে কি না বলো'।

সে ম্যাচের অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। পুপুর উল্টোদিকের উইকেটে কেউ দাঁড়াতেই পারছে না। প্রতিপক্ষের বোলাররা পটাপট উইকেট তুলে নিচ্ছে।

—'ওকে'। বাচ্চাটা মাথা ঝাঁকাল—'করে দেবো,প্রমিস। কিন্তু যদি জিতি তবেই...'।

নতুন কাকু হেসে ফেলেছে—'বোঝো! এখানেও টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস্ অ্যাপ্লাই হচ্ছে! বেশ, জিতবো। কিন্তু তারপর প্রমিস মনে থাকবে তো?'

কুক্কু সরলভাবে মাথা নাড়ে। ——'ঠিক আছে। চলো, জিতে আসি'

অর্চিষ্মান তাকে নিরস্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে না। জানে, এই মানুষটিকে বুঝিয়ে লাভ নেই। সে শুধু উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিজের পেশেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকে! এই অবস্থায় ক্রিকেট খেলবে কি করে? এখনও আচ্ছন্নের মত টলে টলে হাঁটছে! তার বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। যদি কিছু হয়ে যায় তবে রক্ষা নেই। উল্টোদিকের বোলাররাও ছেড়ে কথা বলছে না!

সে টেনশনে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করল। ভুলে গেল যে এটা ব্যাড ম্যানার!

পুপুর উল্টোদিকের দুজন ব্যাটসম্যান পরপর আউট হয়ে যাওয়ায় সেই জায়গাতেই নয় নম্বরে নতুন কাকু খেলতে নামল। প্রতিপক্ষ দল বাচ্চাদের দলে একজন বড়কে নিয়ে আপত্তি তুলল না। তারা জানত যে এটা অসম খেলা হচ্ছে। এবং ম্যাচ পুরো পকেটে। এই পরিস্থিতিতে এইটুকু উদারতা দেখাল বটে। কিন্তু নতুন ব্যাটসম্যান নামতেই পরপর দুটো ডেলিভারি ইয়র্কার!

থার্ডবলটা পড়তেই আঁৎকে উঠল অর্চিষ্মান! কি সর্বনাশ! এটা একটা মোক্ষম বাউন্সার! নতুন কাকু বসে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু অতবড় লম্বা চেহারাটার বসতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই বলটা তীব্রগতিতে আছড়ে পড়ল তার বুকে! লাগল তার, কেঁপে উঠল অর্চিষ্মান! তার নিজেরই হাত পা ঠান্ডা হওয়ার উপক্রম! বলটা যথেষ্ট জোরে লেগেছে!

ধাক্কাটা সামলাতে না সামলাতেই আবার বল! আবার বাউন্সার! এবার ব্যাটস্ম্যান বিদ্যুৎগতিতে মাথা সরিয়ে নিয়েছে! নয়তো নির্ঘাৎ থুৎনিতে লাগত। পরের বলটা ফুলটস্ কিন্তু পেট লক্ষ্য করে!

একটা আস্ত ওভার মেইডেন গেল! অর্চিষ্মানের ইচ্ছে করছিল বোলারগুলোকে গিয়ে চাবকাতে। এটা কি বডিলাইন হচ্ছে না কি! বয়েসে বড়ো বলে নতুন ব্যাটস্ক্যানের শরীর লক্ষ্য করে বল করতে হবে! সে অসহায় ভাবে নতুনকাকুর দিকে তাকায়। এর মধ্যেই সে ঘেমে নেয়ে একসা! যে বলটা পেটে লেগেছিল সেটাও বেশ জোরে। কিন্তু এখন আগের তুলনায় ধাতস্থ লাগছে তাকে। পরের ওভারের বোলারটি ফের তার মাথা লক্ষ্য করে বল ছুঁড়তেই সে মুখ সরিয়ে বলটা এড়িয়ে গেল। কিন্তু এবার তার বডি ল্যাংগুয়েজ অন্যরকম! সে ঠান্ডা দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল বোলারকে। পরের বলগুলো কোনমতে সামলে নিয়েছে। কিন্তু পঞ্চম বলটা শর্টপিচ পেয়েই স্টাইলিশ এক মার! বল মাঠ চিরে একদম বাউন্ডারি পেরিয়ে গেল।

লাল জার্সি পরা বাচ্চাগুলো লাফিয়ে উঠে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে। নতুন কাকু একবার রাগ রাগ চোখে বোলারদের মেপে নিল। তার হাত এখন আর কাঁপছে না। চোয়াল শক্ত! পরের বলটার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত! আবার বিদ্যুৎগতিতে একটা ইয়র্কার এলো। কিন্তু ইয়র্কারটাকে পড়তেই দেয় নি সে। বরং কয়েক পা এগিয়ে এসে সেটাকে স্রেফ ঘুরিয়ে সবার মাথার উপর দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিল।

ওভার বাউন্ডারি!

এরপরে যা ঘটতে শুরু করল তা এককথায় অবিশ্বাস্য! দুদিকের ব্যাটসম্যানই বেধড়ক

পেটাতে লাগল কালো জার্সি পরা বোলারদের। পুপু এমনিতেই ভালো ব্যাটস্ট্যান। ফর্মেও আছে। কিন্তু নতুন কাকু একদম বিধ্বংসী। যেন এনকাউন্টারের মুডে আছে। সে সেই অবসন্ন, আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ঠান্ডা মাথায় বোলারদের খুন করতে শুরু করল। একের পর এক ছয়-চার! যাকে বলে ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন দেখানো! বোলাররা ভেবে পাচ্ছে না যে বলটা কোথায় ফেলবে!

অর্চিষ্মানের সন্দেহ হয়। কেসের পিছনে এই ম্যাচ জেতার ভূমিকা কি কোনও ভাবে আছে? ম্যাচ জিতলে কুক্কু নতুন কাকুর একটা কাজ করে দেবে বলেছে! সেই কাজটা করানোর জন্যই কি এই মরণপণ লড়াই! কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা শুধু ঐ বাচ্চাটার পক্ষেই করা সম্ভব! এই লোকটা বিনা কারণে এতবড়ো রিস্ক নিচ্ছে কেন? কি করাতে চায় বাচ্চাটাকে দিয়ে!

মাথায় অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছিল। সে সব চিন্তা ছেড়ে ম্যাচের দিকে মনোনিবেশ করে। পুপু চমৎকার দুটো ওভার বাউন্ডারি মেরে কালো দলের কফিন তৈরি করে ফেলেছে। একটা সিঙ্গল নিয়ে এখন সে নন্ স্ট্রাইকিং এন্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আর পাঁচ রান দরকার। এখনও হাতে দু ওভার বাকি। জিত নিশ্চিৎ।

নতুন কাকু অবশ্য বাকি বলের অপেক্ষায় থাকল না। একটা ফুলটস্ পেয়েই সোজা এক ছক্কা হাঁকিয়েছে। কালো দলের কফিনের শেষ পেরেকটা সে-ই ঠুকল। দুর্দান্ত ওভার বাউন্ডারি উইনিং শট হিসাবে মেরে হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানেই বসে পড়েছে। দেখেই মনে হয়, তার দেহে আর শক্তি নেই!

বাচ্চারা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হারা ম্যাচ এভাবে জিতে যাবে তা ভাবেনি লাল দলের ক্যাপ্টেন কুক্কু। তাদের উচ্ছ্বাসের ধাক্কায় মাঠের উপরই চিৎ হয়ে পড়ে গেছে নতুন কাকু। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তার উপর বাচ্চাদের দল আনন্দে লাফালাফি, নাচানাচি করছে। তাদের হিরোটি আদরে, অত্যাচারে ততক্ষণে বিপর্যস্ত!

অর্চিষ্মান সেই ভিড় ঠেলে কোনওক্রমে নিজের পেশেন্টকে উদ্ধার করে। সে চোখ খুঁজে জোরে জোরে শ্বাস টানছে। অর্চিষ্মানের কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়ায়। কুক্কুর দিকে তাকিয়ে বলল—'জিতে গেছি কিন্তু। প্রমিস মনে আছে?'

-'হ্যাঁ'।

-'গুড'।

বলতে বলতেই সে অর্চিষ্মানের কাঁধে মাথা রেখে নেতিয়ে পড়ে। অবসন্ন, অসহায় কণ্ঠে বলল—'এই ডিপ্রেশনের ওষুধগুলোর কিছু করো...প্লিজ কিছু করো...সিস্টার-ওয়ার্ডবয়রা ধরে ধরে গিলিয়ে দেয়। ওষুধ ফেলতে, বা স্কিপ করতে পারছি না। আর পারছি না...আর পারছি না...'

সে পেশেন্টকে ধরে ফেলে নীচু স্বরে বলে—‘এত বড়ো রিস্ক নিতে গেলেন কেন স্যার? যদি কিছু হয়ে যেত তবে ডঃ হালদারকে কি জবাব দিতাম!’

—পরীক্ষা করে দেখছিলাম যে ডন ব্র্যাডম্যানের ডিপ্রেশন থাকলে তার কি দশা হত!’ পেশেন্ট ক্ষীণস্বরে অতিকষ্টে জানায়— ভাগ্যিস ভদ্রলোকের ডিপ্রেশন ছিল না'...।

বলতে বলতেই সে অজ্ঞান! শেষ মন্তব্যটা শুনে অর্চিষ্মান হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না!

আরেকজনও তিনতলার জানলা দিয়ে গোটা খেলাটাই দেখছিল।

ডঃ হালদার পেশেন্ট ভিজিটে এসেছিলেন। পেশেন্টের ঘর ফাঁকা দেখে কৌতুহলী হয়ে জানলায় চোখ রাখলেন। সেখানে ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। যা দেখলেন তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! তাড়াতাড়ি একজন ওয়ার্ডবয়কে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখালেন।

–‘আমি যা দেখছি, তুমিও কি তাই দেখছো?

ডঃ হালদারের প্রশ্নে ওয়ার্ডবয়টি ঘাবড়ে যায়। ডাক্তারবাবু কি তার চোখ টেস্ট করছেন!

ভয়ে ভয়ে সে জানতে চায়—'কেন স্যার?’

—'আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না!' ডঃ হালদার বিড়বিড় করে বলেন—'পুপুর উল্টোদিকের যে লম্বা ব্যাটস্ম্যান বোলারদের তুলোধোনা করছে, সে কি এই দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্ট!'

ওয়ার্ডবয়টি খুব খুঁটিয়ে দেখে। কোনও সন্দেহই নেই যে সে দুশো চারের পেশেন্টই বটে। এরকম লম্বা আর ওয়েলবিল্ট চেহারা এখানে আর কারুর নেই!

—'আনবিলিভেল্'। তিনি বলেন—'সকালে বিকেলে ঠিকমত ওষুধ দিচ্ছ? পেশেন্ট ওষুধ স্কিপ করছে না তো?'

—'স্কিপ করার কোনও চান্সই নেই স্যার'। ওয়ার্ডবয় জানায়—'আমরা পেশেন্টের হাতে পর্যন্ত ওষুধ দিই না। আপনার অর্ডার মত নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাইয়ে দিই'

-'তবে এতো হেভি ডোজের ওষুধ খেয়েও সে মাঠে গিয়ে এরকম ধুন্ধুমার ক্রিকেট খেলছে কি করে?' ডঃ হালদারের চোখ সন্দেহতীক্ষ্ণ—'এই ওষুধ খেয়ে পেশেন্টরা নড়তে চড়তেও পারে না। অথচ এই লোকটি রীতিমত মেজাজে ক্রিকেট খেলছে! এটা কি করে সম্ভব!'

ডঃ হালদারের মুখ কুটিল হয়ে ওঠে। এত বছর ধরে ডাক্তারি করে আসছেন। কোন্ ওষুধের কি এফেক্ট তা তার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। যা ওষুধ দিয়েছেন তাতে পেশেন্টের বিছানা থেকে ওঠার উপায়ই থাকে না! অথচ এই রোগীটি শুধু বিছানা ছেড়ে ওঠেই নি, মাঠে গিয়ে পেশাদার প্লেয়ারদের মত ক্রিকেট খেলছে!

—'ওকে মাঠে কে নিয়ে গেল'?

—'ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত স্যার'।

—'আচ্ছা'। তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন না। তার মনের মধ্যে তীব্র সন্দেহ। ঐ লোকটি কোনও সাধারণ পেশেন্ট নয়। হয়তো পেশেন্টই নয়! পেশেন্টের ছদ্মবেশে অন্য কেউ! ডঃ হালদারের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কিছু করা দরকার। সত্যিই কি সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? সত্যিই কি সে নিজের হাতের শিরা কেটেছে? দেখা দরকার! লোকটা সন্দেহজনক! হয়তো তার এখানে এসে পেশেন্টের ভেক ধরার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক্-লোকটাকে থামানো দরকার।

বিকেলের নরম রোদ এসে পড়ছিল ডঃ হালদারের মুখে। তার মুখ এইমুহূর্তে ভীষণ ক্রুর ও নিষ্ঠুর লাগছে। তিনি ঐ ঘর ছেড়ে নড়লেন না।

একটু বাদেই অবশ্য খেলা থেমে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ওয়ার্ডবয়দের গলার আওয়াজ ও ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত'র কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন। এক মিনিট বাদেই ওয়ার্ডবয়রা আর ডঃ দত্ত মিলে ধরাধরি করে পেশেন্টকে নিয়ে এসে ঢুকল

ঘরে ঢুকেই সামনে ডঃ হালদারকে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় অর্চিষ্মানের! উনি কি মাঠের দৃশ্যটা দেখেছেন? সে ভয়ে গুটিয়ে গেল। যদি ডঃ হালদার সবটা দেখে থাকেন তবে আজ তার কপালে দুঃখ আছে।

সে আমতা আমতা করে বলে—'স্যার, পেশেন্ট ভীষণ জেদ ধরেছিল...তাই বাধ্য হয়েই...'।

—'ভালোই করেছ'। অপ্রত্যাশিতভাবে ভীষণ ঠান্ডা উত্তর দিলেন ডঃ হালদার—'বাইরের হাওয়াও গায়ে লাগানো জরুরী। কাঁহাতক আর ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে'।

অর্চিষ্মান হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, ভদ্রলোক রাগ করেননি।

—'পেশেন্ট কি সেন্সলেস?'

—'প্রায় তাই স্যার। অতটা প্রেশার নিতে পারেনি। একদম ফ্যাটিড হয়ে গেছে'।

—'ফাইন'। ডঃ হালদার ওয়ার্ডবয়দের চলে যাওয়ার ইশারা করেন। তারা মাথা নেড়ে চলে গেল।

—'গুড'। তিনি প্রায় আদেশ দেওয়ার সুরে বললেন—'ওর হাতের ব্যান্ডেজটা খোলো। আমি দেখতে চাই হাতটা কতটা কেটেছে।

ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যায়। ডঃ হালদার এরকম ভাবে কথা বলছেন কেন? তার কি কোনরকম সন্দেহ হয়েছে?

অর্চিষ্মান বাধ্য হয়েই রোগীর হাতের ব্যান্ডেজ খুলে দেয়। রোগী তখনও অচেতন! তার মুখটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। অবসন্নতার ফ্যাকাশে আভা মুখটাকে পীতাভ করে তুলেছে।

ডঃ হালদার খুব মন দিয়ে তার হাতের ক্ষতস্থান পর্যবেক্ষণ করছেন। ভয়ঙ্কর কাটা! তার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। নাঃ, হিসেব তো মিলছে না! যে এইভাবে হাত কাটে সে যে মরার জন্যই হাত কেটেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম ভাবে হাত কাটলে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। ক্ষতস্থান প্রায় রেডিয়াল আর্টারি ছুঁয়েই ফেলেছিল। কপালগুণে সেটা ফস্কে গেছে!

একমাত্র সুইসাইডাল পেশেন্টই মারাত্মক ডেসপারেট হয়ে গেলে এইরকম ভাবে হাত কেটে ফেলে!

–'ঠিক আছে'। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বলেন—'ডঃ সিঙ্ঘানিয়ার ফাইলটা একবার দাও। সেটাও একটু দেখে নিই।

অর্চিষ্মান বিনাবাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করে। ডঃ সিঙ্ঘানিয়া রিপোর্টে বড় বড় করে লিখেছেন যে পেশেন্ট কুড়িটা ক্যাম্পোজ খেয়েছিল! তার সমস্ত ডিটেল্স্ ও দেওয়া আছে। এবং রিপোর্ট আর ডিটেলগুলো কোনটাই জাল নয়।

–'ঠিক আছে'। তিনি ফাইলটা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন। তার কপালে এবার মস্তবড় ভাঁজ। একটু আগেই স্বচক্ষে যা দেখেছেন তার সাথে পেশেন্টের স্টেটাস মিলছে না। সে দুবারই মারাত্মক সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট করেছিল। তৃতীয়বার এই অ্যাসাইলামেই এসে করেছে। ঘটনা বলছে, সে সত্যিই সুইসাইডাল পেশেন্ট। তিনটে অ্যাটেম্পটের যে কোনও একটাতেই মরতে পারত! শুধুমাত্র ছদ্মবেশ ধরার জন্য কেউ নিজের প্রাণটাকে এভাবে বাজি রাখতে পারে না! যে পারে, সে মানুষই নয়!

কিন্তু তবু সন্দেহটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না ডঃ হালদার। একটু আগেই যা দেখেছেন সেটাও মিথ্যে নয়! কিছুই বলা যায় না। সবই সম্ভব! কোনও রিস্ক নেওয়ারই দরকার নেই!

–'আমি ওষুধ পালটে দিচ্ছি'। তিনি বাঁহাতে প্রেসক্রিপশন লিখছেন—'আজ রাত থেকেই এগুলো চলবে'।

ওষুধের নাম গুলো দেখেই অর্চিষ্মান স্তম্ভিত হয়ে গেল! আরও কড়া ডোজের ওষুধ! আরও বেশি শক্তিশালী। সে শায়িত মানুষটির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়। এগুলো খেলে লোকটা মরে যাবে! ডঃ হালদার কি করতে চাইছেন!

—'আজ থেকেই এই মেডিকেশন চালু করে দাও। আর হ্যাঁ, এবার থেকে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধগুলো দেবে'। ডঃ হালদার বলেন—'ওয়ার্ডবয়দের বিশ্বাস নেই। কড়া নজরে রাখবে যাতে কোনভাবেই পেশেন্ট ওষুধ স্কিপ করতে না পারে। আমি দেখতে চাই না, এই ওষুধ খেয়েও সে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে'।

—'ওকে স্যার'। সে আশ্বস্ত হয়। অজান্তেই ডঃ হালদার ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব ভুল লোককে দিয়ে ফেলেছেন। অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এর একটা ওষুধও পেশেন্টের পেটে যাবে না!

১০

—'হো-য়া-ট!'

গভীর রাত্রে চারতলার এক সাইকো কিলার প্রায় লাফিয়ে ওঠে—'এটা কি করে সম্ভব! ইম্পসিব্‌ল্'।

একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি তার সেলে ঢুকে পাশেই বসেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরেছে—'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌..! আস্তে! অ্যাসাইলামের সবাইকে এখানে ডেকে না আনলে কি শান্তি হচ্ছে না!'

কয়েদীটি অপ্রস্তুত হয়ে কাতরভাবে 'উঁ..উঁ...'শব্দ করে।

-'হ্যাঁ...হ্যাঁ...বুঝেছি'। সে তাকে ছেড়ে দেয়—'কিন্তু ফের চ্যাঁচালেই মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দেবো।

সাইকো কাঁচুমাচু মুখে নীচু স্বরে বলে—'এত খ্যাঁচখ্যাঁচ করছ কেন? ওটা তো তোমার স্বভাব নয়! বরং ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট বলেই জানতাম'।

—'ওষুধ গিলে গিলে আমার মাথা ঘুরছে'। ছায়াটা বিরক্ত হয়ে বলল—'তার উপর রাত তিনটের সময় আপনার এই উদ্ভট ডায়লগ! ইম্পসিব্‌ল্! কি করে সম্ভব! ব্লাঁ ... ... ব্লাঁ...ব্লাঁ...!'

-' কি আশ্ .... আউচ!'

কথাটা ফের উচ্চস্বরে বলে ফেলেছিল সে। অন্যজন তাকে একটা মোক্ষম খোঁচা মেরে থামিয়েছে—'চুপ! একটা কথাও কি আস্তে বলতে পারেন না আপনি!'

যথাসম্ভব ফিসফিস করে বলে কয়েদী—'সরি। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে ওটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

-এবার ফের জোরে কথা বললে স্রেফ গলা টিপে ধরবো'। ছায়ামূর্তিটি গজগজ করে—'বলুন, কি বলছিলেন?' —'মোবাইলের ফটোটা একটু জুম করো দেখি। মার্ডার ওয়েপনটার উপর ফোকাস করো'।

মোবাইলের ছবি বড় হল। লাশের গায়ে বিঁধে থাকা ছুরিটা এখন অনেক বেশি স্পষ্ট।

—'অদ্ভুত!' সাইকো অবাক হয়ে বলে——আশ্চর্য! খুনী ছ'ফুট থেকে তিনফুটের কি করে হয়ে গেল সেটাই বুঝতে পারছি না!'

এরকম বিদঘুটে মন্তব্য শুনে ছায়াটা প্রথমে কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল——মানে? খুনীর উচ্চতা তিনফুট! কে পাগল হল বুঝতে পারছি না। আপনি না আমি?'

—'ছবিটা ভালো করে দেখো'। সে নিজের আঙুল মোবাইলের স্ক্রিনের উপরে রাখে—'ছুরি মারার ডাইরেকশনটা দেখেছ? বাঁটটা লক্ষ্য করো। নীচ থেকে উপরের দিকে গেছে। এর মানে হল খুনী ভিকটিমের চেয়ে বেঁটে'।

—'হতেই পারে। অমিতাভ খাসনবিশ রীতিমত লম্বা লোক ছিলেন। খুনী তার চেয়ে বেঁটে হওয়াই স্বাভাবিক। এতে 'আশ্চর্য', 'ইম্পসিব্‌লের' কি হল? আর কি ভাবেই বা প্রমাণ হয় যে তার উচ্চতা তিনফুট! ছ'ফুটের চেয়ে বেঁটে, পাঁচ আট, পাঁচ দশ, সাড়ে পাঁচ—যে কোনও দৈর্ঘ্যই হতে পারে। তিনফুটই কেন হতে হবে?'

—'যে কোনও দৈর্ঘ্যই হতে পারত যদি ডঃ খাসনবিশ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুন হতেন'। কয়েদী জানায়—'কিন্তু আশ্চর্যের এই যে খুন হওয়ার সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন না। বরং চেয়ারে বসে ছিলেন'।

—'সেটা আবার কি করে বোঝা গেল?'

—'আবু হোসেন, জাগো...জাগো...!' কয়েদীটি হাসছে—'ঝিমোতে ঝিমোতে ছবি দেখলে এই হয়। এই দেখো, লাশের পিছনের চেয়ারটা একদম বড়ির সমান্তরালে পড়েছে। একদম পাশাপাশি পড়ে আছে চেয়ার আর লাশটা। এটা তখনই সম্ভব যখন ভিকটিম চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়ে। চেয়ারটা অন্যভাবে পড়লে এরকম পাশাপাশি পড়ত

না। সে হিংস্র হাসে—'বুঝেছ? না ডেমো দেখাবো? এক্ষুনি ধাক্কা মেরে যদি তোমায় খাটটা শুদ্ধ উলটে ফেলি তবে...'।

—সেরেছে!' ছায়ামূর্তি আঁৎকে ওঠে—'ডেমো দেখিয়ে কাজ নেই। বুঝেছি।

–বাঃ, এই তো বুদ্ধি খুলেছে। এইবার ধরো, আমি তোমায় খুন করতে চলেছি। তুমি নিজে ছ'ফুটের উপর লম্বা। আমি অনেকটাই বেঁটে। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যদি তোমাকে ছুরি মারি তবে সেটা এরকমই নীচ থেকে উপরের ডাইরেকশনে যাবে। কিন্তু, যখন তুমি বসে আছো, তখন যদি মারতে যাই...'। কয়েদীটির হাতে মার্ডার ওয়েপন ধরা। সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুরিটা বসিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে—— তবে এই দেখো, ছুরিটা উপর থেকে নীচের দিকে যাচ্ছে। নীচ থেকে উপরে নয়—উপর থেকে নীচে। এক্ষেত্রে তুমি আমার থেকে যতই লম্বা হও, বসে থাকার দরুণ আমার বেঁটে হওয়া ফ্যাক্টর নয়। আমি ঐ মুহূর্তে তোমার থেকে আপাত লম্বা'।

—'বুঝলাম'।

–'কিন্তু এই ছবিটা তা বলছে না। অমিতাভবাবু বসে ছিলেন। তারপরও ছুরিটা নীচ থেকে উপরের দিকে গেছে! একে তুমি কি বলবে! ভদ্রলোক চেয়ারে বসার পরও খুনীর হাইট তার থেকে কম! তার মানে কি হল! খুনীর হাইট মাত্র তিনফুট!—যেটা ইম্পসিব্‌ল্'।

এতক্ষনে ছায়াটার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল। খুনী অত্যন্ত ধুরন্ধর!সে তার সঠিক হাইটের ব্যাপারে ফরেনসিককে রীতিমতন বিভ্রান্ত করছে।

-এর মানে হল আপনি একটি জিনিয়াস!'

সাইকো ভুরু কুঁচকে তাকায়—'এটা কি ব্যজস্তুতি অলঙ্কার?'

—'একদম না'। সে হেসে বলে—'খাঁটি প্রশংসা! যেটা আমি এতক্ষণ ভেবেও বুঝতে পারছিলাম না, সেটা আপনার এই তিনফুটের খুনীর তত্ত্ব বুঝিয়ে দিল'।

–'সেটা কি?'

—'পরে বলছি। তার আগে ছবিগুলো দেখে বলুন যে খুনী লেফটি কি না।

কয়েদী সবকটা ছবি আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল।

—'হ্যাঁ। লেফ্‌টি। ছুরিটা ফুলফোর্সে ডানদিকে পড়েছে। আর বাঁটের মুখটা সামান্য বাঁদিকে হেলে আছে। কোনও সন্দেহই নেই যে খুনী লেফটি'।

ছায়াটা মিটিমিটি হাসছে—'অতএব কোনও সন্দেহই নেই যে ইনি আমাদের পূর্বপরিচিত। ডঃ মিত্র আর ডঃ খাসনবিশের খুনী একই'।

–'সে তো বুঝলাম। কিন্তু সে ছ'ফুট থেকে তিনফুটের কি করে হল সেটা আমাকে আগে বোঝাও। বাকি তিনফুট কোথায় গেল? কোনটা বাদ দিয়েছে? মাথা না পা?'

—'কোনটাই না'। সে আবার হাসল—— তার হাইট কোনওকালে ছ'ফুট ছিলই না। আমি যদি ভুল না করি তবে সে মাঝারি উচ্চতার কোনও লোক। খুনগুলো এমন ভাবে করছে যাতে ফরেনসিক তার আসল হাইট বুঝেই না উঠতে পারে'।

–'সেটা কি ভাবে?

সে বলল—'এবার আবু হোসেন হওয়ার পালা আপনার। দুটো খুনের মধ্যে একটা কমন জিনিস চোখে পড়ল না? আপনি চেয়ার দেখলেন, আর টেবিলটা দেখলেন না?'

—'টেবিল!'

—'হ্যাঁ, টেবিল'। শান্ত, মৃদুগলায় বলে ছায়ামূর্তি—'ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র যেখানে পড়ে ছিলেন তার সামনেও একটা ছোট্ট টেবিল ছিল। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ যেখানে পড়েছেন তার সামনেও একটা বিরাট টেবিল। এই দেখুন'।

কয়েদীটি ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ্য করল। সত্যিই লাশের সামনে একটা টেবিল জ্বলজ্বল করছে। তার উপরে খাতা-ফাইলের স্তূপ!

–'তার মানে,... তুমি বলতে চাও...'। সে উত্তেজিত।

–'ঠিক তাই, যা আপনি বুঝছেন'। দীর্ঘ চেহারার লোকটি বলল—— খুনী দুবারই টেবিল ইউজ করেছে। প্রথমবার সে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ঠ্যাঙাটা ডঃ মিত্র'র মাথা লক্ষ্য করে

চালিয়েছিল। তাই ডঃ মিত্র লম্বা হলেও খুনীর হাত তার মাথা অবধি অনায়াসে পৌঁছে গিয়েছিল'।

—কিন্তু এবার তো সে টেবিলের উপর থেকে মারেনি! সেক্ষেত্রেও ছুরির ডাইরেকশন উপর থেকে নীচে আসত। হয়েছে তো উল্টোটা!'

—'উল্টোটা হয়েছে কারণ, টেবিলের ব্যবহারও উলটো। এবার সে টেবিলের নীচ থেকে ছুরি বসিয়েছে ডঃ খাসনবিশের বুকে'। তার প্রত্যেকটি শব্দ কাটাকাটা—'খুনী তিনফুট উচ্চতার মোটেই নয়! ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ বসেছিলেন চেয়ারে। আর সে বসেছিল তার পায়ের কাছে। টেবিলের তলায় ঘাপ্টি মেরে বসে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সুযোগ পেয়েই নীচ থেকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে ডক্টরের বুকে'।

—'কিন্তু ডঃ খাসনবিশ তাকে দেখলেন না কেন? বা যে জুনিয়র ডাক্তারটি তার সাথে ছিল.........?

—'আপনি ডঃ খাসনবিশের উদ্ভট স্বভাবের কথা ভুলে যাচ্ছেন। তিনি নিজের কেবিনে অন্ধকারই পছন্দ করতেন। তাঁর কেবিন সবসময় অন্ধকারই থাকত। তাই দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েদীটির মুখে এবার স্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে—'বুঝেছি, এবার কি কর্তব্য?'

—'এবার আপনাকে একটু রিস্ক নিতে হবে'। ছায়াটা দৃঢ়ভাবে বলল—'ডঃ খাসনবিশের টেবিলের তলাটা একটু চেক করে দেখতে হবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়ার আশা করি না। মার্ডার ওয়েপনের উপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকার অর্থ, সে গ্লাভস পরে ছিল। কিন্তু অন্য কিছু পাওয়া অসম্ভব নয়! তন্নতন্ন করে খুঁজুন। কিছু একটা পাওয়া খুব জরুরী।

—'সেরেছে!' সাইকো আঁৎকে ওঠে—'যদি ধরা পড়ি! তোমার যা হাল দেখছি তাতে তুমি গেলে সবার আগে ধরা পড়ব!'

-'আমি যাবো না'। সে হাসছে—'আজ আপনার সাথে ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত যাবেন। রাত দুটোর পর ডঃ হালদার কোয়ার্টারে ফিরে যান। উনি ছাড়া চারতলায় খুব একটা কেউ আসে না। ডঃ চৌধুরী নিজের কেবিনেই বেশি থাকেন। তিনটের পর খুব একটা রাউন্ড দেন না। লক্ষ্য করে দেখেছি, রাত তিনটের পরই সিকিউরিটি সবচেয়ে আলগা হয়ে যায়। ওয়ার্ডবয়-সিস্টাররা ঝিমোয়। তাছাড়া পরপর দুটো খুনের পর বেশি রাতে ভয়ের চোটে কেউ করিডোরে ঘোরাফেরা করে না। এই সময়টাই এ জাতীয় অপারেশনের জন্য পারফেক্ট। আর সঙ্গে ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত থাকলে তো কেল্লা ফতে। শুধু নিজের বাজখাঁই গলার আওয়াজটাকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে, আর একটু সতর্ক থাকতে হবে।

—'সতর্ক না হয় থাকবো'। কয়েদী আস্তে আস্তে বলে—'কিন্তু যদি আর একটা ঠ্যাঙা বা ছুরির আবির্ভাব ঘটে?'

সে একটু ভাবল—'অসম্ভব নয়, হতেও পারে। সেইজন্যই তো বলছি একটু সতর্ক থাকতে। তার উপর তিনি আবার আমাকে সন্দেহ করেছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। সেইসঙ্গে ডেসপারেটও বটে। সেইজন্যই সতর্কতার মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়াই ভালো। যদিও আমি চেষ্টা করবো তাকে চোখে চোখে রাখার...!'

-'চোখে চোখে রাখবে মানে?' কয়েদী সবিস্ময়ে বলে ওঠে—'তুমি জানতে পেরেছ সে কে?'

—'এখনও পুরোপুরি জানতে পারিনি, তবে বুঝতে পেরেছি'। সে বলে—'তবে আমার বোঝাটাই যথেষ্ট নয়। জজসাহেবকেও তো বোঝাতে হবে। সে যা করার তা করেছে। হয়তো আরও কিছু করার প্ল্যানিং আছে। সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করব আমরা, আর সেই সঙ্গে তাকে প্রমাণসমেত ধরার চেষ্টাও করতে হবে। একদম সময় নেই হাতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাল গুটোতে হবে। দেরি করলে তৃতীয় খুনটা আটকানো যাবে না!'

তৃতীয় খুন!শব্দটা শুনেই কয়েদীর বুকের ভিতরে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল।

১১

ডঃ চৌধুরী নিজের কেবিনে বসে একটা সবুজ রঙের ফাইল খুব খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ খুন হওয়ার পর তার ঘর থেকে অন্যান্য ফাইলের সাথে এটাও এসেছে। অন্যান্য আর পাঁচটা ফাইলের মতই সাধারণ। ভিতরে গোটা কয়েক রিপোর্ট আর এক্সরে প্লেট-স্ক্যানের ছবি।

তিনি ফাইলটাকে হয়তো তেমন গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু ফাইলগুলো চেক করতে করতেই হঠাৎ তার নজর পড়ল এই সবুজ ফাইলটায়। ফাইলের উপরে লাল কালি দিয়ে ইংরাজীতে বড় বড় হরফে লেখা আছে—'ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট'।

হাতের লেখাটা তার পরিচিত! প্রয়াত ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র হাতের লেখা! ডাক্তারদের মধ্যে একমাত্র তার হাতের লেখাই স্পষ্ট ও বড় হরফের ছিল। বাদবাকিরা সব জটিল ম্যাপের মত দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখে। এটা চিরঞ্জীবেরই হাতের লেখা! কিন্তু সে 'ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট' লিখেছিল কেন? এমনকি এটা অদ্ভুতভাবে পাওয়া গেল অমিতাভ'র কেবিনে! দুজন ডাক্তারই খুন হয়েছে। যে রাতে চিরঞ্জীব যারা গেল সেদিন সে কিছু বলতে চেয়েছিল। যেদিন অমিতাভ খুন হল, সেদিন তারও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার ছিল। কিন্তু দুজনের একজনও সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলে উঠতে পারেনি।

ডঃ চৌধুরীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এই ফাইল সংক্রান্ত নয় তো? এই ফাইলেই এমন কিছু আছে কি যা দুজন ডাক্তারের প্রাণ নিয়ে নিল?

তিনি খুঁটিয়ে রিপোর্টগুলো দেখতে শুরু করলেন। কয়েকটা সাধারণ ব্লাড রিপোর্ট। একশো সাত, দুশো তিন আর দুশো চারের এম আর আই আর এক্সরে প্লেট। একশো সাত আর দুশো তিনের রিপোর্টে ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র বড় বড় হস্তাক্ষরে লেখা আছে

–'নো অ্যাবনর্যালিটি ফাউন্ড'।

অথচ দুশো চারের প্লেটের পিছনে কিছুই লেখা নেই! ডঃ চৌধুরী অবাক হলেন। এ আবার কি! প্লেট আছে, অথচ রিপোর্ট নেই! চিরঞ্জীব কি দুশো চারের রিপোর্ট লিখতে ভুলে গিয়েছিল?

ভাবতেই আবার চমক! এটা কি করে সম্ভব! দুশো চারের ডিপ্রেশনের রোগীটির রিপোর্ট চিরঞ্জীবের কাছে যাবে কি করে? দুশো চারের পেশেন্ট এসেছে চিরঞ্জীব মারা যাওয়ার পর! তবে তার এম আর আই বা এক্সরে এখানে কি করছে?

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডঃ চৌধুরী। দুশো চারের এম আর আই স্ক্যানের ছবি আর এক্সরে প্লেটটা ভালো করে দেখতে শুরু করলেন। এক্সরে প্লেটটা আবার দাঁতের! এর মধ্যেই কিছু গোলমাল আছে। নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা থাকার কথা নয়। চিরঞ্জীব এমনি এমনিই ফাইলের উপরে 'ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট' কথাটা লেখেনি। নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে।

কিন্তু অনেক দেখার পরেও তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে ধরা পড়ে না। তার মসৃণ কপালে পরপর কয়েকটা ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কি আছে এই টুথ এক্সরে আর স্ক্যানের প্লেটে! যত দেখছেন ততই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সবই তো স্বাভাবিক! মস্তিষ্কের স্ক্যান বা দাঁতের এক্সরেতে কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ছে না! যেমন হওয়ার কথা ঠিক তেমনই।

ডঃ চৌধুরী মনে মনে ভাবেন, হয়তো তিনি বৃথাই ভেবে মরছেন। চিরঞ্জীব নয়, হয়তো অমিতাভ দুশো চারের এম আর আই আর টুথ এক্স রে করিয়েছিল। কিন্তু কেন? ডিপ্রেশনের রোগীর দাঁতের এক্সরে করানোর পিছনে যুক্তি কি?

প্রশ্নগুলো ক্রমশই তাকে খোঁচা মারতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ ভাবার পরই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এখন একটু কফি পেলে ভালো হত। কিচেনে এখন কেউ আছে কি না কে জানে।

না থাকলে কফি মেশিনের ঐ অখাদ্য কফিই খেতে হবে।

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার ভিতরে সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। এখন ক্যাফেইন আশু প্রয়োজন। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই চম্‌কে ওঠেন ডঃ চৌধুরী!

যা দেখলেন তাতে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের কেবিনের সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! হাতে কি যেন চক্‌চক্ করছে! ওটা কি...? ছুরি! না...?

তাকে দেখেই ছায়াটা দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। ডঃ চৌধুরী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার পা দুটো অস্বাভাবিক ভারি বলে মনে হচ্ছে। এত রাতে করিডোরে ওটা কে? ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে কি করছে? ক্রিমিন্যাল সাইকোলজিতে বলে, খুনী নাকি সবসময়ই মার্ডার স্পটে একবার ফিরে আসে। তবে কি ওটা খুনী...?

করিডোরের ম্লান আলোয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় না অন্যদিকের লোকটিকে। অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু সব সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে তার মাথায় একটা সম্ভাবনাই এল। এ নিশ্চয়ই সেই খুনী, যে এক এক করে খুন করছে ডাক্তারদের। ওর হাতের চকচকে জিনিসটা নিশ্চয়ই আরেকটা ছুরি! চিরঞ্জীব, অমিতাভ গেছে। এবার তার পালা!

মৃত্যুভয় যে কি জিনিস জীবনে এই প্রথমবার টের পেলেন মনোহর চৌধুরী। মনে হল চতুর্দিক থেকে লম্বা লম্বা অনেকগুলো ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে ধরছে। তাদের সবার হাতে উদ্যত ধারালো ছুরি। ...এক্ষুনি বসিয়ে দেবে বুকে!...গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে...মনে হল চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না...ছুরি হাতে এগিয়ে আসছে খুনী...পালাবার পথ নেই........!

হঠাৎ মনে পড়ল তার দরজার সামনে একটা প্রমাণ সাইজের ঠ্যাংঙা আছে। বাঁহাতে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন সেটাকেই। দরকার পড়লে একটা মোক্ষম বাড়ি বসিয়ে দেবেন লোকটার মাথায়! বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তার মুখে...

এগিয়ে আসছে আততায়ী...! কাছে...! আরও কাছে! একদম কাছে!

মনোহর চৌধুরী আর চিন্তা ভাবনা না করেই ঠ্যাংঙাটা বিদ্যুৎবেগে বসিয়ে দিলেন লোকটার যাথা লক্ষ্য করে..!

ডঃ চৌধুরী সপাটে ঠ্যাংঙাটা আততায়ীর দিকে চালিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটার মাথায় পড়লেই ছাতু হয়ে যেত। কিন্তু লোকটি অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে লাফ মেরে সরে গেল তার সামনে থেকে। ভয়ার্ত গলায় বলল—‘স্যার! একি করছেন? এটা আমি...'

—‘আমি! ...আমি কে?’ ডঃ চৌধুরীর প্রথম মারটা ফস্কে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও তার বাঁহাতে ঠ্যাংঙাটা উদ্যত।

দরদর করে ঘামছেন ভদ্রলোক। হিহিস্ করে হিংস্র ও সন্দিগ্ধভাবে বললেন—‘নাম বলো, নয়তো মেরে ফেলবো'। -' আমি অর্চিষ্মান স্যার'। -

ডঃ চৌধুরী এবার ভালো করে দেখলেন। তার ঘরের মৃদু আলো এবার অন্যদিকের মানুষটির মুখ ছুঁয়েছে। চোখে পড়ল একটা প্রিয়দর্শন মুখ, ডাক্তারের অ্যাপ্রণ। ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ের চোটে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে।

–‘ওঃ, অর্চিষ্মান। তুমি!’ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডঃ চৌধুরী। তিনি হাতের অস্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন। আড়চোখে লক্ষ্য করেন যে অর্চিষ্মানের হাতের ধাতব চকচকে জিনিসটা আর কিছুই নয়, স্টেথোস্কোপ!

—'আপনি ওটা নিয়ে কি করছিলেন...!’ অর্চিষ্মান তখনও ভয়বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—‘আরেকটু হলেই...'

—‘আরেকটু হলেই আমার হাতে একটা ব্লান্ডার হচ্ছিল'। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন—‘এক্সট্রিমলি সরি অর্চিষ্মান। ভেরি সরি। এসো...এসো...ভিতরে এসো...'।

ভয়ে ভয়েই কেবিনের ভিতরে পদার্পন করে অর্চিষ্মান। তার বুকের ভিতরটা তখনও কাঁপছে। ডঃ চৌধুরী ঠ্যাংঙাটা নিয়ে কি করতে যাচ্ছিলেন? আরেকটু হলেই ডঃ চিরঞ্জীব

মিত্র'র মত অবস্থা হত। ভাগ্যিস্‌, ঠিক সময়ে সরে যেতে পেরেছে। নয়তো...

তার সন্দিগ্ধ ভঙ্গি দেখে ডঃ চৌধুরীর নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। কি সব উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা করছিলেন! ভয়ের চোটে একজন ডাক্তারকেই শেষে খুনী ঠাউরে বসলেন।

তিনি হাসলেন—'ভয় নেই। তোমায় ঠ্যাঙা দিয়ে মারবো না। ইজি...। বরং দু চারবার জোরে জোরে শ্বাস টেনে নাও...'।

অর্চিষ্মান রুমালে মুখ মোছে—'আমি ঠিক আছি স্যার'।

–'তুমি এত রাতে করিডোরে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?' ডঃ চৌধুরী নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন—'তোমায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরেকটু হলেই হ্যালুসিনেশন, ইল্যুশন, ডিল্যুশন, ভায়োলেন্স—সব একসাথে আমাকে চেপে ধরছিল!'

সে অপ্রস্তুত স্বরে বলল—'আমার আজ নাইট ডিউটি ছিল স্যার'।

—'ওঃ, রাউন্ড দিচ্ছিলে!' তার কন্ঠস্বরে স্বস্তির ছাপ—'জব্বর ভয় দেখিয়ে দিয়েছ। আমি আর নিজের ঘর থেকে এক পা ও নড়ছি না!'

তরুণ ডাক্তারটি তখনও তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে ডঃ চৌধুরী হাসলেন। আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বললেন। অর্চিষ্মানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কি অবস্থা হয়েছিল সে কথা বলতে বলতেই হেসে ফেলেছেন——— দিনরাত পেশেন্ট নিয়ে ঘর করতে করতে সেই সব অদ্ভুতুড়ে সিম্পটম আমার মধ্যেও দেখা দিয়েছে বোধহয়। খুব শিগগিরিই হয়তো আমাকে অ্যাসাইলামের অন্যতম খ্যাপা রোগী হিসাবে দেখতে পাবে'।

অর্চিষ্মানও হাসল। সে দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন তিনি

— এখন হাসছি বটে। কিন্তু...' এবার কণ্ঠস্বরে সামান্য বিষণ্নতার ছাপ মিশল—'বেশির ভাগ সাইক্রিয়াট্রিস্টের শেষ পরিণতি তাই-ই হয়। দিনরাত্রি পাগল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময় নিজেই মেন্টালি ডিসব্যালান্সড্‌ হয়ে যায়। আমার স্যারও......

কথাটা বলেই চুপ করে গেলেন তিনি। ঠিক একইভাবেই চুপ করে যেতে ডঃ হালদারকেও সে দেখেছে। কোনও 'ডঃ সেনগুপ্তের' কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গটা চেপে গিয়েছিলেন তিনি। ইনিও থামলেন! অর্চিষ্মানের সন্দেহ হয়। প্রসঙ্গটা সেই 'ডঃ সেনগুপ্তই' নয়তো?'

সে আন্দাজে ঢিল মারে। দেখা যাক্‌, লাগে কি না।

–'ডঃ সেনগুপ্ত কি আপনারও স্যার?'

ডঃ চৌধুরী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছেন। তার মুখ দেখেই বোঝা যায় যে ঢিলটা একদম সঠিক জায়গায় লেগেছে! এই ডঃ সেনগুপ্ত প্রসঙ্গ উঠলেই দুই ডাক্তার চুপ করে যায়। কেন? ব্যাপারটা কি জানতে হচ্ছে।

–'তুমি ডঃ সেনগুপ্তকে চেনো?'

–'না। ডঃ হালদারের কাছে একবার নামটা শুনেছিলাম। উনি বোধহয় ওঁরও স্যার ছিলেন...'।

—'বোধহয় নয়, উনি আমাদের দুজনেরই স্যার। ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'। ডঃ চৌধুরীর মুখ করুণ—'সম্প্রতি দেখেছ ওঁকে?'

–'আমি!' এবার অবাক হওয়ার পালা তার—'আমি কি করে দেখবো? আমি তো কখনও...'

–তোমারই তো দেখা উচিৎ'। ডঃ চৌধুরী বললেন—'তুমি ধৃতিমানকে অ্যাসিস্ট করছো। আর ডঃ সেনগুপ্তকেও নিশ্চয়ই দেখেছ। শুধু চিনতে পারোনি। ডঃ হালদারের আন্ডারে একজন স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট আছেন না? যাঁর আবার অডিটারি হ্যালুসিনেশন সেকেন্ডারি "

এইবার মনে পড়ল অর্চিষ্মানের। হ্যাঁ, সে দেখেছে! বয়স্ক, ছোটখাটো, ক্ষীণ চেহারার লোক হলেও চোখ মুখ খুব তীক্ষ্ণ। দুহাতে কান চেপে ধরে আর্তনাদ করছিল —'ডাক্তারবাবু...ওদের থামতে বলুন...ওরা এত চিৎকার করছে কেন...?' বলতে বলতেই

দেওয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল সে।

–'উনিই ডঃ সেনগুপ্ত!' সবিস্ময়ে বলে অর্চিষ্মান! তার যেন বিশ্বাস হয় না।

———ইয়েস, উনিই। উনিই আমাদের দুজনের স্যার। ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'। ডাক্তারবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে—'বিশ্বাস হচ্ছে না—তাই না? ওরকম রোগা পটকা মানুষ হলে কি হবে, ওঁর মত ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই।একসময় ভারতের সেরা তিনজন মনোবিদের মধ্যে ওঁরও নাম আসত। ডায়গনোসিসে মাস্টার লোক। উনি প্রায় রোগীর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারতেন যে তার আসল রোগটা কি!আর হিপনোসিসে ওরকম ট্যালেন্টেড ডাক্তার আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ধৃতিমানও হিপনোসিসটা ভালোই পারে। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্ত'র কাছে এখনও বাচ্চা! শুধু চোখের দিকে তাকিয়েই পটাপট পেশেন্টকে হিপনোটাইজ করে ফেলতেন। কোনও আলো, কোনও প্রিজ্য—কিচ্ছু লাগত না। আর এটাই হয়েছে কাল'।

ডঃ চৌধুরীর মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

-কেন স্যার?'

—'এক্সপার্ট ডাক্তার যখন নিজেই পেশেন্ট হয়ে যায়, তখন তাকে সুস্থ করে তোলার ক্ষমতা ঈশ্বরেরও নেই। কারণ সে নিজে পেশেন্ট হলেও ডাক্তারি বিদ্যে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। হিপনোসিসও সেইরকমই একটা বিদ্যা। আর এই বিদ্যায় ডঃ সেনগুপ্ত জিনিয়াস লোক। তাই ওঁকে হিপনোসিসই দেওয়া যাচ্ছে না। সাজেশন তো দূর!'

–'সে কি!'

—'এটাই স্বাভাবিক'। তিনি বললেন—'লক্ষ্য করে দেখবে কোনও ডাক্তার, এমনকি স্বয়ং ধৃতিমান হালদারও তাঁর চোখের দিকে তাকায় না। কারণ ধৃতিমান প্রথম প্রথম ওঁকে হিপনোসিস দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্ত হিপনোটাইজড্ তো হনই নি, উলটে ধৃতিমান নিজেই হিপনোটাইজ্ড্ হয়ে গিয়েছিল। ডঃ সেনগুপ্ত শুধু ওর চোখের দিকে তাকিয়েই কাবু করে ফেলেছিলেন'। তার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ে—'ওরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট লোকের শেষ পরিণতি কি ভয়াবহ!'

অর্চিষ্মান উত্তেজিত—'তার মানে এখনও উনি যে কোনও লোককে হিপনোটাইজ করে ফেলার ক্ষমতা রাখেন?'

–'টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাখেন!' ডঃ চৌধুরী সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন—'ওঁর চোখের সামনে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবে এমন লোক এখনও জন্মায়নি। হি ইজ দ্য কিং অব হিপনোসিস'।

অর্চিষ্মান কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তার চোখ সন্দেহতীক্ষ্ণ। তারপর বলল

–'কিন্তু ওঁর এমন অবস্থা হল কি করে?'

-মনোবিদের পেশা অর্চিষ্মান'। তার মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটেছে—'সাইক্রিয়াট্রিস্টদের কাজ নিয়ে এখনও অনেক ডাক্তার হাসাহাসি করেন। লোকে বলে 'পাগলের ডাক্তার'। কিন্তু মনোবিদের কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। মানুষের শরীরের কলকব্জা একটা মেশিনের মত রুটিন মেনে চলে। কিন্তু মন চলে না। দুড়ুম, দড়াম করে কেটেকুটে তাকে ঠিক করে দেওয়াও যায় না। সাইক্রিয়াট্রিস্টদের খুব সাবধানে কাজ করতে হয়। ডাক্তার আর পেশেন্টের সম্পর্কও এখানে খুব কাছের। ডাক্তারকে একসাথে অনেক রোল প্লে করতে হয়, পেশেন্টের দৃষ্টিকোণ বুঝতে হয়, এবং তার দিক থেকে তার মনোভাবও বুঝতে হয়। এইভাবে যদি একটা লোক দিনরাত্রি বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগীদের নিয়ে ভেবে ভেবে দিন কাটায়, তবে কখনও না কখনও তার নিজের মেন্টাল ব্যালান্স বিগড়োতে বাধ্য। নানারকম নিউরোসিস তার মধ্যেও দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক'।

ডঃ চৌধুরী একটু থামলেন। তার মুখে তখনও ম্লান হাসিটা লেগে আছে—'ডঃ সেনগুপ্ত'র ও তাই হয়েছে। কয়েক বছর পর আমারও হয়তো হবে। আমাদের কাছে এসে অনেক পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি যে রোগগুলো তারা আমাদের কাছেই রেখে গেল। এর মধ্যে যে কোনও একটায় আক্রান্ত হতে হবে একসময়। তবু কাজ

করে যাই। এটাই নেশা, এটাই পেশা!'

অর্চিষ্মানের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। এমন একটা পেশার দায়ভার বিপজ্জনক জেনেও যারা হাসিমুখে সেটা মেনে নেন, তাদের স্যালুট করা উচিৎ। অথচ সাধারণ মানুষ এখনও এদের 'পাগলের ডাক্তার' বলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে!

–'এক একটা পেশেন্ট সুস্থ হয়, আর ডাক্তারের প্রাণশক্তি একটু একটু করে শেষের পথে যায়'। তিনি তার দিকে তাকালেন—— জানি, আমার পরিণতিও ঐ একই হবে। ডঃ সেনগুপ্তই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। অবশ্য যদি না তার আগেই চিরঞ্জীব, অমিতাভর মত খুন হয়ে যাই. . . '।

শেষের কথাগুলো কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বললেন তিনি। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। অমিতাভ!...অমিতাভ থাকবে না একথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। এই অ্যাসাইলামের একটা মূল স্তম্ভ ছিল সে। কতবছর একসঙ্গে কাজ করেছেন। সেই অমিতাভ চলে গেল! তবে কি তারও যাওয়ার সময় আসছে!

—'আপনার কি মনে হয়?' অর্চিষ্মানের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—'খুনী ভিতরের লোক?'

–'স্বীকার না করে উপায় নেই। বাইরের লোকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এ কাজ ভিতরের কারুরই।

কোনো পেশেন্ট, কোনো সাইকো, কোনো ওয়ার্ডবয় অথবা.....

তিনি হঠাৎ থেমে গেছেন। যেন পরের সম্ভাবনাটা মেনে নিতে পারছেন না।

-'কোনো ডাক্তার?

যে শব্দটা নিজে প্রাণে ধরে উচ্চারণ করতে পারলেন না, সেই শব্দটাই উচ্চারিত হল অর্চিষ্মানের মুখে। ডঃ চৌধুরী একটু অস্বস্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকান—'হতে পারে। এখন কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। তুমি এখন এসো। একা একা আর ঘুরে বেড়িও না।

–'আর ঘন্টাখানেক পরেই আমার শিফট্ শেষ হবে স্যার'। সে মৃদু হাসল—'তারপরই যাবো'।

ডঃ চৌধুরী ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। কিছু যেন মনে মনে চিন্তা করে নিলেন। অর্চিষ্মান পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকে ডাকলেন—

—'একটু দাঁড়াও'।

-'স্যার?'

–'তুমি কি এরমধ্যে তিনতলায় যাবে?'

অর্চিষ্মান একটু চিন্তা করে—'একবার যেতে হবে। দুশো চারের পেশেন্টের ওষুধ খেয়ে ইরিটেশন হচ্ছে। তাই রাউন্ড শেষ করার আগে একবার চেক করে যাবো।

——'ফাইন। তাহলে এগুলোও নিয়ে যাও'। ডঃ চৌধুরী এম আর আই আর টুথ এক্সরের প্লেট এগিয়ে দিয়েছেন—'দুশো চারের এক্সরে প্লেট আর এম আর আই স্ক্যান। ওর ফাইলে রেখে দিও'।

–'দুশো চারের এম আর আই স্ক্যান আর এক্সরে!' অর্চিষ্মান অবাক হয়ে বলে—'কিন্তু তার তো কোনো এক্সরে বা স্ক্যান হয়নি!'

ডঃ চৌধুরী একটু থমকালেন। অর্চিষ্মান অমিতাভ আর ধৃতিমানের সাথে কাজ করছিল। সে জানে না যখন, তখন উক্ত দুই ডাক্তার এই টেস্ট দুটো করায়নি। তবে কে করাল?

–'আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে...'। সে আমতা আমতা করে বলে—'ওটা বোধহয় দুশো তিনের রিপোর্ট হবে'।

–'দুশো তিনের রিপোর্ট অলরেডি এখানেই আছে'। তিনি দুশো তিনের রিপোর্টও ধরিয়ে দিয়েছেন তাকে—'এটাও রেখে দিও। আমার মনে হয় আগেরটা দুশো চারেরই প্লেট।

–'কিন্তু সেটা ইম্পসিব্‌ল্ স্যার'। অর্চিষ্মান জোর দিয়ে বলল—'দুশো চারের কোনও টেস্টই হয়নি। হলে আমি জানতাম। দুশো চারের নয়, হয়তো ঐ ফ্লোরেরই অন্য কোনও পেশেন্টের...'

—সেটাও ইম্পসিব্‌ল্‌ অর্চিষ্মান'। ডঃ চৌধুরী চিন্তান্বিত স্বরে বলেন—'ঐ ফ্লোরে শুধু বাচ্চারাই থাকে। এই স্ক্যানের প্লেটে যে ব্রেনটা আর টুথ এক্সরের প্লেটে যে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে তা কোনও বাচ্চা ছেলেরই নয়। যে কোনও ডাক্তার এই প্লেটগুলো দেখলে বলে দেবে যার মাথার আর দাঁতের ছবি দেখা যাচ্ছে, সে কোনও বাচ্চা নয়, বরং রীতিমত ডেভলপ্‌ড, ম্যাচিওর ও নর্মাল পূর্ণবয়স্ক লোক। আর ঐ ফ্লোরে পূর্ণবয়স্ক লোক একটিই আছে'।

কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে শেষপর্যন্ত রিপোর্টটা হাতে নিয়ে ডঃ চৌধুরীর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে। আস্তে আস্তে মৃদুপায়ে এসে দাঁড়াল অমিতাভ খাসনবিশের ঘরের দরজার সামনে। দরজায় পূর্বনির্ধারিত নিয়মমত পরপর তিনটে টোকা মারল।

কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। তারপরই ওপ্রান্ত থেকে একটা মৃদু টোকায় উত্তর এল। অর্থাৎ কাজ হয়ে গেছে।

সে সাবধানে দরজার তালা খুলল। ফাঁক পেয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসেছে সাইকোটি।

–'কাজ কিছু হল?'

–'হয়েছে'। সাইকো উত্তর দেয়—— টেবিলের তলায় খুনী বসেছিল। তোমার বসের কথাই ঠিক। ইনফ্রারেড টর্চের আলোয় দেখলাম টেবিলের তলায় ঝুলে তেল জাতীয় কিছু লেগে আছে। স্পেসিমেন নিয়েছি। এখন শুধু আরেকটা কাজ বাকি আছে। একটা পাওয়ারফুল ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ কোথায় পাবো?'

–'প্যাথোলজি ল্যাবে আছে। আসুন'।

সে অর্চিষ্মানের পিছন পিছন দোতলায় উঠে গেল। তার হাতের প্লেটগুলো দেখে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—'ওগুলো কার?'

-'স্যারের এম আর আই স্ক্যান আর টুথ এক্সরে'।

–'তোমার বসের এম আর আই?' কয়েদী উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'কই দাও...দাও...। দেখি তোমার বসের মাথায় কতটা ছিট আছে'।

অর্চিষ্মান সেগুলো এগিয়ে দেয়। সে মহা উৎসাহে সেগুলো নিয়ে প্যাথোলজি রুমের ভিউ বক্সে বসিয়ে বসিয়ে দেখছে।

-'আমার বিশ্বাস হয় না যে এটা স্যারের রিপোর্ট!'

—'কেন? তার স্ক্যানে কি গোবরের ট্রেস পাওয়া গেছে? ঐ একটা জিনিস পাওয়া গেলে আমিও তোমার সাথে একমত!'

—ইয়ার্কি নয় স্যার'। অর্চিষ্মান গোটা ঘটনাটাই খুলে বলে—'স্যারের কোনও টেস্টই হয়নি। হলে আমি জানতাম। অথচ ডঃ চৌধুরী বললেন যে ঐ ফ্লোরের আর কারুর এটা হতেই পারে না। কারণ ওখানে বাকিরা সবাই বাচ্চা!'

–'ডঃ চৌধুরী বোধহয় ঠিকই বলেছেন'। কয়েদীটি প্লেটগুলো দেখতে দেখতে বলে——এটা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাথার স্ক্যান বলেই মনে হচ্ছে। যদিও ফরেনসিক সায়েন্সে শুধু ব্রেন দেখে অত ডেফিনিটলি বলা যায় না। বোন অর্‌ টুথ ইজ মোর অ্যাকুরেট। এই টুথ এক্সরে আর স্ক্যানটা যদি একই ব্যক্তিরই হয়, তবে কোনও সন্দেহই নেই যে সে পূর্ণবয়স্ক'।

সে হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকায়--'তাহলে তো ওটা স্যারেরই রিপোর্ট!'

–'টুথ এক্সরেটা না থাকলে আমিও তাই ভাবতাম'।

অর্চিষ্মান অবাক হয়ে তাকায় কয়েদীটির দিকে। কয়েদীটি দাঁতের এক্সরে প্লেটের উপর আঙুল রেখেছে—'এম আর আই টা তোমার বসের হলেও হতে পারে। কিন্তু এটা কোনওভাবেই তার নয়'।

–'কি করে বুঝলেন?' সে স্তম্ভিত

কয়েদী হাসছে—' এক্সরে প্লেটে ক'টা দাঁত দেখতে পাচ্ছো?'

অর্চিষ্মানের বিহ্বলতা তখনও কাটেনি। কোনমতে বলল--'বত্রিশটা'।

সে স্মিত হাসল—'এর থেকেই প্রমাণিত যে এক্সরেটা কোনও বাচ্চা ছেলের হতে পারে না। বাচ্চাদের ম্যাক্সিমাম আঠাশটা দাঁত থাকতে পারে। কিন্তু এই এক্সরে প্লেটে এক্সট্রা আরও

চারটে দাঁত দেখা যাচ্ছে। সেগুলোও একদম স্পষ্ট। অর্থাৎ যার এক্সরে, তার আক্কেলদাঁতগুলো সবই উঠে গেছে। এবং পুরোপুরিই উঠেছে। দাঁতের গড়ন দেখে মনে হয় লোকটি তোমার বসের থেকেও বয়েসে বড়। এমনকি তোমার থেকেও কিছুটা বড়। মিনিমাম বত্রিশ বছর বয়েস তো হবেই লোকটার'।

-'কিন্তু...' ...'

অর্চিষ্মান আমতা আমতা করে বলে—'স্যারেরও তো বত্রিশটা দাঁতই থাকা উচিৎ।

–' থাকা উচিৎ, কিন্তু নেই'। কয়েদী বলল—'তোমার জানার কথা নয়। ও যখন প্রথম ডিউটিতে জয়েন করে তখনকারই ঘটনা। ডিউটি করবে কি, আক্কেল দাঁতের ব্যথাতেই কাতর! পেইনটা হত আক্কেলদাঁতে। তখন একদমই বাচ্চা ছেলে। তার উপর ঘাড়ে গুরুদায়িত্ব! কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না!' সে আপনমনেই ফিক্ করে হাসে—'আমিই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম ডেন্টিস্টের কাছে। ডেন্টিস্ট দাঁতের এক্সরে করে হতবাক! আক্কেল দাঁতটা যেদিকে ওঠার কথা সেদিকে না উঠে ট্র্যাক চেঞ্জ করে গলার দিকে চলে যাচ্ছে। ডাক্তার আর চান্স না নিয়ে সেদিনই ধরে আক্কেল দাঁতটা তুলে দিল'।

-'তাহলে...?'

-'উফফফ্...এরপরেও 'তাহলে'! তাহলে আর কি? তোমার স্যারের দাঁতের সংখ্যা বত্রিশ নয়, একত্রিশ!' সে বলে—'একটা দাঁত আমার চোখের সামনেই শহীদ হয়েছিল। ওর বাড়ির লোক ছাড়া আর একমাত্র আমিই জানি যে হতচ্ছাড়ার বাঁদিকের নীচের চোয়ালের আক্কেল দাঁতটা নেই। কিন্তু এই এক্সরে তে সবকটা দাঁতই আছে। সুতরাং এটা কোনভাবেই তোমার বসের নয়, হতেই পারে না। এই দাঁতের মালিকের বয়েস ন্যূনতম বত্রিশ। তোমার স্যার এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। বুঝেছ?

অর্চিষ্মান ফের সমস্যায় পড়ে! এই স্ক্যান আর এক্সরে প্লেট বাচ্চাদের নয়। স্যারেরও নয়! তবে কার? আর গায়ে দুশো চারই বা লেখা কেন?

কয়েদীটি ততক্ষণে কাঁচের বাক্স থেকে কি নিয়ে যেন মাইক্রোস্কোপের নীচের স্লাইডে রেখেছে। সে উৎসুক ভাবে সেদিকেই তাকায়।

—'ওটা কি স্যার?

কয়েদী মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখল—'মাকড়সার জাল। কেন? টেস্টি লাগছে? খেতে চাও?'

সে খোঁচা খেয়ে চুপ করে যায়। কয়েদীর সমস্ত মনোযোগ এখন মাইক্রোস্কোপে। সে গভীর মনোযোগে দেখতে দেখতেই হঠাৎ বলে ওঠে

–'ক্যাস্টর অয়েল!' তার কন্ঠস্বরে বিস্ময়ের ছাপ প্রকট—— ক্যাস্টর অয়েল! তা কি করে সম্ভব!

১২

-'আমার কিছু হওয়ার নয় ডক্টর'।

দোতলার মেল ওয়ার্ডের একটি পেশেন্ট বিষণ্ণ মুখে বলে—'আমি একটা কর্পোরেট অফিসে উঁচু পোস্টে চাকরি করি। কিন্তু সে পদের উপযুক্ত নই। ডিকটেশন দেওয়ার জন্য পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে পাঠাই। কিন্তু ডিকটেশন দেওয়ার সময় একবর্ণও বলে উঠতে পারি না। সবসময় মনে হয় মারাত্মক কোনও ভুল করছি। পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বিরক্ত হয়ে চলে যায়। বাড়িতেও সবসময় তটস্থ হয়ে থাকি। কার সাথে কি ভাবে কথা বলব ভেবে পাই না। হতাশ নির্জীব স্বরে বলে সে—'আমি একটা অপদার্থ! আমার সন্ন্যাস নেওয়া উচিৎ। কোনও ওষুধেই এ রোগ যাবে না'।

অর্চিষ্মান অবাক হয়ে রোগীটির দিকে তাকিয়েছিল। ডিপ্রেশন কতরকমের হয়!

–'ডিপ্রেশন নয় অর্চিষ্মান'। ডঃ হালদার নীচু গলায় বললেন—'মোস্ট প্রব্যালি সাইকাসথেনিয়া। যদিও আজকাল সাইকাসথেনিয়াকে অবসেশনের মধ্যেই ফেলা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো, সবসময়ই কনফিউজড!'

সেটা অবশ্য লক্ষ্য করেছে সে। প্রথম দর্শনে এই রোগীটি তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করল। তার একটু বাদেই 'আপনি'! ডঃ হালদারকে বসতে দেওয়ার জন্য প্রথমে একটা টুল দেখাল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কি মনে হল কে জানে! ডঃ হালদার বসার আগেই সে হাঁ হাঁ করে উঠেছে—'না...ডক্টর...আপনি ঐখানে বসুন.....ঐ চেয়ারটাতে...'

চেয়ার আর টুলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরও কতক্ষণ চলত কে জানে! শেষপর্যন্ত তাকে আশ্বস্ত করে ডঃ হালদার তার বিছানাতেই বসে পড়েছেন।

—'একবার ''আপনি' বলছে, আবার 'তুমি' বলছে। কোথায় বসতে দেবে তা নিয়েও পুরোপুরি কনফিউজড'। ডঃ হালদার চাপাস্বরেই বলেন—'তার উপর জীবন সম্পর্কে নেগেটিভ চিন্তাভাবনা। অন্য কিছু নয়—মনে হচ্ছে সাইকাসথেনিয়া।এখন সেকেন্ডারি হিসাবে আর কিছু আছে কিনা সেটাই দেখার'।

অর্চিষ্মান নীরবে যাথা নাড়ে। তার মনোযোগ এখন 'সাইকাসথেনিয়ার' পেশেন্টকে নিয়ে নয়। বরং কয়েকটা বেড পরেই যে স্কিজোফ্রেনিয়া উইথ অডিটারি হ্যালুসিনেশনের রোগীটি আচ্ছন্নের মত শুয়ে আছে সে-ই তার লক্ষ্যনীয় বিষয়বস্তু।

ছোটখাট রোগা পাতলা বয়স্ক মানুষটি এখন রোগীর বেডে শুয়ে থাকলেও ইনিই প্রাক্তন হিপনোসিস এক্সপার্ট ডঃ পুলক সেনগুপ্ত! তার আচ্ছন্ন চোখদুটো এই মুহূর্তে দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, যে এই চোখ দিয়েই তিনি কাৎ করতে পারেন অনেক রাঘব বোয়ালকেও।

ডঃ ধৃতিমান হালদার সাইকাসথেনিয়ার রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত। মৃদু, নম্রস্বরে তার সাথে কথা চালাচ্ছেন। পেশেন্টটি অবশ্য নিজের অবস্থা নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। সে বারবার কাতর স্বরে একই কথা বলে যাচ্ছে—'আমি একটা অপদার্থ। আমার কিছুই হওয়ার নয়। বৃথাই চেষ্টা করছেন ডক্টর'। ডঃ হালদার তবু হাল ছাড়ছেন না।

সে বুঝল ডঃ হালদার আপাতত তাকে নিয়েই পড়েছেন। অন্যদিকে তার খেয়াল নেই। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সে ডঃ সেনগুপ্ত'র বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ডঃ সেনগুপ্ত আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে কোনদিকে তাকিয়েছিলেন কে জানে। অর্চিষ্মান তাকে এবার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। ভদ্রলোক এখনও বেশ সুদর্শন। প্রায় পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়েস হবে। কিন্তু এখনও একমাথা কাঁচা পাকা চুল, আয়ত প্রশান্ত চোখ, ব্যক্তিত্বময় শাণিত মুখের আদল, সরু গোঁফের তলায় পাতলা ঠোঁট আর একটা তীক্ষ্ণ নাক-সবমিলিয়ে রীতিমত আকর্ষণীয়। ডরমেটরির অন্যান্য পেশেন্টদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

সে ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকায়। অদ্ভুত একটা ঘোরে যেন সম্মোহিত চোখদুটো। চোখের মণিটাও অদ্ভুত! একটু সবুজাভ নীল চোখে যেন সমুদ্রের রহস্যময়তা। ক্ষীণ, দুর্বল, ছোটখাট শরীরটাকে বিছানায় আলগোছে ছড়িয়ে দিয়ে বোধহীন শূন্যতায় কি যেন দেখছেন!

অর্চিষ্মানের বিশ্বাস হয়না যে এই রোগাপাতলা স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্টটি এখনও

কাউকে সম্মোহন করার ক্ষমতা রাখেন! ডঃ চৌধুরীর কথাও তার অবিশ্বাস্য লাগে। এই আচ্ছন্ন চোখদুটো এখনও সেই অমিত শক্তি রাখে! ভাবা যায় না!

যাই হোক্--পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

-'ডঃ সেনগুপ্ত!' সে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে——ডঃ সেনগুপ্ত, শুনতে পাচ্ছেন? মানুষটার মুখের একটা পেশীও নড়ল না! যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন ঠিক তেমনই অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কিছুই শুনছেন না।

—'আমি জানি আপনি সব শুনছেন'। সে বলে—'আমি জানি আপনি সব শোনেন, সব বোঝেন'।

পেশেন্টের এখনও কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

—'ডঃ মনোহর চৌধুরী বলেছিলেন যে আপনি হিপনোসিস কিং! কোনো আলো বা কোনো প্রিজম্ আপনার দরকারই হয় না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। এসব ছেলেমানুষী ম্যাজিক যে কোনো সস্তা যাদুকরও পারে। সবটাই চোখের ভুল'।

বলতে বলতেই অর্চিষ্মান পেশেন্টের মুখের দিকে একঝলক দেখে নেয়। যথারীতি কোনও পরিবর্তন নেই।

-'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারও তেমন কোনও অসাধারণ ক্ষমতা নেই। সবটাই গাঁজাখুরি'।

এবারও পেশেন্টের মুখ অন্যদিকে ফেরানো। তবে তার ঠোঁটে একটা অদ্ভুত শিশুর মত সরল অথচ দুষ্টুমিভরা হাসি ভেসে উঠল। ভাবটা এমন, যেন বলছেন—'তাই বুঝি?'

-স্রেফ চোখের দিকে তাকিয়েই কাউকে হিপনোটাইজ করা যায় না কি? এই তো, আমি তাকিয়ে আছি আপনার চোখের দিকে। ক্ষমতা থাকলে আমাকে হিপনোটাইজ করে দেখান!'

ডঃ সেনগুপ্ত এবার তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। চোখের আচ্ছন্নভাবটা আর নেই। বরং অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগছে সবুজাভ নীল চোখদুটো। তিনি হাসছেন। হাসিটা অবিকল একটা দুষ্টু শিশুর মত।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অর্চিষ্মান অনুভব করল, সে ঐ প্রশান্ত সবুজাভ নীল চোখদুটো থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না। কয়েকশো ভোল্টের ইলেক্ট্রিকের ধাক্কা সে চোখে! সে এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তাহলে মানুষটা সম্পর্কে যা শুনেছিল তার সবটাই সত্যি! সাপের মতো ঠান্ডা তার দৃষ্টি! আর চোখের মণি দুটো যেন ক্রমশই উজ্জ্বল আর বড়ো হয়ে উঠছে। এ কি বাস্তব! যা ঘটছে তা কি সত্যিই হচ্ছে, না স্বপ্ন! একটা সাধারণ মানুষের চোখে একি অলৌকিক ক্ষমতা! কি দুর্নিবার চৌম্বক শক্তি!

সে টের পেল তার কপালের রগ বেয়ে ঠান্ডা ঘামের ফোঁটা নেমে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টা করল অন্যদিকে তাকাতে। কিন্তু পারল না! সমস্ত শরীর যেন কোনো বৈদ্যুতিক স্পর্শে ঝিন্‌ঝন্ করে উঠেছে। সমস্ত তন্ত্রীগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে!

ডঃ সেনগুপ্ত'র চোখ দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছিল! কোনো এক অজানা শক্তিতে টেনে রেখেছেন অর্চিষ্মানের দৃষ্টি। তার মৃদু অথচ গম্ভীর স্বর শুনতে পেল অর্চিষ্মান। ভদ্রলোক ভীষণ স্নিগ্ধস্বরে বিড়বিড় করে বলছেন—' তোমার এখন ঘুম পাচ্ছে...তুমি ঘুমোবে...তাকাও আমার চোখের দিকে... তোমার ঘুম পাচ্ছে...তোমার ঘুম পাচ্ছে......'

অর্চিষ্মান মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু আশ্চর্য! তার মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে! শরীরটা ভীষণ ভারি! হাত পা অবশ হয়ে আসে। সে ধপ্ করে অবসন্নের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ডঃ সেনগুপ্ত'র বিছানার পাশে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল। তবু চোখ বোঁজা তো দূর, ডঃ সেনগুপ্ত'র চোখ থেকে নিজের চোখ এক ইঞ্চিও সরানো যাচ্ছে না!

খুব আস্তে কথাগুলো বলছিলেন তিনি। কিন্তু মনে হল, যেন তার কানে ঐ একটা শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ আসছে না! আর সে তো শুধু শব্দ নয়! সে আদেশ!

—তোমার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে...তুমি খুব ক্লান্ত... এখন ঘুমোবে... ঘুমাও

ডক্টর... ঘুমাও... ঘুমাও... ঘুমাও... ঘুমাও...'

আস্তে আস্তে অর্চিষ্মানের চোখ বুঁজে এলো। ডঃ সেনগুপ্ত তার দিকে সকৌতুকে তাকালেন। যেন ভারি মজা পেয়েছেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন, এই সম্মোহিত মানুষটিকে নিয়ে কি করা যায়। তারপর আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন—'এখন তুমি একটা দশ বছরের বাচ্চা। কত বয়েস তোমার?

–'দশ বছর'। নিস্তেজ কন্ঠস্বরে উত্তর আসে।

–'আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। কোন্ ডে?'

আচ্ছন্ন অবস্থায় বলল অর্চিষ্মান—'ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে'।

-'আজ তোমার স্কুলে প্রোগ্রাম হচ্ছে। তোমাকে ন্যাশনাল অ্যান্থে গাইতে বলা হয়েছে। কোন্ গান গাইতে বলা হয়েছে?'

-'ন্যাশনাল অ্যান্থেম'।

-'সামনে যারা আছে তাদের দিকে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াও'।

সে অবিকল একটা দশ বছরের বাচ্চার মতই বাধ্য ছেলে হয়ে দু হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

ডঃ সেনগুপ্ত'র মুখে দুষ্টু হাসিটা ফের ঝিলিক দিয়ে উঠল। উনি হাসতে হাসতেই বললেন —'এবার গাও'।

ডঃ হালদার সাইকাসথেনিয়ার রোগীটিকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। রোগীটিকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে তার ধারণা ভুল। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায়। তিনি গুচ্ছ গুচ্ছ উদাহরণ দিয়ে তর্ক করলে সেও পালটা তর্ক করে! আর বারবার বলে—'আমায় ছেড়ে দিন ডাক্তারবাবু...আমার কিছু হবে না।

-কে বলেছে কিছু হবে না?' অধৈর্য হয়ে ডঃ হালদার বললেন।

—'আমি বলছি'।

–'আপনি কি ডাক্তার?

লোকটা উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায়। ডঃ হালদারের পিছনের দৃশ্যটা দেখে সে হাঁ হয়ে গেছে! উত্তেজিত স্বরে বলে—'ডাক্তারবাবু...ঐ দেখুন...!'

ডাক্তারবাবুকে অবশ্য দেখতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তার কানে এল একটা জোরালো কন্ঠস্বর। কে যেন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাইছে!

--'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা...'।

সবিস্ময়ে পিছনে ফিরলেন তিনি। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না। কোনমতে বললেন-—'বাই জোভ!'

অর্চিষ্মান তখনও হাত জোড় করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে। ডঃ সেনগুপ্ত যথারীতি বিছানায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন। তার স্কিজোফ্রেনিয়ার আচ্ছন্নতা ফের ফিরে এসেছে। ফের সেই শূন্যতার ঘোরে তলিয়ে গেছেন।

ডঃ হালদার জাপ্টে ধরে অর্চিষ্মানকে টেনে সরিয়ে এনেছেন ডঃ সেনগুপ্ত'র সামনে থেকে। তার কাঁধে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাকুল ভাবে ডাকলেন —'অর্চিষ্মান...অর্চিষ্মান...কাম ব্যাক অর্চিষ্মান...'।

কিন্তু তাতেও কাজ হল না। জাতীয় সঙ্গীত তখনও অব্যাহত।

—'বুলশিট্'। ডঃ হালদার অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বাঁ হাতে সপাটে এক মোক্ষম চড় বসিয়ে দিয়েছেন জুনিয়রটির গালে। ঠাস্ করে একটা আওয়াজ। চড়টা বেশ জোরেই মেরেছিলেন। অর্চিষ্মানের ডান গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গেল!

চড় খেয়ে তার চোখের পলক পড়ল। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই অবাক হয়ে তাকায় ডঃ হালদারের সামনে। তার মাথা তখনও ঝিমঝিম্ করছে। মাথায় যেন কেউ কয়েক টনের লোহার বাক্স চাপিয়ে দিয়েছে!

ডঃ হালদার রেগে গেছেন—'তুমি কি করছিলে ওখানে? জানো উনি কে?'

—'কিন্তু...' সে তখনও ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি—'আমার কি হয়েছিল?'

—'তুমি হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিলে। এতক্ষণ ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাইছিলে—তাও একদম বেসুরো!'

অর্চিষ্মান তখনও যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না—'উনি আমায় হিপনোটাইজ্ করেছিলেন!'

—'করেছিলেন মানে?' ডঃ হালদার রেগে গিয়ে বলেন—'হিপনোটাইজ করে ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাওয়াচ্ছিলেন। কি করতে স্যারের কাছে গিয়েছিলে তুমি? আমরা কেউ ভয়ের চোটে ওঁর চোখের দিকে তাকাই না পর্যন্ত! হিপনোসিসে ওঁর জুড়ি নেই।

—'আমি সত্যিই হিপনোটাইজ্‌ড্ হয়ে গিয়েছিলাম!'

সে একটু আগের মুহূর্তটার কথা মনে করার চেষ্টা করে। কিন্তু মাথার ভিতরটা তখনও অবশ। কিছুতেই মনে পড়ছে না যে একটু আগে সে ঠিক কি করছিল!

—'বিশ্বাস না হয় এখানকার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তোমাকে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে সবাই দেখেছে। ডঃ হালদার তার স্বভাববিরুদ্ধ রাগতভঙ্গিতে বললেন—'কি করছিলে তুমি ওখানে? নিশ্চয়ই কোনোভাবে ওঁকে চ্যালেঞ্জ করেছ। নয়তো স্যার এমনিতে কিছু করার লোক নন। তখনই এই কাজটা করেন, যখন ওঁর মনে হয় কেউ ওঁকে চ্যালেঞ্জ করছে!'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বেশ কয়েকটা লম্বা লম্বা শ্বাস টানলেন। অর্চিষ্মান অপরাধীর যত কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বোধহয় তার খারাপ লাগল। এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন——তোমারই বা দোষ কি! নতুন এসেছ। ওঁর কীর্তিকাহিনী কিছুই জানো না। আমি নিজেই স্যারকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছিলাম!'

সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। তার মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা তখনও যায়নি। তবু কৌতুহলী হয়ে ডঃ হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডঃ হালদার সেটা বুঝলেন। অপ্রস্তুত হয়ে টাক চুলকোতে চুলকোতে বলেন—'কি বলবো আর সে লজ্জার কথা! আমি আর ডঃ চৌধুরী ডঃ সেনগুপ্ত'র সাথেই কাজ করতাম। বহুবছর কাজ করেছি। চোখের সামনে ওনার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি। তখন কি আর জানতাম যে অমন মানুষটার এই অবস্থা হবে!'

—'কিন্তু এমন অবস্থা হল কি করে?'

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না'। ডঃ হালদার অসহায় ভাবে বলেন—'উনি নিজে সাইক্রিয়াট্রিস্টের সাথে কম্যুনিকেট করার মত অবস্থায় নেই। দেখতেই তো পাচ্ছ কি অবস্থা! অসুস্থতার বিশেষ কারণটা জানতে না পারলে চিকিৎসা করার স্কোপই পাওয়া যায় না। আর এইরকম পরিস্থিতিতেই দরকার পড়ে হিপনোসিসের। ওঁকে হিপনোটাইজ করতে পারলেই একটু একটু করে কারণটা অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে আসত। কজ না জানলে কিওর হবে কি করে? কিন্তু ডঃ চৌধুরী আর অমিতাভ—দুজনেই বললেন—অসম্ভব! স্যারকে হিপনোসিস দিতে পারে এমন সাইক্রিয়াট্রিস্ট ভূ-ভারতে জন্মায়নি'।

-'তারপর?'

—'তারপর আর কি? ঝোঁকের মাথায় চ্যালেঞ্জটা আমিই নিলাম'। তার হতাশ দীর্ঘশ্বাস পড়ল—'গর্ব ছিল, হিপনোসিস ভালোই পারি। স্যারকে চেয়ারে বসিয়ে হিপনোটিক রে চালু করে দিলাম। উনি সেই প্রথম কথা বললেন। কেমন একটা দুষ্টু বাচ্চা ছেলের মত হাসেন না? ওটা ওঁর পেটেন্ট হাসি। সেইভাবেই হেসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, ঐ আলো দিয়ে হিপনোসিস হবে?' ব্যস্, আমার আর কিছু মনে নেই!'

—'বুঝেছি'। অর্চিষ্মান বলে— আপনি নিজেই হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিলেন!'

—'শুধু তাই নয়'। ধৃতিমান হালদার গভীর আক্ষেপে বলেন—' 'শুধু ঐটুকু হলে তো সমস্যা ছিল না। এরপরের ইতিহাস আরও করুণ। যখন ভিতরে হিপনোসিস চলছিল তখন বাইরে ডঃ চৌধুরী আর অমিতাভ দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় একঘন্টা কেটে গেল অথচ আমি

বেরোচ্ছি না দেখে দুজনেরই সন্দেহ হয়। দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে হিপনোসিস রুমে ঢুকে আবিষ্কার করলেন যে স্যার যথারীতি চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। আর আমি 'নাগিন' ফিল্মের শ্রীদেবীর মত মাথার উপর দুহাত তুলে সারা ঘরে 'ফোঁস ফোঁস' করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার মুখ করুণ হয়ে গেছে—' আরও কতক্ষণ ঘুরতাম কে জানে। ডঃ চৌধুরী আর অমিতাভ এসে ঝাঁকুনি দিয়ে, গালে পেল্লায় থাপ্পড় মেরে হুঁশে ফেরালেন'।

অর্চিষ্মান হাসি চাপার চেষ্টা করতে গিয়ে মুখটা আরও উৎকট গম্ভীর করে ফেলেছে। সেইদিকে আড়চোখে তাকিয়ে ডঃ হালদার গম্ভীর মুখে বলেন—'হাসির মতন স্বাস্থ্যকর জিনিস আর হয় না। এভাবে চেপে রেখে স্বাস্থ্যহানি কোর না। বরং হেসেই নাও'।

বলতে বলতেই নিজেও হেসে ফেললেন। ভদ্রলোক এতদিন পরে এমন খোলা হাসি হাসছেন দেখে তারও ভালো লাগল।

ডঃ হালদার তার স্যার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলে গেলেন। অর্চিষ্মান সবটা মন দিয়ে শুনল না। তার মাথায় তখন দুটো কথা গেঁথে গেছে। ডঃ সেনগুপ্তকে 'হিপনোসিস কিং' বলা হত। এবং তিনি সাইকো কিলারদের খুব সহজে হ্যান্ডেল করতে পারতেন! এই কথাদুটোই তার মাথায় ঘুরে ফিরে আসছে। ভদ্রলোক এখন রোগীর বিছানায় শুয়ে থাকলেও অসম্ভব ক্ষমতা যে রাখেন, তার নমুনা একটু আগেই সে দেখেছে।

–'ডঃ সেনগুপ্ত কি এখনও সাইকো কিলারদের বাগে আনতে পারেন? উনি যে সম্পূর্ণ অসুস্থ নন তা ওঁর হিপনোসিসের ক্ষমতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

–'তুমি খেপেছ?' ডঃ হালদার বললেন——— উনি অসুস্থ নন্ তা কে বলল? ওঁর তো মনেও নেই যে উনি নিজেই একজন ডাক্তার! এমনকি আমাদের কাউকে চিনতেও পারছেন না। বেশিরভাগ সময়ই 'ডক্টর বা ডাক্তারবাবু' বলেই ডাকেন। আর হিপনোসিসের কথা বলছ? হিপনোসিসটা ওনার রিফ্লেক্স অ্যাকশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা ওঁর কাছে জলভাত! তাই যখনই কেউ চ্যালেঞ্জ করে তখনই তাকে জব্দ করেন। এই ভয়ে ওঁর চোখের দিকে কেউ তাকায় না। ডঃ সেনগুপ্ত সুস্থ থাকলে এরকম কথায় কথায় লোককে হিপনোসিস দিয়ে বেড়াতেন না। বর্তমানে যা করছেন এর একটাও উনি সচেতনে করছেন না—আগেই তো বললাম তোমাকে'।

অর্চিষ্মানের সন্দেহ তবু যায় না।

-'আচ্ছা স্যার...' সে সন্দিগ্ধ গলায় বলে—'ডঃ সেনগুপ্ত আপনাকে নাচালেন, আমাকে দিয়ে গান গাওয়ালেন। ওঁর ক্ষমতা প্রশ্নাতীত! কিন্তু উনি কি এইভাবেই কাউকে হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে খুন করাতে পারেন?'

ডঃ হালদার কথাটা শুনেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে ওঠেন। বিস্মিত, আহত গলায় বললেন—'ডঃ সেনগুপ্ত!... সে কি!... না না... কোনমতেই নয়...অসম্ভব!'

–'কেন নয়?' সে নাছোড়বান্দা—'যে কোনও লোককে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা যে ভদ্রলোক রাখেন তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। সাইকো কিলারদের মত মারাত্মক লোকও ওঁর হাতের মুঠোয় অনায়াসেই চলে আসে। তবে অসম্ভব কেন?'

ডঃ হালদারের চোখে বিপন্নতা—'অসম্ভব, কারণ উনি একজন ডাক্তার। তুমি জানো না...কত দুঃসাধ্য কাজ করেছেন উনি....অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন...কত বিপর্যস্ত মানুষকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। জীবন ফিরিয়ে দেওয়াটাই ওঁর কাজ। কেড়ে নেওয়া নয়!'

—'সেটা তো আমরা জানি'। স্কিজোফ্রেনিয়ায় আচ্ছন্ন পুতুলের মত স্থির হয়ে থাকা ডঃ সেনগুপ্তকে দেখিয়ে সে বলল—'কিন্তু উনি তো জানেন না! আপনিই তো বললেন, উনি যে একজন ডাক্তার তা ওঁর নিজেরই যনে নেই'।

ডঃ হালদার আর কিছু বলার আগেই হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন ডঃ সেনগুপ্ত! শীর্ণ দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরে কেমন যেন কুঁকড়ে যাচ্ছেন।

–'আবার অডিটারি হ্যালুসিনেশন!'

ডঃ হালদার সেদিকেই এস্তব্যস্ত হয়ে ছুটলেন। ততক্ষণে ডঃ সেনগুপ্ত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে

এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। চিৎকার করে উঠে বললেন—'শাট্ আপ্... শাট্ আপ্.... আই সে —শাট্ আপ্...'।

অর্চিষ্মান দেখল এবারও ডঃ হালদার ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালেন না!

–'আমি আর পারছি না...চুপ করো...চুপ করো তোমরা...কেন চেঁচাচ্ছ?...কেন আমার নাম ধরে ডাকছো...?'

ডাক্তারবাবু তাকে ধরে ফেলেছেন। ডঃ সেনগুপ্ত অসহায়ের মত তার বুকে মুখ লুকিয়েছেন। ভয়ে থরথর্ করে কাঁপছেন। বারবার বলছেন—'ওদের থামান...ওদের চুপ করতে বলুন প্লিজ...আমি খুন করিনি...... আমি খুন করিনি... ডাক্তারবাবু ওদের বলুন...আমি খুনী নই..........

-'হ্যাঁ...এক্ষুনি বলে দিচ্ছি...'। ছোট্ট বাচ্চাদের যেমন আদর করে শান্ত করা হয় তেমনভাবেই ডঃ সেনগুপ্তকে শান্ত করতে করতে ডঃ হালদার সিস্টারকে বললেন

—'ঐ ওষুধটা পুশ করো...ইমিডিয়েটলি...'!

তিনি অর্চিষ্মানকে মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তীব্র ভর্ৎসনা। এই অসহায়, রোগাক্রান্ত বয়স্ক মানুষটিকে খুনী হিসাবে আদৌ কি ভাবা যায়!

–'আমি খুন করিনি... আমি খুন করিনি... খুন করিনি...

বলতে বলতেই নেতিয়ে পড়লেন ডঃ সেনগুপ্ত। তার চোখের ঔজ্জ্বল্য চলে গিয়ে এখন খাঁ খাঁ শূন্যতা। অর্চিষ্মান চিন্তায় পড়ে। কোন্ খুনের কথা বলতে চাইছিলেন ডঃ সেনগুপ্ত? কোন্ খুন তিনি করেননি?

১৩

-ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এখন কেমন লাগছে ডক্টর?'

দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্ট মিটিমিটি হেসে বলে—'অনেকদিন পর গাইলেন, তাই না?'

পেশেন্টের দুপাশে পোষা বিড়ালের মত কুক্কু আর পুপু বসেছিল। দুজনেই এখন হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। অর্চিষ্মান অবাক হয়! এর মধ্যেই খবর এখানেও পৌঁছে গেছে!

–'এই যে ইনি...' সে কুক্কুর গাল টিপে দেয়—'ইনি খবরটা এনেছেন'।

-'হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি দেখেছি'। কুক্কু লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখমুখ গম্ভীর করে বলে—'ডাক্তারবাবু একদম এইভাবে গাইছিলেন'।

বলেই সে অবিকল অর্চিষ্মানকে নকল করে দুই হাত জোড় করে গাইতে শুরু করে—'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে...'

–'হয়েছে...হয়েছে...' অর্চিষ্মান ছদ্মরাগ দেখায়—'ক্ষুদে গোয়েন্দার নকলনবিশি শেষ হলে এখন ও ঘরে যাওয়া হোক্। আমি পেশেন্ট চেক করবো।

অনিচ্ছাসত্বেও মুখ ফুলিয়ে দুজনই চলে যাচ্ছিল। ভুলবশত নিজেদের ক্রিকেট বলটা এঘরের বিছানার উপরই ফেলে যাচ্ছে দেখে নতুন কাকু বলটা ছুঁড়ে দিয়েছে ওদের দিকে।

—'এটা নিয়ে যাও।

পুপু বলটা লুফে নিয়ে চলে গেল। নতুন কাকু তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—'এ ছেলেটা বড় হলে দুর্দান্ত ক্রিকেটার হবে। কি রিফ্লেক্স!'

–'আর কুক্কু একনম্বরের কপিক্যাট হবে! একদম নিখুঁত নকল করে'।

অর্চিষ্মানের কথা শুনে নতুন কাকু হাসছে—'ডাক্তারবাবু বিলক্ষণ চটেছেন দেখছি'।

সে কথা না বাড়িয়ে গম্ভীর মুখে রোগীর পাল্স্ চেক করে। তারপর ব্লাডপ্রেশার। প্রেশার চেক করার সময় খুব সাবধানী ভঙ্গিতে একটা চিরকুট তার হাতে গুঁজে দেয়।

কুক্কু বর্ণিত 'কালো রাক্ষস' ওয়ার্ডবয়টি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। যেন ভিতরে ঢুকবে কি না

ভাবছে।

-প্রেশার সামান্য লো আছে। ওষুধগুলো নিয়মিত খাচ্ছেন তো?' কান থেকে স্টেথোস্কোপ খুলতে খুলতেই অর্চিষ্মান ওয়ার্ডবয়টির দিকে তাকিয়েছে—'কিছু বলবে?'

ওয়ার্ডবয়টি বলল—'ওনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে স্যার'

ওষুধ খাওয়ার কথা শুনে নতুন কাকুর মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন তাকে ওষুধ নয়, বিষ খেতে বলা হয়েছে!

-'আমাকে দাও'। অর্চিষ্মান হাত বাড়িয়ে দেয়—'আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

ওয়ার্ডবয়টি তার হাতে ওষুধগুলো দিতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রোজ সকালে আর বিকেলে এই ওষুধ খাওয়ানো উপলক্ষ্যে তাকে পেশেন্টের সাথে খন্ডযুদ্ধ করতে হয়। পেশেন্ট কিছুতেই ওষুধ খাবে না, সেও খাইয়েই ছাড়বে! আজ ডঃ দত্ত তাকে বাঁচালেন।

ওয়ার্ডবয় চলে যেতেই অর্চিষ্মান হাতের ওষুধগুলো জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। ততক্ষণে পেশেন্ট সন্তর্পনে হাতের চিরকুটটা খুলল। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—

–'টেবিলের তলায় মাকড়সার জালে ক্যাস্টর অয়েলের নমুনা পাওয়া গেছে। কিন্তু তার চুল মাকড়সার জালে আটকায়নি। লোকটার মাথায় সম্ভবত চুল নেই!'

চিরকুটটা পড়েই সে হেসে ফেলল। চারতলার কয়েদী সবাইকেই নিজের মত 'অবাক পৃথিবী' ভাবে। মাকড়সার জালে চুল আটকায়নি বলেই খুনীকে 'টাকলু" হতে হবে এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?

অর্চিষ্মান তাকে হাসতে দেখে নীচুস্বরে কারণ জানতে চায়। সবকথা শুনে সে বলল—'হতেও পারে স্যার। আমিও একবার টেবিলের তলায় ঢুকে দেখেছি। সত্যিই চুল আটকে

যায়'।

—'তোমার আটকাতেই পারে'। নতুন কাকু হাসল——তোমার চুল বেশ বড়। কিন্তু এইমাত্র যে ওয়ার্ডবয়টি গেল, ওর মাথার চুল দেখেছ? একদম ছোট ছোট করে কদমছাঁট দেওয়া। ও আদৌ টেকো নয়। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, ও যদি টেবিলের তলায় ঢোকে তবে ওর মাথার চুল জালে আটকাবে না'।

অর্চিষ্মান সরু চোখে তার দিকে তাকায়। সে হেসে বলে—'বাদ দাও। আজকের এক্সপিরিয়েন্স কেমন লাগল? ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'র সঙ্গে তো ঘটা করে চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়েছিলে। শেষপর্যন্ত স্কুলের প্রেয়ার করে ফিরে এলে?'

–'আপনি ওঁকে চেনেন?'

–'হিপনোসিস কিংকে কে না চেনে? গোয়েন্দাবিভাগের টপ বস'রা পর্যন্ত ভদ্রলোককে চেনেন। ঐটুকু বেঁটেখাটো হলে কি হবে! জিনিয়াস লোক! ডঃ সেনগুপ্ত'র হিপনোসিসের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পর্যন্ত জঙ্গী বা আতঙ্কবাদীদের দলের গোপন কথা কিছুতেই পেট থেকে বের করতে না পারলে এই ভদ্রলোকেরই শরণাপন্ন হত। থার্ড ডিগ্রি খেয়েও যে লোক মুখ খুলত না, সে ডঃ সেনগুপ্ত'র পাল্লায় পড়ে দিব্যি গড়গড় করে গুপ্ত কথা ফাঁস করে দিত। এর জন্য একদল জঙ্গী ভদ্রলোককে খুন বা কিডন্যাপ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই ওঁকে একসময় রীতিমত কড়া পুলিশ প্রোটেকশনে রাখা হত। আমার প্রথম দর্শনেই চেনা চেনা লেগেছিল। পরে ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ কনফার্ম করলেন'।

–'শুধু তাই নয় স্যার'। সে উত্তেজিত— উনি সাইকো কিলারদের পর্যন্ত বশ করার ক্ষমতা রাখেন'।

—'এটাও পুরনো খবর'। নতুন কাকু বলে— অনেক আচ্ছা আচ্ছা ভয়ঙ্কর সাইকোকে উনি সোজা করেছেন। হি ওয়াজ অ্যান অ্যাসেট্। ওঁর সাথে চ্যালেঞ্জ নিতে যাওয়াই তোমার ভুল হয়েছে। ভাগ্য ভালো, যে শুধু জাতীয় সঙ্গীতের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে। যদি জিজ্ঞাসা করতেন 'তুমি কে?-- তবে কি হত!'

–'আপনি রসিকতা করছেন স্যার?' অর্চিষ্মান আহত গলায় বলে—'আর এই অদ্ভুত ক্ষমতার অন্যদিকটা দেখছেন না?'

—'কে বলল দেখছি না?' সে অন্যমনস্ক—'হিপনোসিস কিংকে কি এত সহজে ভুলতে পারি? প্রথম দিন থেকেই উনি আমার সাসপেক্টের লিস্টে ঢুকে গেছেন। ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার যখন নিজেই অপরাধী হয় তখন তাকে ধরা মুশকিল। অপরাধগুলোও রীতিমত ব্রিলিয়ান্ট হয়! আর ওঁর পক্ষে কাজটা কত সহজ ভেবে দেখ। একজন সাইকো কিলারকে বশ করে তাকে দিয়ে খুন করানোটা ভদ্রলোকের কাছে ছেলেখেলা! নিজে খুন করছেন না, কিন্তু খুনগুলো হচ্ছে! সেক্ষেত্রে সাইকোটি ধরা পড়লেও ওঁকে কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। হিপনোটাইজড অবস্থায় কে কি করছিল তা পরে আর মনে থাকে না। সো মার্ডার ইজ টু-উ ইজি ফর হিম্

–'তাহলে কি উনিই...?'

–'প্রমাণ কোথায়? মোটিভ কি?' নতুনকাকু চিন্তান্বিত গলায় বলে——তাছাড়া উনি নিজেই তো স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট! স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্টদের মস্তিষ্ক তেমন কাজ করে না।

–'ওনার রোগটা আদৌ আছে কি না সেটাই আমার সবচেয়ে বড় সন্দেহ'। অর্চিষ্মানের গলায় দৃঢ় সন্দেহ—'এমনও তো হতে পারে যে ভদ্রলোকের কিছুই হয়নি। স্রেফ রোগীর ছদ্মবেশ ধরে আছেন!'

–'হতেই পারে। যেহেতু উনি নিজেই ডাক্তার, তাই স্কিজোফ্রেনিয়ার সিম্পটমগুলোও খুব ভালোভাবেই জানেন। রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথাই নয়'। সে দ্বিধান্বিত স্বরে বলল—'কিন্তু কেন? কেন এত কিছু করতে যাবেন ডঃ সেনগুপ্ত?

—'উনি আজকে কি বলেছেন জানেন?

অর্চিষ্মান ‘অডিটারি হ্যালুসিনেশনে' আক্রান্ত ডঃ সেনগুপ্ত'র কথাগুলো বলল। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নতুন কাকু। তার মুখে এবার সংশয়ের ছাপ পড়েছে।

—'স্কিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে যতদূর জানি তাতে রোগটা সারিয়ে তোলা অসম্ভব নয়'। সে গভীর সংশয়ান্বিত স্বরেই বলে—‘এতগুলো এক্সপার্ট ডাক্তার মিলেও তবে ডঃ সেনগুপ্তকে সুস্থ করে তুলতে পারছে না কেন?’

এর কারণটা একটু আগেই ডঃ হালদার তাকে বলেছেন। প্রত্যেকটা রোগীর অবচেতনে রোগের আসল কারণটা লুকিয়ে থাকে। কোনো বিশেষ ঘটনা, দুর্ঘটনা বা অন্য কিছু। সেক্ষেত্রে ডাক্তাররা হিপনোসিসের মাধ্যমে মূল কারণটা রোগীর অবচেতনের মন থেকে বের করে আনেন। তারপর ক্ষেত্রবিশেষে ঐ হিপনোটাইজ্‌ড্‌ অবস্থাতেই তাকে অভিভাবন বা সাজেশন দেওয়া হয়। একটার পর একটা সাজেশন দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনার ট্রমা থেকে বের করে আনা হয়! এটাই মূল চিকিৎসা।

কিন্তু যেহেতু ডঃ সেনগুপ্ত নিজেই হিপনোসিস বিশারদ তাই তাকে হিপনোসিস দেওয়াই যাচ্ছে না। উলটে উনিই ডাক্তারদের হিপনোটাইজ করে ফেলছেন।

—‘হুঁ'। নতুনকাকুর মুখ সিরিয়াস—‘অথবা আরেকটা সম্ভাবনাও হতে পারে। যাঁর কোনও রোগই নেই, তাকে ডাক্তাররা কিভাবে সুস্থ করবেন? হয়তো ওঁর কিছুই হয়নি'।

—‘হতে পারে'। অর্চিষ্মানের মুখ চকচক করে ওঠে— সেজন্যই ডঃ সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ্‌ড্‌ হচ্ছেন না। কারণ একমাত্র হিপনোসিসই একমাত্র উপায় যেখানে পেটের কথা কিছুই লুকোনো যায় না!'

নতুনকাকুর চোখে ফের সেই রাগ রাগ দৃষ্টিটা ফিরে এসেছে। সে নিজের মনেই বলে- 'বিশ্বাস নেই.... কিচ্ছু বিশ্বাস নেই... কে যে কি ভেক ধরে আছে... কিচ্ছু বলা যায় না...ডঃ সেনগুপ্ত’র হিপনোটাইজ হওয়া খুব দরকার... খুব দরকার...ওঁর রোগটা কি সত্যি?... যদি সত্যি হয় তবে অডিটারি হ্যালুসিনেশনে খুন আর খুনী এলো কোথা থেকে?... স্ট্রেঞ্জ!... রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ... এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ...!'

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতেই সে বলল—‘এখন তুমি এসো। অনেকক্ষণ এ ঘরে আছ। লোকজন সন্দেহ করবে'।

অর্চিষ্মান চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়—‘স্যার, সেই স্ক্যান আর টুথ এক্সরেটা...?'

—‘ওটা আমার নয়। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে—'তোমরা লক্ষ্য করো নি। ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র প্লেটের তলায় সবসময় ইংরেজী হরফে নম্বর লিখতেন। দুশো তিনের নীচেও তাই লিখেছিলেন। তার ‘দুই’ সংখ্যা লেখার স্টাইলটা অনেকটা বাংলার মত। কিন্তু ‘দুই’ এর মাথায় একটা ফুটকি আছে। অর্থাৎ ওটা ইংরেজীর দুই। আর সংখ্যাটা দুশো চার নয়, দুশো আট'।

—‘দুশো আট!’ সে প্রায় আকাশ থেকে পড়ে—‘কিন্তু দুশো আট ঘরটা তো ফাঁকা!'

নতুন কাকু মুচকি হাসল——ওটাও খুনীর আরেকটা রসিকতা। ইগনোর করো।

নিজের কোয়ার্টারে ফিরে পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়ে বসল অর্চিষ্মান। কোথা থেকে যে কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কিন্তু তারাও তো বসে নেই। এদিকে সে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখছে। উদয়াস্ত ডিউটি করেও সবার দিকে সতর্ক নজর রেখে যাচ্ছে। অন্যদিকে একজন সাইকো কিলারদের ভিড়ে যমযন্ত্রণা ভোগ করছে। আরেকজন তো বোধহয় সব সম্ভব-অসম্ভবের উর্দ্ধে! শুধু এই অ্যাসাইলামে এসে ঢোকার জন্যই একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে! এখনও কম ঝুঁকি নিচ্ছে না!

কিন্তু ফল কি? অর্চিষ্মানের মনে হয় স্রেফ বুনোহাঁসের পিছনে তাড়া করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। অন্তত সে নিজে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একচুলও এগোয়নি।

সে ক্লান্তভাবে নিজের অ্যাপ্রণের পকেটে হাত ঢোকাতেই কি যেন খচমচ করে ওঠে।

অর্চিষ্মান অবাক হয়ে পকেট হাতড়ায়। একটা কাগজের টুকরো কে যেন ভাঁজ করে তার

পকেটে রেখে দিয়েছে! এ নিশ্চয়ই দুশো চারের পেশেন্টের কাজ!

সে তাড়াতাড়ি চিরকুটটা খুলে পড়ল।

‘কাল সকালবেলাটা ছুটি নাও। ডঃ হালদার, ডঃ চৌধুরী ও ডঃ সেনগুপ্ত—প্রত্যেকের পাস্ট হিস্ট্রি খুঁজে বের করো। কুক্কু ও পুপুর বাবা-মা সম্পর্কে সব ডিটেল্‌স্ চাই। ওদের আর কোনও রিলেটিভ আছে কি না, পুপুর কোনওরকম ক্ষতি হলে ওর মায়ের সম্পত্তির ওয়ারিশ কে হবে সেটাও খোঁজ নেবে। হাতে একদম সময় নেই। কাল রাত দশটার মধ্যে আমার সব ডিটেল্‌স্ দরকার। সম্ভব হলে অ্যাসাইলামের ফোনে ফোন করে আপডেট দিও। পরিস্থিতি অ্যালার্মিং। কাল রাত সাড়ে বারোটা অবধি আমাদের ডেডলাইন। তার মধ্যে অপারেশন সাকসেসফুল না করতে পারলে আরেকটা খুন অবধারিত। খুনী আমাদের সন্দেহ করেছে'।

চিঠিটা পড়ে সে ‘থ’ হয়ে বসে থাকে! ‘আরেকটা খুন অবধারিত’ মানে!

তার মনে তখন একটাই নাম এল—পুপু! যে বাচ্চাটা নিজেও জানে না যে উত্তরাধিকারসূত্রে সে কোটিপতি, তার মাথার উপরই খাঁড়াটা নেমে আসছে না তো!

১৪

আস্তে আস্তে আরেকটা রাত নেমে আসে। এই অ্যাসাইলামটা দিনের বেলায় একরকম থাকে। রাতের বেলায় অন্যরকম। দিনের আলোয় বাড়িটাকে 'দূর্গ' বলে মনে হয়। আর রাতের অন্ধকারে 'হানাবাড়ি'।

আজও একতলার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজার শব্দ সবার হৃৎস্পন্দনকে একধাক্কায় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল। বারোটা বাজলেই মনে পড়ে যায় সেই দিনটা। ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র যেদিন করিডোরে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন, সেদিনও নীচের ঘড়িতে এমনভাবেই বারোটার ঘন্টা পড়ছিল। চোখের সামনে অমিতাভ খাসনবিশের নিষ্প্রাণ দেহটা ভেসে ওঠে। এক একটা রাত আসে আর সবার মনে একটাই ভয়াবহ প্রশ্ন ঘুরে মরতে থাকে—আজ কার পালা?...আজ কার পালা?...

আট নম্বরের মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত চোখ বুজে নিজের বিছানায় শুয়েছিলেন। সেডেটিভ নেওয়া সত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার মনে ভয় এবং রাগ—দুটোই পাশাপাশি কাজ করছিল। পরপর খুন হয়ে যাচ্ছে এখানে, অথচ পুলিশ কিছুই করতে পারছে না! যতসব অকর্মার ঢেঁকি! তিনি নিজে পুলিশ হলে প্রথমেই কমলা রঙের শার্ট পরা ব্যক্তিটিকে শনাক্ত করতেন। তারপর তাকে গ্রেফতার করতেন। এইটুকুই তো কাজ! অথচ তাও পুলিশের দ্বারা হল না।

ভাবতে ভাবতেই পাশ ফিরলেন তিনি। অজান্তেই তার চোখ চলে গেল করিডোরের দিকে। করিডোরের হলুদ আলোগুলো অস্পষ্ট পিঙ্গল আভা তৈরি করছিল। তার মধ্যেই যা দেখলেন তাতে তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল!

কে যেন সাঁৎ করে হেঁটে চলে গেল করিডোর ধরে! গায়ে কমলা রঙের জামা!...ঘাড়ে ওটা কি!... একঝলক দেখা দিয়েই সরে গেল...অবিকল আগের দিনের মতন...একি দৃষ্টিবিভ্রম!... না......

একতলার শুনশান করিডোরের নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে গেল নারীকন্ঠের তীব্র আর্তনাদে- 'খু-উ-উ-ন... খু-উ-উ-উ-উ-ন...'।

তখন ডঃ চৌধুরীর কেবিনে অর্চিষ্মান, ডঃ হালদার আর ডঃ মনোহর চৌধুরী কথা বলছিলেন। অর্চিষ্মান আগামীকাল ছুটি চেয়েছে। ডঃ হালদার আপত্তি করেননি। স্মিত হেসে বললেন—'বাড়ির কথা মনে পড়ছে বুঝি? যাও, ঘুরে এসো'।

ডঃ চৌধুরীও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ডাক্তারদেরও ছুটি প্রয়োজন। কাঁহাতক আর পাগলের সাথে ঘর করতে ভালো লাগে!

-'আমি কাল রাতেই চলে আসব স্যার...

অর্চিষ্মান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই একতলা থেকে চিৎকার ভেসে এলো- 'খু-উ-উ-উ-ন.. খু-উ-উ-উ-উ-ন...'।

ডঃ চৌধুরী ও ডঃ হালদার পরস্পরের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে দৌড়লেন সেদিকেই। অর্চিষ্মানও পিছন পিছন গেল।

আট নম্বরের মহিলাটি উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছিলেন। তার চোখ যেন এখুনি ফেটে বেরিয়ে যাবে। মাথার চুল এলোমেলো। ভয়ে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। কোনমতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন —'ডাক্তারবাবু...ও আমায় মেরে ফেলবে!.. ও আবার আমায় মারতে আসছে.. সেই খুনীটা!.. আমি দেখেছি...'।

ডঃ চৌধুরী এবার নিজেও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তবু নিজেকে যথাসম্ভব ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেন।

–'কে মারবে আপনাকে? কি দেখেছেন?

ভদ্রমহিলা দরদর্ করে ঘামছেন। শ্বাস টানতে টানতে বললেন—'সেই লোকটা!... কমলা রঙের জামা পরা...হাতে গদা!...এইমাত্র করিডোর দিয়ে হেঁটে গেল...'।

ডঃ চৌধুরী সচকিত হয়ে ওঠেন। আবার সেই কমলা রঙের জামা আর গদার আবির্ভাব!

তিনি ডঃ হালদারের দিকে তাকিয়েছেন—'এক্ষুনি দেখে নাও, একতলার ডাক্তার- সিস্টার- ওয়ার্ডবয়- পেশেন্টরা সবাই নিজেদের জায়গায় আছে কি না। অর্চিষ্মান, তুমি দোতলায় আর তিনতলায় যাও। আমি চারতলাটা দেখছি। নষ্ট করার মত সময় নেই। এক্ষুনি দেখা দরকার যে সবাই ঠিকঠাক আছে কি না!'

অর্চিষ্মান বুঝতে পারল ডঃ চৌধুরী আসলে দেখতে চান, সবাই জীবিত আছে কি না!

—'ইয়েস স্যার'।

সে ছুটে গেল দোতলার দিকে।

দোতলার ওয়ার্ডবয় সিস্টাররাও উপর থেকে নীচের চেঁচামেচি শুনে ভীত হয়ে পড়েছিল। অনডিউটি ডাক্তাররা নীচের দিকে ছুটেছে। নীচে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! আরেকটা দুর্ঘটনা...কিংবা...!

তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসার আগেই দপ্ করে দোতলার সমস্ত আলো নিভে গেল।

—'কি হচ্ছে!' একজন জুনিয়র ডাক্তার প্রায় উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে———এসব কি হচ্ছে? কেউ টর্চ জ্বালাও!'

-'আমার টর্চ জ্বলছে না স্যার!' এক ওয়ার্ডবয়ের ব্যাকুল স্বর কানে এল।

—'আমারও না!' চতুর্দিক থেকে ভয়ার্ত গুঞ্জন ভেসে আসে—'জ্বলছে না!... আমার টর্চও জ্বলছে না!' —'একটা টর্চও জ্বলছে না! এসব কি?' জুনিয়র ডাক্তারটির গলা আবার শোনা যায়—'একসাথে সবকটা টর্চ ফেল্ পড়ে কি করে?'

—'সবাই একজায়গায় জড়ো হও'। ভিড়ের পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—'সবাই একসাথে থাকো। কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না'।

সবার বুক ঢিপঢিপ করতে শুরু করে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সকলেই যে যার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। এখন পেশেন্টদের ঘর ফাঁকা! কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে সেখানে ফিরে যাওয়ার সাহসও তাদের নেই। কে বলতে পারে, হয়তো এই অন্ধকারেই ঘাপ্টি মেরে বসে আছে খুনী!

কে যেন অদ্ভুত আশঙ্কায় বিড়বিড় করে বলল—'আবার কিছু একটা হবে...আবার বোধহয় কিছু একটা...'।

ঐ পরিস্থিতিতে কে ডাক্তার, কে ওয়ার্ডবয় আর কে-ই বা সিস্টার! একটা ভিড় অন্ধকার সিঁড়ির সামনে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

এরমধ্যেই একজন দীর্ঘদেহী ডাক্তার কখন যেন চুপিচুপি মেল ডরমেটরিতে ঢুকে পড়েছে। হাতে একটা মিনিটর্চ। তার দেহরেখা অস্পষ্ট। শুধু দেখা যাচ্ছে সাদা অ্যাপ্রণ।

টর্চের হাল্কা আলো সমস্ত পেশেন্টের মুখ স্পর্শ করে করে যাচ্ছে। একের পর এক মুখের উপর থেকে আলোটা সরতে সরতে অবশেষে গিয়ে স্থির হল ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'র মুখের উপর। তিনি তখনও স্কিজোফ্রেনিয়ার ঘোরে আচ্ছন্ন। নির্জীব ছোট্ট দেহটা বিছানায় অনড় হয়ে পড়ে আছে।

—পেয়েছি'। আগন্তুক টর্চটা নিভিয়ে দিয়েছে—'আপনাকেই তো চাই'।

ডঃ সেনগুপ্ত ঘোরের মধ্যেই বিড়বিড় করলেন—'না...না...আমায় ছেড়ে দাও'।

লোকটি উত্তর না দিয়েই তাকে অতিসহজেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে। অত্যন্ত বলশালী মানুষ সে। এমনভাবে অনায়াসে ডঃ সেনগুপ্তকে তুলে নিল, যেন ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিচ্ছে।

তিনি বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করলেন না। শুধু ফের নির্জীব, অসহায় গলায় বললেন—'আমায় ছেড়ে দাও...আমি খুনী নই...আমি খুনী নই...'।

—'আশা করি আপনি চেঁচাবেন না'। আগন্তুক একটা রুমাল চেপে ধরল তার মুখে—'তবু আপনার মুখ বন্ধ করা জরুরী। সরি ডক্টর'।

সে সেই অন্ধকারেই ডঃ সেনগুপ্তকে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগীটি নিষ্পলকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। খেয়ালই ছিল না যে, তার কয়েকটা বেডের পরের পেশেন্টকে নিয়ে একজন লম্বা ডাক্তার সামনে দিয়েই হেঁটে গেল! এত অন্ধকারে বোঝাও সম্ভব নয়! কিন্তু তবুও সে তাকিয়েছিল। কি দেখছিল কে জানে!

তার পাশের বেডের সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্টটি কিন্তু বুঝতে পারছিল যে কিছু একটা ঘটছে। সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও মুখের উপর যিনিটর্চের আলোর আভাস টের পেয়েছে। কিন্তু ভয়ে টুঁ শব্দটিও করেনি। টর্চের ক্ষীণ আলোয় ডাক্তারটিকে একঝলক দেখতেও পেল। রীতিমত লম্বা চেহারা। শক্তপোক্ত গড়ন। তার সাদা অ্যাপ্রণও চোখে পড়েছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরই ফের অন্ধকার! ডাক্তারটি নীচু গলায় কি যেন বলছিল। তারপরই একটা বুটের শব্দ তার পাশ দিয়ে মিলিয়ে গেল।

লোকটি চলে যেতেই সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে আসে। অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগীটিকে উত্তেজিত স্বরে বলে——কে এসেছিল? দেখেছেন? আপনার...মানে তোমার সামনে দিয়েই তো গেল'।

অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগী কোনও উত্তর দেয় না। সে তখনও নিষ্পলকে কি যেন দেখছে।

-'কি হল? দেখোনি...সরি, মানে দেখেননি কিছু?'

সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্ট যথারীতি 'আপনি' বলবে, না 'তুমি' ভেবে পাচ্ছে না। অন্যদিক থেকে এবারও কোনও উত্তর এল না। সে হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'তবে আমিই বোধহয় ভুল দেখেছি...অথবা স্বপ্ন দেখছিলাম...আমি একটা অপদার্থ!'

সে নিজেই নিজের মুন্ডুপাত করছিল। হয়তো আরও কিছুক্ষণ করত। কিন্তু তার আগেই করিডোরে কোথায় যেন একটা জোরালো টর্চ জ্বলে উঠেছে। করিডোরের জমাট অন্ধকার চিরে আলোর রেখা এসে পড়ছে দরজার ঠিক সামনে। হ্যালুসিনেশনের পেশেন্টটি ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায়। পরক্ষণেই পরিত্রাহি চিৎকার করে সাইকাসথেনিয়ার রোগীকে জড়িয়ে ধরল!

–'কি হল?...কি হয়েছে?' সে অবাক! এই লোকটা একটু আগেও চুপচাপ ছিল। হঠাৎ তার কি হল!

—'ঐ যে!...ঐ যে...দরজার সামনে!...আমি দেখেছি...আমি ওকে দেখেছি!'

তার কথামত দরজার সামনে তাকাল সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্ট! যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল!

দরজার সামনে একটা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে। তার হাতে ধরা একটা জিনিসের ছায়াও পড়ছে মেঝের উপর। কয়েকমুহূর্তের জন্য দেখলেও বুঝতে ভুল হয় না যে ওটা একটা লম্বা ছুরির ছায়া!

ভয়ার্ত চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল অন্ধকার দোতলার করিডোর!

অর্চিষ্মান দ্রুতগতিতে দোতলার দিকে ছুটে যেতে যেতেই শুনতে পায় উপর থেকেও ভেসে আসছে ভয়ার্ত চিৎকার! আশঙ্কায় তার বুক গুড়গুড় করে ওঠে। মাত্র একমিনিটের মাথায় ফের এরকম রক্তজল করা আর্তনাদ! কি হল উপরে? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! তাছাড়া দোতলায় এত অন্ধকারই বা কেন? একতলায় তো আলো জ্বলছে! এ কি কান্ড!

সে উপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল একটা ভিড় তখনও সিঁড়ি থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—'কে?' ভিড়ের মধ্য থেকে একজন ফিসফিস করে বলে। কাঁপা কাঁপা কন্ঠস্বরে জানতে চায়—'কে আপনি?' –'আমি অর্চিষ্মান...ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত'। সে পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালায়—'কে চিৎকার করছে?... কে চিৎকার করছিল এখানে?'

ভিড় সরিয়ে এক বয়স্কা সিস্টার এগিয়ে এলেন—" —'কিচ্ছু জানি না। শুধু চিৎকার শুনতে পেয়েছি। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না'।

—'কেন?' অর্চিষ্মান বলল—'টর্চ কোথায়? বা মোমবাতি?

—'একটা টর্চও জ্বলছে না স্যার'। এক ওয়ার্ডবয় বলে—'মোমবাতির প্যাকেটগুলো যেখানে থাকে সেখানে একটাও নেই।

কি!' সে স্তম্ভিত! ডাক্তার-সিস্টার-ওয়ার্ডবয়দের সবার টর্চ একসাথে কি করে বিকল হয়ে গেল? কি করেই বা অতগুলো মোমবাতি একসাথে গায়েব হয়ে যায়!

—'পাওয়ার কাট হয়ে যাওয়ার আগে নীচ থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম'। এবার এক ডাক্তার মুখ খুললেন—'কিন্তু পৌঁছতেই পারিনি'।

—'পাওয়ার কাট নয়'। সে চিন্তিত ভাবে বলে—'একতলায় আলো জ্বলছে। আমি কয়েক সেকেন্ড আগেই দেখে এসেছি। এই ফ্লোরের মেইন সুইচটা একবার দেখ। ফিউজও যেতে পারে। কিন্তু একসাথে সবকটা ঘরের ফিউজ যাবে বলে মনে হয় না।

সে একটি ওয়ার্ডবয়কে নিজের টর্চটা ধরিয়ে দিয়েছে—'যাও, দেখ'।

ওয়ার্ডবয়টি মাথা নেড়ে চলে গেল। ততক্ষণে নীচ থেকে পড়িমড়ি করে ছুটে এসেছেন ডঃ চৌধুরী। দোতলার পরিত্রাহি চিৎকার তার কানেও গেছে। কোনমতে দম নিতে নিতে বললেন—'কি হল? কে চেঁচাচ্ছে?'

তার কথা বলার সাথে সাথেই দোতলার আলো জ্বলে ওঠে। অর্চিষ্মান নিশ্চিত হয়। তার আশঙ্কাটাই সত্যি ছিল। মেইন সুইচ কেউ অফ করে দিয়েছে!

১৫

কিছুক্ষণ বাদেই বোঝা গেল যে আসলে ঠিক কি হয়েছে!

ডঃ হালদার একতলাটা ভালো করে দেখে এসে জানালেন যে ওখানে সব ঠিকঠাক আছে। রান্নাঘর থেকে কোনও ছুরি মিসিং নয়। চারতলার কয়েদীরাও সবাই যথাস্থানে।

নেই শুধু দুজন! দোতলার ডরমেটরির একটা বেড ফাঁকা! ডঃ সেনগুপ্ত সেখানে নেই!

আর তিনতলায় কিছুক্ষণ পরেই হৈ চৈ পড়ে গেল। পুপুকে পাওয়া যাচ্ছে না! ডঃ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না অর্চিষ্মান। একতলা থেকে তিনতলা অবধি ব্যাকুলভাবে দৌড়োদৌড়ি করছেন। আর বারবার জিজ্ঞাসা করছেন—'পাওয়া গেল? অ্যাঁ?...পাওয়া গেল কাউকে? তার প্রশ্নের মধ্যেও স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। যেন জিজ্ঞাসাটা শুধু নিখোঁজ দুটি মানুষকে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়। তাদের জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল কি না, সেটাই তার জানার মূল বিষয়।

–'এসব কি হচ্ছে?' ডঃ হালদার অস্থির ভাবে বলেন—'একতলায় একজন খুনীকে ঘাড়ে গদা নিয়ে যেতে দেখল। তার এক মিনিট পরেই দোতলায় দুজন দেখল তাকে ছুরি হাতে! এর মধ্যে স্যার আর পুপু নিখোঁজ! আমি ভাবতে পারছি না.. ভাবতে পারছি না... একটা খুনী অ্যাসাইলামে হেঁটে বেড়াচ্ছে!.. কিচ্ছু করার নেই.. ভাবতে পারছি না!'

–'পুলিশে ফোন করবো?' সপ্রশ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ডঃ চৌধুরী —' ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। স্যার আর পুপু দুজনেই মিসিং। যদি ফের মার্ডার.....!'

কথাটা আশঙ্কায় শেষ করতে পারেন না তিনি। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে।

—'ফোন পরে করবেন'। ডঃ হালদার বলেন—'আগে অ্যাসাইলামের আগা-পাশ-তলা ভালো করে খুঁজে দেখুন। তন্নতন্ন করে খুঁজুন। যদি পাওয়া যায়...'।

এর মধ্যেই অবশ্য চতুর্দিকে 'খোঁজ খোঁজ' রব পড়ে গেছে। সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটো মানুষকে। একজন বয়স্ক প্রাক্তন হিপনোসিস এক্সপার্ট। অন্যজন বালক কোটিপতি। ডঃ চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে ভগ্নস্তূপের মত বসে আছেন। বিড়বিড় করে ভাঙা গলায় বললেন———পেলেও কি অবস্থায় পাবো কে জানে!'

ডঃ হালদার তার কাঁধে হাত রাখেন। যদিও অর্চিষ্মান লক্ষ্য করল যে তার হাতের প্রত্যেকটা আঙুল কাঁপছে।

–'কুক্কু তো সবসময়ই পুপুর সাথে থাকে। একই ঘরে থাকে দুজন। সে কিছু বলতে পারল না?'

একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়ে আছেন ডঃ মনোহর চৌধুরী। অর্চিষ্মানের ভীষন খারাপ লাগে। কি উত্তর দেবে সে? একটু আগেই কুক্কুকে ঘুম থেকে তুলে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছে। বেচারা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে ভয়ে কেঁদে ফেলল। কথা বলবে কি, ক্রমাগত ফুঁপিয়েই যাচ্ছে। তবু তার মধ্যেই জানাল যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোনোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দাদা তার সঙ্গেই ছিল। তারপর কি হয়েছে, তার জানা নেই।

অর্চিষ্মান মাথা নীচু করে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকে। ডঃ হালদার আপনমনেই বলেন—'দু দুটো লোক নিজেদের ঘর থেকে লোপাট হয়ে গেল! অথচ কেউ কিছু দেখল না! পুপু না হয় কোনো কারণে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু স্যার...?'

-'ডক্টর...'

পিছন থেকে একটা ফ্যাকাশে মুখ ডেকে উঠল—'ডরমেটরিতে আজ কেউ ঢুকেছিল। আমি দেখেছি'।

এ সেই সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্ট। তার কথা শুনে দুই ডাক্তার প্রায় লোকটার উপর লাফিয়েই পড়লেন।

—'আপনি দেখেছেন? ঠিক কি দেখেছেন?'

প্রায় পুলিশের মতই প্রশ্ন করলেন ডঃ হালদার। পেশেন্ট একটু ইতস্তত করল—'না, ঠিক

সেভাবে দেখিনি। আলো খুব অল্প ছিল তাই......

-'কি দেখেছেন?

–'যে লোকটা ঢুকেছিল সে ডাক্তারের পোষাক পরেছিল'। লোকটি একটু ভেবে বলে —'সবার মুখে মিনিটর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছিল। তারপর যে পেশেন্ট মিসিং তার বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক'। এখনও 'সে'' আর 'তিনি', 'লোকটা' আর 'ভদ্রলোক'এর মধ্যে কনফিউশন!

-তারপর?'

সে অনেকক্ষন ভাবল—'কিছু বললেন বলে মনে হয়। কিন্তু কি বলল শুনতে পাইনি'।

—'লোকটাকে দেখতে কেমন?'

-'বেশ লম্বা।

—'বেশ লম্বা মানে?' ডঃ চৌধুরী বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন—'কতটা লম্বা? আমার থেকেও লম্বা? না কম?'

পেশেন্ট এবার বেকায়দায় পড়েছে। ফ্যাকাশে ঠোঁট চেটে বলল—'বোধহয় আপনার থেকে সামান্য কম'।

—'শিওর?'

সে একটু ভেবে ফের বলে—'না। হয়তো আপনার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশিই হবে'।

–'ঠিক করে ভেবে বলুন প্লিজ'। ডঃ চৌধুরীর মুখে কাতর অভিব্যক্তি—'একমাত্র আপনিই দেখেছেন তাকে। ভেবেচিন্তে বলুন'।

বলাইবাহুল্য সে লোকটার চেহারার সঠিক বর্ণনা দিতে পারল না। কখনও সে রোগা, লম্বা হয়। কখনও তাকে আবার অতটা লম্বা মনে হয় না। কখনও মনে হয় যে সে একটু মোটা, চ্যাপ্টা চেহারার দশাসই একটা লোক ছিল। কখনও বর্ণনা অনুযায়ী অ্যাথলেটিক চেহারা হয়ে যায় তার!

—'ওঃ ঈশ্বর!' ডঃ হালদার অধৈর্য হয়ে বলেন—'একই সাথে একটা লোক রোগা-মোটা, দশাসই-অ্যাথলেটিক, লম্বাকম লম্বা হয় কি করে? এই ডেসক্রিপশন টোট্যালি কনফিউজিং!'

পেশেন্টের মুখ বিষণ্ণ—' দেখলেন ডাক্তারবাবু। আপনাকে আগেই বলেছিলাম। আমি একটা অপদার্থ! কোনও কাজই ঠিকভাবে পারি না...'।

সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গেই এক্সপ্রেশন চেঞ্জ! ডঃ চৌধুরীর মুখ থেকে উৎকণ্ঠার ছাপ মুছে গেল। বরং তার বদলে সপ্রশংস একটা ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন।

–কে বলল আপনি পারেন না? এই তো নিজে থেকে এগিয়ে এসে কত ইনফর্মেশন দিলেন। অনেকে তো এটুকুও পারে না। তাছাড়া মিনিটর্চের আলোয় অ্যাকুরেট দেখা সম্ভবও নয়। তা সত্ত্বেও আপনি অনেকটাই হেল্প করেছেন'।

অর্চিষ্মান মানতে বাধ্য হল যে সাইক্রিয়াট্রিস্ট হতে গেলে ভালো অভিনেতাও হতে হয়। ডঃ হালদারের মুখের ভাবও পালটে গেছে। তিনি সোৎসাহে বললেন—'ঠিকই তো! আপনি যতটা ডেসক্রিপশন দিয়েছেন, তা যথেষ্ট। চলুন, আপনাকে ডরমেটরিতে রেখে আসি'।

কথাটা শেষ করতে না করতেই তিনতলা থেকে আওয়াজ এল—'স্যার...পাওয়া গেছে...পাওয়া গেছে...'।

—কে?' ডঃ চৌধুরী সবেগে তিনতলার দিকে দৌড়লেন—'কাকে পেলে?...কাকে পাওয়া গেল?'

–'পুপুকে স্যার'। উপর থেকে উত্তর আসে—'পুপু পড়ে আছে ছাতে!'

পুপু ছাতে পড়ে আছে! সে ছাতে কি করতে গিয়েছিল! ডঃ চৌধুরীর বুকে আতঙ্ক থাবা বসায়। ছেলেটা বেঁচে আছে তো!

বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। তা সত্ত্বেও প্রায় পাগলের মতই ছুটে গেলেন ছাতে।

চারতলার খোলা ছাতে পুপু শুয়ে ছিল। তার শোওয়ার ভঙ্গিটা বেশ পরিপাটি। যেন খুব

নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ডঃ চৌধুরী সেখানে পৌঁছতেই একজন তরুণ ডাক্তার জানায়

—'অজ্ঞান হয়ে আছে স্যার। নিঃশ্বাস পড়ছে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভদ্রলোকের। তিনি অচেতন পুপুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। বাচ্চাটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই একটা পরিচিত মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে তার।

-'ক্লোরোফর্ম!' তিনি বিস্মিত—'কেউ ক্লোরোফর্ম দিয়েছে!'

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে তার কয়েকমুহূর্ত লাগল। পুপুকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে চারতলার ছাতে নিয়ে এসেছিল কেউ! কিন্তু কেন?

সম্ভাব্য কারণটা ভাবতেই তার দেহ যন অবশ হয়ে আসে। ছেলেটাকে এখান থেকে নীচে ফেলে দিলেই শেষ হয়ে যেত সে! সেই উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল কেউ। কিন্তু নীচের চেঁচামেচিতে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন ছেলেটাকে এখানে রেখেই পালিয়ে গেছে!

তার কপালে চিন্তার ভাঁজ প্রকট হয়। আজ স্রেফ বরাতজোরে বেঁচে গেছে পুপু। একতলার অঞ্জলি গুপ্ত আর দোতলার পেশেন্টরা চেঁচামেচি না করলে এতক্ষণে এই ঘুমই চিরনিদ্রা হত তার।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও কয়েকটা অবধারিত প্রশ্ন মনে জাগে। একতলার প্রত্যক্ষদর্শী খুনীর হাতে গদা জাতীয় কিছু দেখেছে। দোতলার লোকেরা আবার তার হাতে ছুরি দেখল! এত তাড়াতাড়ি অস্ত্র বদল হল কি করে? আর কেনই বা এই পরিবর্তন? যার একঘায়ে চিরঞ্জীব মিত্র'র মতন শক্তপোক্ত লোকও মারা গেল, তার আঘাতে কি এই বাচ্চাটা মরত না? নয়তো কেনই বা তাকে ছুরি নিতে হল! অথচ সে ছুরিটাও ব্যবহৃত হয়নি! সোজা বুকে বসিয়ে দিলেই চ্যাপ্টার ক্লোজড্! তা না করে শেষপর্যন্ত ক্লোরোফর্ম!

অনেক ভেবেচিন্তেও কোনও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেলেন না ডঃ চৌধুরী। অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ছেলেটাকে নীচে নিয়ে যাও। দেখ, স্মেলিং সল্ট দিয়ে যদি জ্ঞান ফেরাতে পারো।

অর্চিষ্মান আর ওয়ার্ডবয়রা ধরাধরি করে পুপুকে নিয়ে গেল। ডঃ চৌধুরীর বুকের ভিতরটা তখন আঁকুপাঁকু করছে। ছুরি বা গদাজাতীয় কিছুর ব্যবহার পুপুর উপর হয়নি। তবে কি অন্য কারুর মাথায় বা বুকে পড়ল?

—'হালদার, স্যারকে খুঁজে পাওয়াটা আর্জেন্ট'।

ডঃ হালদার ইঙ্গিতটা বুঝে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে নীচের দিকে নেমে গেলেন। দুটো অস্ত্রের কোনটাই যেহেতু পুপুর উপরে প্রয়োগ করা হয়নি, সেহেতু ডঃ সেনগুপ্ত বেঁচে আছেন কি না সেটাই বর্তমানে চিন্তার বিষয়!

ডঃ চৌধুরীর নিজেকে এত অসহায় আগে কখনও মনে হয়নি। তার অসম্ভব কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন ছোটখাটো শীর্ণ মানুষটার বুক ফুঁড়ে উঁচিয়ে আছে একটা নিষ্ঠুর ছুরির বাঁট.......ঠিক যেমনভাবে অমিতাভর ছিল।

দৃশ্যটা চোখের সামনে কল্পনা করেই তিনি শিউরে ওঠেন। বাজ পড়া গাছের মত ধ্বস্ত, নিষ্প্রাণ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন ছাতেই। নীচে যেতে ভয় করে। প্রতিটা মুহূর্ত অসহ্য মনে হচ্ছে... একটা ডাকের প্রতীক্ষা করছেন.. অথচ তিনি যেন জানেন ডাকটা কিভাবে আসবে...হয়তো আরও একটা আর্তচিৎকার...!

এভাবেই প্রায় আধঘন্টা অতিক্রান্ত হল। একটা পাতা পড়লেও উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন ডঃ চৌধুরী। একটা সামান্য শব্দেও উচ্চকিত হয়ে উঠছেন।

যখন এই প্রচন্ড উত্তেজনা তার অসহ্য ঠেকতে শুরু করেছে, তখনই পিছন থেকে মৃদু

ডাক এল।

—'স্যার'। ডঃ হালদার অদ্ভুত উত্তেজিত ভাবে ডাকলেন—'শিগিরি আসুন'।

—'কি?' ডঃ চৌধুরীর কন্ঠস্বর নিঙড়ে উত্তেজনা চুঁইয়ে পড়ে—'কি হয়েছে?'

—'স্যারকে পেয়েছি!' তিনি একটু থামলেন—'আপনি একবার আসুন'।

ডঃ চৌধুরী সভয়ে ধৃতিমান হালদারের দিকে তাকালেন। 'উনি কি বেঁচে আছেন?'—প্রশ্নটা করতে বাধো বাধো ঠেকছে। তাই অসহ্য উত্তেজনার দাপাদাপি বুকে চেপেই নেমে এলেন উপর থেকে।

ডঃ হালদার তাকে নিয়ে এলেন দোতলায়। সোজা ঢুকে গেলেন হিপনোসিস রুমে। সেখানে তখন মৃদু আলো জ্বলছিল। আবছা আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যায় না। ডঃ হালদার মেইন আলোটা জ্বেলে দিয়েছেন।

—'ঐ দেখুন'।

ডঃ চৌধুরী সবিস্ময়ে দেখলেন হিপনোসিস চেয়ারে কেমন যেন হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ে আছেন পুলক সেনগুপ্ত! চোখ দুটো যেন আঠা দিয়ে বোঁজা। মুখের ভাব প্রশান্ত। গায়ে কোনও রক্তের দাগ নেই!

তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ডঃ সেনগুপ্ত'র দিকে। তার হাত-পা তখনও কাঁপছে। অতিকষ্টে হাত রাখলেন শায়িত মানুষটার নাকের নীচে। নাঃ, নিঃশ্বাস পড়ছে—কিন্তু ভীষণ আস্তে। ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধটা কিন্তু নাকে এল না। আততায়ী ডঃ সেনগুপ্তকে ক্লোরোফর্ম দেয়নি! তবে সে ভদ্রলোককে নিয়ে কি করছিল? উনিই বা এমনভাবে পড়ে আছেন কেন?

এর উত্তরটা ডঃ হালদার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দিয়ে দিলেন।

—'স্যার, ডঃ সেনগুপ্ত সম্ভবত হিপনোটাইজ্‌ড্ হয়ে গেছেন!'

মনোহর চৌধুরী চম্‌কে ওঠেন! ডঃ পুলক সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ্‌ড্! অসম্ভব!

-'সচরাচর ওঁর চোখ খোলা থাকে। কিন্তু এখন বোঁজা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শ্লথ ও ভারি। ব্লাড প্রেশার, পাটে—সবই কম'। ডঃ হালদার বলেন—'আপনিও জানেন স্যার, এগুলো সব হিপনোসিসের সিম্পটম। উনি হিপনোসিসে আছেন'।

ডঃ চৌধুরীর বিশ্বাস হয় না। স্যারকে সম্মোহিত করতে পারবে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ধৃতিমান হালদারের মতন এক্সপার্ট সাইক্রিয়াট্রিস্টেরও নেই। সেখানে একজন আততায়ী অনায়াসেই কাজটা করে ফেলল! অত সহজ!

তিনি মৃদু অথচ ভীষণ নম্র গলায় জিজ্ঞাসা করলেন——ডঃ সেনগুপ্ত...আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' কোনও উত্তর নেই। ডঃ চৌধুরী ডঃ হালদারের দিকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এক মুহূর্ত তার দিকে দেখেই ফের চোখ ফেরালেন পুলক সেনগুপ্ত'র দিকে। প্রশ্নটা সেই একই ভঙ্গিতে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন।

-'ডঃ সেনগুপ্ত, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর আচ্ছন্ন, ক্লান্ত গলায় টেনে টেনে বললেন তথাকথিত হিপনোসিস কিং। -'পা-চ্ছি'।

শিউরে উঠলেন তিনি! স্যার উত্তর দিচ্ছেন! তা ও স্বাভাবিক ভাবে। এ কি করে সম্ভব!

—'আপনি কে?'

এবারও একটু সময় নিয়ে উত্তর এল। যান্ত্রিক স্বরে বললেন—'আমি পুলক সেনগুপ্ত। সাইক্রিয়াট্রিস্ট'।

—'মাই গড!...মাই গড!' ডঃ চৌধুরী অধীর আনন্দে উত্তেজিত স্বরে বলেন—'আই কান্ট বিলিভ দিস্। আই জাস্ট কান্ট বিলিভ.. রাপোর্ট জোন সাড়া দিচ্ছে...স্যার সাড়া দিচ্ছেন!...হি ইজ কমপ্লিটলি হিপনোটাইজ্‌ড্! হি ইজ হিপনোটাইজ্‌ড্! মাই গড!'

অর্চিষ্মান ততক্ষণে হিপনোসিস রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের আলো জ্বলতে

দেখে কৌতুহলী হয়ে চলে

এসেছিল। ভিতরের কিছু বাক্যালাপও তার কানে গেছে। সে উৎসুক ভাবে তাকায়। 'রাপোর্ট জোন' শব্দটা তার অপরিচিত।

ডঃ হালদার ফিসফিস করে তাকে বুঝিয়ে বললেন—'হিপনোসিসকে পার্শিয়াল স্লিপ বলতে পারো। রোগী ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি স্তরে থাকে। হিপনোসিসে মস্তিষ্কের বেশিরভাগ অংশই নিস্তেজিত। শুধু মাত্র কানের একটা অংশ সবচেয়ে বেশি সজাগ থাকে। আর ঐ সজাগ অংশটার মাধ্যমেই ডাক্তারের সাথে তার যোগসূত্র তৈরি হয়। সে ডাক্তারের কথা শুনতে পায়—সাড়াও দেয়। ঐ বিশেষ সজাগ পার্টটাকেই বলে 'রাপোর্ট জোন'। রাপোর্ট জোন রেসপন্স না করলে হিপনোসিস সাকসেসফুল হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে স্যার, ডঃ চৌধুরীর কথা শুনতে পাচ্ছেন—সাড়াও দিচ্ছেন। অর্থাৎ রাপোর্ট জোন রেসপন্স করছে—এবং হিপনোসিস সাকসেসফুল'।

ডঃ চৌধুরী একবার খুব সাবধানে ডঃ সেনগুপ্তকে স্পর্শ করতে গিয়েও থেমে গেলেন। হিপনোসিস ভেঙে যেতে পারে—এই ভয়ে তাকে ছুঁলেন না। শুধু আগের মতই সহৃদয় কণ্ঠে বলেন—'আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?'

চঅবচেতন মন থেকে একটা বুকভাঙা হাহাকার উঠে এল—'আমি খুন করেছি!'

ডঃ চৌধুরী তড়িৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে উঠলেন। চমকে উঠেছেন ডঃ হালদারও! অর্চিষ্মানের সমস্ত স্নায়ু পেশী টানটান হয়ে উঠল! কি বলছেন ডঃ সেনগুপ্ত! তাহলে কি উনিই.. .!

ডঃ চৌধুরী আর ডঃ হালদার নীরবে সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। যেন হিপনোসিসের প্রশ্নোত্তর পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কিনা ভাবছেন। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে ফের প্রশ্ন করলেন ডঃ চৌধুরী—

–'কাকে খুন করেছেন?

আবার স্তব্ধতা! ডঃ সেনগুপ্ত'র মুখে ঘামের বড় বড় ফোঁটা! ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এমন ভাবে উত্তর দিলেন, যেন তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

–'আমি বিপাশাকে খুন করেছি'।

ডঃ হালদারের মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেল। এই 'বিপাশা'টি কে সেটা উনি বোধহয় উদ্ধার করতে পারেন নি। ডঃ চৌধুরীর চোখ তীক্ষ্ণ। মনে হল এই নামটার সাথে তিনি পূর্বপরিচিত। তবু জানতে চাইলেন—'বিপাশা কে?'

-'আমার পেশেন্ট'।

–'কিসের পেশেন্ট?'

—'অ্যাংজাইটির'।

-'কিসে ভয় ছিল তার?'

-'জলে'।

–'কিভাবে খুন করেছেন?

-'জানি না'।

–'কেন খুন করেছেন?'

—জানি না'।

—'তবে কেন বলছেন যে, তাকে খুন করেছেন?'

ডঃ সেনগুপ্ত ফের চুপ মেরে গেলেন। কোনও উত্তর নেই। বোধহয় তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ডঃ চৌধুরী কিছুক্ষণ তার উত্তরের অপেক্ষায় থেকে আবার প্রশ্নটা করলেন।

–'কেন আপনার মনে হয় যে বিপাশাকে আপনি খুন করেছেন?'

এইবার থথর্ করে কেঁপে উঠলেন ডঃ পুলক সেনগুপ্ত। ভয়ার্ত ভাবে বললেন—'ওরা আমায় 'খুনী' বলছে...। ...একটা লোক চিৎকার করে বলছে আমি খুনী.. আমি বিপাশাকে....আঃ...!'

বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি। অবসন্নের মত এলিয়ে পড়লেন। তার আর কথা বলার শক্তি নেই। —'আর নিতে পারছেন না'। ডঃ চৌধুরী ইশারা করছেন—'ওঁর মুখের উপর বড় আলোটা জ্বেলে দাও'।

মুখের উপর চড়া আলোর রশ্মি এসে পড়তেই ভদ্রলোক চোখ মেলে তাকালেন। শিশুর মত সরল বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই আবার চোখ বুঁজে ফেলেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাকে।

ডঃ চৌধুরী এবার সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। হাত বোলাতে বোলাতেই বললেন —'কিন্তু ব্যাপারটা কি হল কিছু বুঝলে? ওঁকে হিপনোসিস দিল কে? যতই ভাবছি ততই অবিশ্বাস্য ঠেকছে। যা আমরা এত চেষ্টা করেও পারলাম না, তা একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক করে ফেলল কি করে?'

ডঃ হালদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হিপনোসিস রুমটা দেখে নিচ্ছেন। চতুর্দিকটা দেখতে দেখতেই তার চোখে পড়ল, টেবিলের উপর কি যেন পড়ে আছে। তার পাশে একটা ছোট্ট কাগজ।

তিনি সবিস্ময়ে জিনিসটাকে তুলে নেন। ওটা আর কিছুই নয়, একটা সাধারণ আয়না!

–'ওটা কি!' মনোহর চৌধুরী সবিস্ময়ে বললেন—'আয়না! আয়না এখানে কি করছে!'

ডঃ হালদার উত্তর না দিয়ে তার পাশের কাগজটা খুলে পড়লেন। তার ভিতরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা'দয়া করে ডঃ সেনগুপ্তকে হিপনোসিস দেওয়ার সময়ে এটা ব্যবহার করবেন। ধরে নিন্ এটা আমার পক্ষ থেকে হিপনোসিস কিঙের প্রতি একটা ছোট্ট শ্রদ্ধার্ঘ্য। ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি'।

——'অদ্ভুত!' ধৃতিমান হালদার অভিভূত হয়ে পড়েছেন—'আমি ভাবছি এই বুদ্ধিটা আমাদের মাথায় এলো না কেন?' ডঃ চৌধুরীর মুখ বিস্ময়ে লম্বাটে। একটা কিম্ভূতকিমাকার অভিব্যক্তি দিয়ে বললেন——— কি বলছ?'

–'ঠিকই বলছি স্যার'। ডঃ হালদার বললেন—'আসল কারিকুরি এই আয়নাটারই। ডঃ সেনগুপ্তকে কেউ হিপনোটাইজ করেনি। সে ক্ষমতা একজন ছাড়া আর কারুর নেই। আর সেই 'একজন'টা স্বয়ং ডঃ সেনগুপ্ত। উনি নিজেই নিজেকে হিপনোসিস দিয়েছেন'।

-'সে আবার কি! এরকম হয় না কি!

—'আলবাৎ হয়। হয় বলেই তো বলছি, আমাদের মাথায় এই বুদ্ধিটা এলো না কেন!' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'যে লোকটি ডঃ সেনগুপ্তকে এখানে তুলে এনেছিল সে বিশেষ কিছুই করেনি। শুধু ওঁকে চ্যালেঞ্জ করেছে। উনি যথারীতি সেই লোকটিকেই হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখনই সর্বশক্তি দিয়ে তাকে হিপনোসিস দেওয়ার চেষ্টা করলেন, ঠিক তখনই লোকটি সুযোগ বুঝে স্যারের মুখের সামনে এই আয়নাটা ধরল। তাতে

স্বাভাবিক ভাবেই ডঃ সেনগুপ্ত'র নিজেরই রিফ্লেকশন পড়ছিল। স্যার সুস্থ অবস্থায় নেই। তিনি আয়নার লোকটাকেই প্রতিপক্ষ ভেবে তাকেই হিপনোটাইজ করলেন, অর্থাৎ নিজেকেই হিপনোটাইজ করলেন!' ডঃ হালদার একটু থেমে যোগ করলেন—'আমরা জানতাম ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'র চোখের সামনে অতি বড় ধুরন্ধরও বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না। এখন দেখা গেল উনি নিজেও টিঁকতে পারেন না! আয়নায় ওঁর যে চোখদুটোর রিফ্লেকশন পড়ছিল, তার শক্তির সামনে উনি নিজেই দুর্বল! ডঃ সেনগুপ্ত'র সবচেয়ে বড় শক্তিটাই যে সবচেয়ে বড়

দুর্বলতা—তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেউ!'

–'এই 'কেউ'টি বন্ধু না শত্রু বুঝতে পারছি না! কিন্তু তার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়!' মনোহর চৌধুরী বললেন—' –' এই রাস্তাতেই স্যারকে সাজেশন আন্ডার হিপনোসিস দাও হালদার। রোগের কারণটা যখন বোঝা গেছে, তখন কিওর ও হয়তো সম্ভব'।

–'কারণটা আপনি বুঝেছেন?' ডঃ হালদারের কণ্ঠে বিস্ময়-'আমার তো স্রেফ মাথার উপর দিয়ে গেল! শুধু খুনের কথাটাই যা বুঝলাম!'

—'তোমার বোঝার কথাও নয়। তুমি তখন বিদেশে ছিলে। আমিও ঘটনাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! দুহাজার সালের ঘটনা...' |

ডঃ মনোহর চৌধুরী পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন। সবমিলিয়ে যা বোঝা গেল তাহল, বিপাশা একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ের নাম। দু হাজার সালের প্রথম দিকে ডঃ সেনগুপ্ত'র কাছে তাকে তার বাবা-মা ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে আসেন। সে অ্যাংজাইটির পেশেন্ট ছিল। জলে প্রবল আতঙ্ক। এর কারণ সে বলতে পারছিল না। বলার মতন অবস্থাও ছিল না তার।

ডঃ সেনগুপ্ত রোগটা শুধু ধরতেই পারলেন না, অব্যর্থ হিপনোসিসের মাধ্যমে তার ভিতর থেকে রোগের কারণটা টেনেও বের করে আনলেন। এরপর এক্সপার্ট সাইক্রিয়াট্রিস্টের 'সাজেশন আন্ডার হিপনোসিসে' কয়েক মাসের মধ্যেই তার আতঙ্ক কাটতে শুরু করল। যে মেয়ে জল দেখলেই ফিট পড়ত, তাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে শেখালেন ডঃ পুলক সেনগুপ্ত।

এর মাস দুয়েক পরেই এক বন্ধুর বাড়ির পুরনো পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা গেল বিপাশা! এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত! একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে শোকার্ত মা-বাবার সমস্ত রাগ পড়ল গিয়ে ডঃ সেনগুপ্তর উপর। মেয়েটির বাড়ির লোক ঘেরাও করল তাকে। হসপিটাল ভাঙচুর করল। বারবার তাকে 'খুনী' বলে অভিহিত করে শাপশাপান্ত করে গেল তারা।

ডঃ সেনগুপ্ত চুপ করে গোটা ঘটনাটাই দেখলেন। সব ঝঞ্ঝাট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডঃ চৌধুরী দেখেছিলেন নিজের ঘর অন্ধকার করে বসে আছেন ডঃ সেনগুপ্ত! প্রিয় ছাত্রকে দেখে একবার শুধু বিড়বিড় করে বলেছিলেন—'আমি মেয়েটাকে মেরে ফেললাম? মনোহর, আমিই কি মেয়েটাকে মারলাম...?'

অদ্ভুত বেদনা ঝরে পড়েছিল তার কণ্ঠস্বরে। মনোহর চৌধুরীর মনে হয়েছিল, ভিতরে ভিতরে স্যার কাঁদছেন। কিন্তু মনোবিদের প্রকাশ্যে কান্নার উপায় নেই!

ডঃ চৌধুরী পুরো ঘটনাটা বলতে বলতেই একটু থামলেন। তারপর বললেন-

–'দেখে নাও অর্চিষ্মান!' স্যারের কপালে হাত রেখে পরম মমতায় বললেন তিনি——এই হলো জিনিয়াস সাইক্রিয়াট্রিস্টের জীবনের পরিণতি!'

১৬

পরদিন সকালে অফিসার পবিত্র আচার্যর ঘরে অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুনিয়র অফিসার অর্নবের আবির্ভাব হল।

পবিত্র আড়চোখে তার দিকে তাকায়—'বলো, কি সমাচার?

-'সমাচার এখনও নেই স্যার, কিছু ইনফর্মেশন চাই'।

–'কি ইনফর্মেশন?'

কোনরকম ভূমিকা না করেই অর্নব বলল—'দময়ন্তী সেন মার্ডার কেসের ফাইল আর নথিপত্র চাই'।

–'দময়ন্তী সেনের ফাইল?' পবিত্র উঠে দাঁড়িয়েছে— 'একটু বোসো'।

পবিত্র আচার্যর 'একটু' প্রায় একঘন্টায় গিয়ে শেষ হল। তারও দোষ নেই। দুই কানে তিনটে মোবাইল আর ল্যান্ডফোন সামলাতে সামলাতে সে প্রায় নাকানি চোবানি খাচ্ছে! মোবাইলের মধ্যে দুটো তার নিজের। অন্যটা অধিরাজের অফিসিয়াল মোবাইল। অফিসার অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার পর থেকেই তার ডিউটিটাও করতে হচ্ছে পবিত্রকে। একসাথে এত চাপ নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বেচারা। তিনটে মোবাইল একের পর এক বেজেই চলেছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবে? তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়া ল্যান্ডফোন তো আছেই!

প্রায় একঘন্টা ধরে অপেক্ষা করার পর অবশেষে কাজ হল। দময়ন্তী সেন মার্ডার কেসের ফাইল অর্নবকে দিতে দিতে বলে পবিত্র—'এ কেসের ফাইল যখন নিয়েই যাচ্ছ, তখন রাজাকে কারেন্ট আপডেটটাও দিয়ে দিও'।

–'কারেন্ট আপডেট?'

—'হ্যাঁ'। সে বলল—'কুক্কুর বাবা ও পুপুর স্টেপফাদার বিজ্ঞানী অসিত চ্যাটার্জী ফেরার হয়েছেন'।

অর্নব অবাক হয়—'সেকি! পুলিশ কাস্টডি থেকে পালালেন কি করে?'

–'পুলিশ কাস্টডি থেকে পালাননি'। তার মোবাইল বেজে উঠেছে। সে নম্বরটা দেখে নিয়ে কেটে দিল—'ওঁর নামে কেস চলছিল। একসপ্তাহ আগে জামিন পেয়েছিলেন। তারপর থেকে আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না!'

অর্নব বুঝতে পারছিল না কি বলবে! এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ এই মুহূর্তে আর কিছুই হতে পারে না।

—'অবশ্য কোথায় আর পালাবেন?...ধুত্তোর!' শেষ কথাটা অবশ্য অর্নবের উদ্দেশ্যে নয়। পবিত্রর মোবাইল ফের বেজে উঠেছে। সে বিরক্ত হয়ে ফোনটাই সুইচ অফ করে দেয়।

—সব জায়গায় হুলিয়া জারি হয়ে গেছে। তাঁর পাসপোর্ট, ভোটার আই ডি, প্যানকার্ড—যায় সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুলিশের কাছে। ব্যাঙ্কগুলোতেও খবর গেছে। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এ টি এম বা যে কোনভাবেই টাকা তুলতে গেলেই ধরা পড়বেন। আমরা ওঁর মোবাইল ট্র্যাক করার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু ফোন সুইড্ অফ থাকায় লোকেট করাই যাচ্ছে না।

লোকটার বুদ্ধি আছে। অর্নব মনে মনে ভাবে। বিজ্ঞানী হওয়ার দরুণ ভদ্রলোক ভালোভাবেই জানেন যে সেলফোনের লোকেশন ট্র্যাক করেই পুলিশ তাকে ফের হাজতে পোরার চেষ্টা করবে। তাই ফোনটাই হয়তো নিয়ে যাননি।

–'মোবাইল না থাকলেও চলে। কিন্তু বাড়ি থেকে মাত্র দু হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে যেতে পেরেছেন। স্ত্রী'র গয়নাগাঁটিও নেননি। কলকাতা শহরে ঐ টাকায় ক'দিন চলবে? টাকা তো তুলতেই হবে'। পবিত্র আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে—'তখনই খপাৎ।

–'সে তো খপাৎ হবেন। কিন্তু কতদিনে স্যার?'

–বেশিদিন হয়তো লাগবে না'। আত্মবিশ্বাসী উত্তর—'কিন্তু যতদিন না ভদ্রলোক ধরা পড়ছেন, ততদিন যেন ওঁর সৎ ছেলে...কি যেন নাম...?'

-'পুপু'।

—'ইয়েস, পুপুকে একটু নজরে রাখো। ভদ্রমহিলার প্রপার্টির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। সব মিলিয়ে মিনিমাম কুড়ি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তো হবেই! তার সাথে কোম্পানী, বাড়ি, জমি তো আছেই। আ হিউজ প্রপার্টি! আর ঐ বাচ্চাটাই এসবের একমাত্র ওয়ারিশ। কিছুই বলা যায় না। ওর উপর অ্যাটাক হতেই পারে'।

অর্নবের মাথা ঘুরতে শুরু করে। এত টাকার মালিক ঐ বারো বছরের ছেলেটা! নতুন করে আর অ্যাটাক হবে কি! ইতিমধ্যেই একবার আক্রান্ত হয়েছে সে। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা পড়ে। পুপুর জীবন বিপন্ন। স্যারকে খবরটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানানো দরকার।

সে একটু ইতস্তত করে বলল—'যদি পুপুর কিছু হয়ে যায়...আই মিন কোনো দুর্ঘটনা বা অন্যকিছু—সেক্ষেত্রে অন্য কোনও ওয়ারিশ কেউ আছে কি?'

পবিত্র একটু কি যেন ভাবে—'এইটা বলা মুশকিল। কারণ ভদ্রমহিলার কোনো উইল নেই। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম দাবিদার স্বামী। কিন্তু যেহেতু ভদ্রলোকের নামে খুনের মামলা চলছে সেহেতু মহিলার নিজের ছেলেই প্রপার্টির দাবিদার। ছেলের অবর্তমানে কে পাবে, বলতে পারছি না!'

–'দময়ন্তীর অন্য কোনও রিলেটিভ?'

—'অন্য কোনও রিলেটিভের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি'। পবিত্র কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—'তবে তুমি বললে বলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কেসটা চলাকালীন জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওদের পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা কথা প্রসঙ্গেই একটা তথ্য দিয়েছিলেন। দময়ন্তী সেন নাকি তাকে গল্পচ্ছলেই বলেছিলেন, যে তার এক অনাথ কাজিন ব্রাদার ছিল। দময়ন্তীর বাড়িতেই সে থাকত। তার আবার অভিনয়ের শখ ছিল। দু একটা ফিল্মে অভিনয়ও করেছিল। কিন্তু সেগুলোর একটাও চলেনি। বিয়ের পর অবশ্য ছেলেটির সাথে তাঁর আর যোগাযোগ ছিল না।

—'সেই কাজিন ব্রাদারকে পেয়েছিলেন স্যার?"

–'নাঃ'। সে যাথা নাড়ে—'কাজিন ব্রাদার তো দূরের কথা, দময়ন্তীর মা-বাবাকেই পাইনি। ভদ্রমহিলার প্রি-ম্যারেড লাইফটাই মিস্টিরিয়াস! তার কাগজপত্র ঘেঁটেও প্রাক-বিবাহ জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি। দময়ন্তী সেনের সব রেকর্ড পাওয়া যায় উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে। তার আগের কোনও রেকর্ডই নেই!'

অর্নব চমৎকৃত হয়! এ আবার কি গেরো!

–'শুধু প্রথম স্বামী তপন কুমার সেনের সাথে বিয়ের ছবি পাওয়া গেছে। বিয়েতে রেজিস্ট্রি হয়নি। মিঃ সেনের কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না। উনি দিল্লীতে একা থাকতেন। দময়ন্তীকে বিয়ে করার পর নিরানব্বই সালে পুপুর জন্ম। পুপুর বার্থ সার্টিফিকেটটাই প্রথম কাগুজে ডকুমেন্ট। এমনকি ভদ্রমহিলার ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট—সমস্তটাই তার প্রথম বিয়ের পর ইস্যু হয়েছে। তার আগে কোনও রেকর্ডই নেই'। পবিত্র আস্তে আস্তে বলে—'আমার মনে হয়, ভদ্রমহিলার প্রি-ম্যারেড লাইফে কিছু গোলমাল আছে'।

-'হুঁ'।

সে বলল—'তোমার যদি কাজিন ব্রাদারের বিষয়ে আরও কিছু জানার দরকার থাকে তবে তুমি ওদের প্রতিবেশীনীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। তার নাম, ঠিকানা, স্টেটমেন্ট---সব ফাইলেই পেয়ে যাবে'। বলতে বলতেই ফিক্ করে হেসে ফেলেছে—'যন্তর একটি! তোমার স্যার হলে প্রবলেম কিছু হত না। কিন্তু তুমি বলেই বলছি,-- সামলে কথা বোলো! ফাইলে শুনানির বিবরণ আর ফরেনসিক রিপোর্টও দিয়ে দিয়েছি। ওর ভিতরে পুপু, কুক্কু, অসিত চ্যাটার্জী আর দময়ন্তীর সব ডকুমেন্ট আছে। আশা করি সমস্যা হবে না'।

-'থ্যাঙ্কস স্যার'।

একমাথা চিন্তা নিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়ে অর্নব। গল্পে এ আবার কি ট্যুইস্ট!

-‘রাজাকে বোলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে’। পবিত্রর দ্বিতীয় মোবাইলটা এবার তারস্বরে বাজতে শুরু করেছে। সে ফোনটা রিসিভ করতে করতে বলে—‘নয়তো খুব শিগগিরি আমাকেই অ্যাসাইলামে গিয়ে উঠতে হবে’।

অর্নব মাথা নেড়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল। তার হাতে সময় কম। কিন্তু কাজ প্রচুর। ডেডলাইন আজ রাত সাড়ে বারোটা! স্যারের কড়া নির্দেশ!

এরপরের গন্তব্যস্থল কসবার সেই হাউজিং কমপ্লেক্স। যেখানে দময়ন্তী সেন পুপুকে নিয়ে থাকতেন। এখানেই অসিত সেনের সঙ্গে আলাপ ও পরিণয়। বিয়ের পরও দুজনে এখানেই থাকতেন। ফোর বাই এ কমলিনী অ্যাপার্টমেন্টই ছিল তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

অর্নব পথেই দময়ন্তীর প্রতিবেশীনীর বয়ান পড়ে দেখেছে। তার স্টেটমেন্টে কাজিন ব্রাদারের উল্লেখ নেই। সম্ভবত ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সে কথা স্টেটমেন্টে লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবু স্যার যখন বলেছেন, একবার খোঁজ নিতেই হচ্ছে। তখন

ভদ্রমহিলার নাম পাপড়ি গুপ্ত। ইনিই অসিত চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধপক্ষের অন্যতমা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। তার বয়ানে স্পষ্ট লেখা আছে যে অসিত চ্যাটার্জী ও দময়ন্তীর মধ্যে সবসময়ই অশান্তি লেগে থাকত। রেগে গিয়ে কর্তা গিন্নীকে খুনের হুমকিও দিয়েছিলেন। দময়ন্তী সেনের মৃত্যুর দিন এই মহিলাই ভদ্রলোককে একটা খালি শিশি বারান্দার জানলা থেকে নীচের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেন। সেই শিশিটা পরে পুলিশ উদ্ধারও করে। পাপড়িদেবী সেটাকে শনাক্ত করেছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ শিশিটায় নিঃসন্দেহে থ্যালিয়ামই ছিল। ওটায় দুজনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। কুক্কু ও অসিত চ্যাটার্জীর। কুক্কুর হাতের ছাপ থাকলেও সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ একটা দশবছরের বাচ্চা ছেলের পক্ষে থ্যালিয়াম কি সেটা বোঝাই সম্ভব নয়! কিন্তু তার পাশেই অসিতবাবুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট জ্বলজ্বল করছে। তিনি একজন বিজ্ঞানী। নানারকম বিষ ও বিষাক্ত কেমিক্যাল নিয়ে নাড়াচাড়া করাই তার কাজ। উপরন্তু বাড়ির একটা অংশে প্রাইভেট ল্যাব তৈরি করেছিলেন। থ্যালিয়ামের শিশিটাও সম্ভবত ঐ ল্যাবেই ছিল।

যা সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তাতে অসিত চ্যাটার্জীর আজীবন কারাবাস বা ফাঁসি অবধারিত! ভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে বাঁচায়। সে কথা নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ফেরার হয়েছেন। কিন্তু কতদিনই বা পালিয়ে বাঁচবেন! ধরা তো তাকে পড়তেই হবে। ততদিন পুপুর উপরে একটু বেশি নজর রাখা জরুরী।

এসব ভাবতে ভাবতেই সে কমলিনী অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে। ফোর বাই এ নম্বরের ফ্ল্যাটটা অসিত-দময়ন্তীর ফ্ল্যাট। তার উল্টোদিকের ফোর বাই বি নম্বর ফ্ল্যাটটা পাপড়ি গুপ্তর।

ডোরবেল বাজাতেই এক জগদ্দল মোটা সোটা ফর্সা চেহারার মহিলা দরজা খুললেন। মাথায় শাওয়ার ক্যাপ পরা। সম্ভবত শ্যাম্পু করেছেন।

–‘মিসেস পাপড়ি গুপ্ত?’

—‘আমিই’। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বলেন—'আমার কিছু চাই না। সব প্রোডাক্টই ঘরে আছে। নতুন কিছুর দরকার নেই।

মহিলা তাকে সেলসম্যান ভেবেছেন। সে তার আইকার্ডটা তুলে ধরল।

–‘ও’! তিনি সবিস্ময়ে বললেন—‘আপনি সি আই ডি অফিসার!

–‘দু মিনিট কথা বলতে পারি?”

–‘নিশ্চয়ই। আসুন...আসুন...'।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের সোফায় তাকে সসম্মানে বসিয়ে বলেন তিনি—‘আপনি কিছু নেবেন? চা বা কফি? অবশ্য আজকাল আবার শরবৎ বা কোলড্রিঙ্ক খাওয়ার যুগ। চা বা কফি...

—'নো থ্যাঙ্কস্'। চা, , কফি ছেড়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসে অর্নব-‘আপনি দময়ন্তী সেনকে কতদিন চেনেন?’

পাপড়ি বললেন—'যখন থেকে ভদ্রমহিলা তার ছেলেকে নিয়ে এখানে থাকতে শুরু করলেন তখন থেকেই চিনি। তখন উনি সদ্যবিধবা হয়েছেন। সাথে পুপু। বোঝেনই তো, একজন একা মহিলার পক্ষে শুধু একটা বাচ্চা নিয়ে থাকাটা কত বড় সমস্যা!'

অর্নব মাথা নেড়ে জানায় যে সে বুঝেছে।

–'তাই উনি সবসময় আমার উপর ডিপেন্ড করতেন। বলতেন—পাপড়ি তুমি কি সুন্দর সিস্টেমেটিক ভাবে কাজ করো। তোমার ফার্ণিচারগুলো কি আপ টু ডেট আর ফ্যাশনেব্‌ল্! তোমার কি উপস্থিত বুদ্ধি! চট করে সব প্রবলেমের সলিউশন করে ফেলো.....'।

আরও কিছুক্ষণ সেই একঘেয়ে প্রশস্তি শুনে গেল অর্নব। উনি কি নার্সিসিজমে ভুগছেন? সে অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছিল। ভদ্রমহিলা এখন তার নিজের মোজা-সোয়েটার বোনার কারিগরী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। অর্নবের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। কখন থামবেন এই মহিলা!

অবশেষে হয়তো নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে পেটাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন পাপড়ি। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেন—'হ্যাঁ, আপনি কি যেন জানতে চাইছিলেন?'

হাঁফ ছেড়ে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আসে অর্নব।

-'দময়ন্তীদেবীর কোনও আত্মীয়কে এ বাড়িতে আসতে দেখেছেন? বা তাদের সম্পর্কে শুনেছেন কখনও?'

পাপড়ি হাসলেন—'থাকলে তো দেখবো! কেউ কোনদিন এখানে আসেনি। দময়ন্তী নিজের পরিবারের কথা তেমন বলতেন না। শুধু এক খুড়তুতো ভাইয়ের কথা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন। আমার এক দাদা ফিল্ম টিল্ম করে কিনা! কতবার আমায় বলেছে অভিনয় করতে। 'দেবী চৌধুরানী'র রিমেক করছে। কতবার আমায় বলেছে মেইন রোলটা করার জন্য'।

সে প্রকান্ড একটা বিষম খেল। কমপক্ষে নব্বই কেজি ওজনের দেবী চৌধুরাণী! অর্নব দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় স্বর্গে বঙ্কিমবাবুর মাথা থেকে পাগড়িটা খসে পড়ল!

নিজের চেহারার প্রশংসা করতে করতে অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে এবার নিজেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বললেন—' —'কি যেন বলছিলাম?

সে ভয়ে ভয়ে বলে—দময়ন্তী দেবীর খুড়তুতো ভাই.....!'

—'হ্যাঁ, ওঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের কথা একবার শুনেছিলাম। ছেলেটি অনাথ ছিল। ওঁর সাথেই একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। দময়ন্তীর নিজের ভাইয়ের মতই ছিল। সে নাকি আবার অভিনয়ও করত। একটা দুটো ফিল্মে অভিনয়ও করেছে। তবে সেগুলো সবই থার্ডগ্রেডের ফিল্ম। বিয়ের পরে তার সাথে আর যোগাযোগ ছিল না'।

–'কেমন দেখতে ছিল তা বলেছিলেন?'

ভদ্রমহিলা একটু মনে করার চেষ্টা করেন—'হ্যাঁ, খুব হ্যান্ডসাম চেহারা ছিল ছেলেটির। দময়ন্তী বলেছিলেন—ছ'ফুটের উপর লম্বা, ওয়েলবিল্ট ফিজিক ছিল তার। কিন্তু কপালদোষে চান্স পাচ্ছিল না। আমি বলেছিলাম যে এমন হ্যান্ডসাম ছেলের তো হিরোর রোল পাওয়া উচিৎ। আমার দাদা অনেক ফিল্ম তৈরি করে...'।

আবার 'দাদা' প্রসঙ্গ উঠতে চলেছে দেখে অর্নব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—'ছেলেটি কোন কোন ফিল্ম করেছিল তা জানেন?'

–'না, সব তো জানি না!' তিনি বললেন—' তবে একবার আমি বারবার ইনসিস্ট করায় একটা ফিল্মের নাম করেছিলেন। বাঘ বাহাদুরের কেরামতি। আমি ফিল্মের নামটা কস্মিনকালেও শুনিনি'।

অর্ণবও এই ফিল্মের নাম জীবনে শোনেনি।

–'দময়ন্তী সেন আর অসিত চ্যাটার্জীর রিলেশনশিপ কেমন ছিল?'

—মোটেই সুবিধের ছিল না'। পাপড়ি বিরক্তিমিশ্রিত মুখভঙ্গী করেছেন—'সবসময় খিটপিট খিটপিট লেগেই থাকত। বিজ্ঞানী হলে যা হয় আর কি! নাকে সবসময় টেলিস্কোপ লাগিয়েই রেখেছে।

সেরেছে! ভদ্রমহিলা টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপ গুলিয়ে ফেলেছেন।

সে মৃদু গলায় বলল—'মাইক্রোস্কোপ!'

—'ঐ একই হল। সর্বক্ষণ নাকে মাইক্রোস্কোপ। নাওয়া খাওয়ার হুঁশ নেই। কখনও দুপুর দুটোয় ব্রেকফাস্টের কথা মনে পড়ে, আবার কখনও ভোর চারটেতে ডিনার! পরের দিকে তো দময়ন্তী আর ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষাই করতেন না। নিজেরা নিজেদের মত খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। অবশ্য কুক্কু আবার বাপের খুব ন্যাওটা ছিল। সে বাবার জন্য অপেক্ষা করত। ল্যাবের ভিতরে ঢুকে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিত। আলাভোলা বাপকে ল্যাব থেকে টেনে বের করে এনে ডিনার বা লাঞ্চের কথা মনে করিয়ে দিত সে'।

'আলাভোলা' শব্দটা শুনে অর্নবের ভুরু কুঁচকে যায়। অসিত চ্যাটার্জী 'আলাভোলা' লোক ছিলেন!

–'একদম ন্যালাখ্যাপা লোক মশাই! এক নম্বরের ক্যাবলাকান্ত!' মহিলার মুখ থেকে পপকর্ণ বর্ষিত হতে শুরু করে—' দেখেননি কখনও? কাস্টডিতেই আছে তো! দাঁত মাজতে ভুলে যায়, বুকের বোতাম একদিনও আটকায় না! শুধু একটা ছেঁড়া, কেমিক্যালের উৎকট গন্ধওয়ালা ল্যাবকোট পরেই বোধহয় একবছর কাটাতে পারে! সপ্তাহে একবারও স্নান করে কিনা সন্দেহ!... বিচিত্র লোক! কুক্কুর মা লোকটাকে ডিভোর্স দিয়ে বেঁচেছে। দময়ন্তী ভালো

মেয়ে ছিল বলে নিজেই খুন হয়ে গেল। ওর জায়গায় আমি থাকলে লোকটাকে আগেই খুন করতাম! অমন লোকের সাথে থাকা যায়—আপনিই বলুন?'

সে ভেবে পেল না যে কি বলবে! অগত্যা উল্লুকের মত বত্রিশ পাটি প্রদর্শন! আর কথা না বাড়িয়ে দু একটা রুটিন মাফিক প্রশ্ন করল। পাপড়ি নিজের বয়ানে যা বলেছেন, সেই কথাগুলোই আবার বললেন। অসিত চ্যাটার্জী একবার চিৎকার করে স্ত্রীকে বলেছিলেন 'খুন করে ফেলবো...একদম খুন করে ফেলবো...', আর মৃত্যুর দিন বারান্দার জানলা থেকে থ্যালিয়ামের শিশিটা নীচে ফেলে দিয়েছিলেন তিনিই।

জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ওঠার আগে শুধু একটা কাজ করল অর্নব। ভদ্রমহিলার দিকে খুব গম্ভীর মুখ করে তাকিয়ে ভারি কন্ঠস্বরে বলল— এখন থেকে একটু সাবধানে থাকবেন ম্যাম'।

—'কেন?' পাপড়ি আশ্চর্য হয়ে জানতে চান।

–'আপনি অসিত চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। আপনার কিছু হয়ে গেলে বিপদ!

মহিলার মুখ হাঁ! সে বুঝতে পারল, এই কথাগুলোতেই পাপড়ির ঘাম ছুটে গেছে। তবু তাকে আরও একটু ভয় দেখানোর লোভ সামলাতে পারল না অর্নব।

–'আপনাকে একটা খবর দিয়ে যাই'। তার মুখ সিরিয়াস— অসিত চ্যাটার্জী পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে গেছেন। যে একবার খুন করেছে, তার পক্ষে দ্বিতীয় খুনটা করা খুব কঠিন নয়। আর যেহেতু আপনিই তার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী...সুতরাং, বুঝতেই পারছেন তো!' বলতে বলতেই তার মুখে স্মিত একটা হাসি ভেসে ওঠে। একটু থেমে বলে—ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম যে দময়ন্তীর জায়গায় থাকলে আপনিই তো অসিত চ্যাটার্জীকে খুন করতেন! বেস্ট অব লাক।'

ভদ্রমহিলাকে ফেইন্ট হয়ে পড়ার ঠিক আগের স্টেজে রেখেই গটগট করে চলে গেল অর্নব। মনে মনে সে তখন হাসছে। অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোপুরি নকল করতে না

পারলেও, এই সব উদ্ভট উদ্ভট প্যাঁচ পয়জার তাকে দেখেই শিখেছে সে! আজেবাজে বকে ভেজা ফ্রাই করার বদলাটা মন্দ নেওয়া হয়নি!

–'তোমার হাতে কি হয়েছে পুপু?'

পুপু নতুন কাকুর বিছানায় শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে পাখার ব্লেড দেখছিল। তার ডান হাতে একটা ব্যান্ডেজ। কাল রাতে ছাতের অন্ধকারে কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু নীচে নামানোর সময় সবার চোখে পড়ল যে তার ডানহাতটা অনেকখানি কেটে গেছে। এখন সেখানে ব্যান্ডেজ করা।

–'ডানি না'। পুপু বিষণ্ণ মুখে উত্তর দেয়—'কেটে গেঠে'।

—'কাটল কি করে?' নতুনকাকু তার ব্যান্ডেজের উপর হাত রাখল—'দেখি, কতটা কেটেছে!'

-'আঃ...ব্যাঠা!'

পুপু কাতরশব্দ করে উঠেছে। নতুনকাকুর মুখে চিন্তার ছাপ। সে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

–'সরি, তোমায় ব্যথা দিয়ে ফেললাম'। তার মুখ কৌতুহলী—'কিন্তু কাল কি হয়েছিল বলো তো?'

বাচ্চাটা বিমর্ষমুখে মাথা নাড়ে—'কিট্টু মনে নেই'।

–'তুমি কি ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?'

–'না। ঘুমিয়ে ঠিলাম'।

সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। ছেলেটার কিছুই মনে নেই। সকাল থেকে অনেক কায়দা করেও তার কাছ থেকে কিছু জানা যায়নি। পুপু বারবার একই কথা বলে যাচ্ছে। সে নিজের ঘরেই ঘুমিয়েছিল। কি করে ছাতে পৌঁছল, কি করে তার হাত কাটল—কিছুই জানে না।

কুক্কু নতুনকাকুর কোলে বসে গম্ভীর মুখে ডাক্তারি করছিল। একটা দড়ির মাথায় চোঙ বেঁধে সেটাকে স্টেথোস্কোপ বানিয়েছে সে। সেটা দিয়ে অনেকক্ষণ হার্টবিট পরীক্ষা করল। তারপর ডাক্তারের যতই মাথা নেড়ে বলল—'এবার জিভ। say আ-আ-আ-আ...!'

জিভ পরীক্ষার পর পালস্ রেটও পরীক্ষা হল। সবকিছু দেখে টেখে চেক-আপের পর ডাক্তারবাবু নিদান দিলেন—'হুঁ, অল্প একটু উইকনেস আছে। বেডরেস্ট দরকার'।

তার বলার ভঙ্গিটা অবিকল ডঃ ধৃতিমান হালদারের মত। নতুনকাকুর ভয়াবহ হাসি পেল। ডঃ হালদারের মতই বাঁ হাতে একটা কাগজে হিজিবিজি কাটছে। অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন লিখছে। সে প্রেসক্রিপশনে কি লিখল তা দেখার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার আগেই 'কালো রাক্ষস' দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুনকাকুর দিকে ইশারা করে বলল—'আপনার ফোন আছে'।

--'আমার ফোন?'

–'হ্যাঁ'। কালো রাক্ষসের সংক্ষিপ্ত উত্তর—'আপনার ভাই ফোন করেছে'।

এ বাড়িতে মোট তিনটে ফোন আছে। একটা থাকে ডঃ চৌধুরীর কেবিনে। অন্য দুটো দোতলা আর তিনতলার সিস্টার-ওয়ার্ডবয়দের ঘরে। নতুনকাকু আপাতত কুক্কুর ডাক্তারিতে বিরতি দিয়ে ফোন রিসিভ করতে গেল। পিছন পিছন ওয়ার্ডবয়টিও অনুসরণ করেছে। সে যখন ফোনের রিসিভার তুলে নেয় তখনও 'কালো রাক্ষস' একটু দূরে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

-'হ্যালো'।

ও প্রান্ত থেকে অর্নবের আওয়াজ এল—'স্যার, অর্নব বলছি'।

সে গলা যথাসম্ভব নামিয়ে বলে—'পিছনে কালো রাক্ষস! খুব বেশি জোরে কথা বলা যাবে না'।

—‘ওকে স্যার। আমি যা যা জেনেছি সেগুলো আগে বলে নিই'।

অর্নব দময়ন্তী সেন আর অসিত চ্যাটার্জী সম্পর্কে যা যা জেনেছিল তা বলে গেল। এমনকি পাপড়ি গুপ্তর প্রত্যেকটা কথা কোট-আনকোট হুবহু বলল সে। অসিত চ্যাটার্জী ফেরার হয়েছেন শুনে নতুনকাকুর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করে —'এখনই ফেরার হতে হল লোকটাকে!’

—‘ডঃ সেনগুপ্তর রেকর্ড দুর্দান্ত। সিম্পলি জিনিয়াস স্যার। ওঁর সম্পর্কে কোনও নেগেটিভ মন্তব্য একজনের কাছ থেকেও পেলাম না। অসম্ভব ঠান্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। ডঃ চৌধুরীর তবু একটা বদনাম আছে। রেগে গেলে ভদ্রলোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্তকে রাগতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। ওঁকে লোকে ডাক্তার কম, দেবতা বলেই বেশি মানে... ইনফ্যাক্ট এখনও!

—'বেশ, নেক্সট?’

—‘ডঃ চৌধুরীর রেকর্ডও ভালো। একদম সাফসুতরো লোক'।

—'নেক্সট?'

—‘ডঃ হালদারও মোটামুটি ঠিকঠাক। কিন্তু ওনার সম্পর্কে বাজারে একটা অদ্ভুত খবর আছে'। অর্নব একটু থেমে বলে—— এই অ্যাসাইলামে আসার আগে উনি বিদেশের একটা ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে ছিলেন। সেখানে হঠাৎ ওঁর একটি পেশেন্ট ড্রাগের ওভারডোজে মারা যায়। কর্তৃপক্ষ সমস্ত মেডিসিন চেক করতে গিয়ে দেখে কয়েকটা ওষুধের বদলে তার জায়গায় রীতিমত কড়া ড্রাগ রাখা আছে! যে ওষুধগুলো বদলে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ডঃ হালদারের প্রেসক্রাইব করা। ওনার প্রেসক্রাইবড্ মেডিসিন বদলে গিয়ে তার জায়গায় ড্রাগ কি করে এল, এর কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি তিনি। এরপরই ডঃ হালদার বিদেশের পাট চুকিয়ে এখানে চলে আসেন।

নতুনকাকুর চোখ চকচক করে ওঠে—‘গ্রেট ওয়ার্ক। এক্সেলেন্ট। আরও দুটো কাজ করো। তাহলেই তোমার কাজ শেষ'।

-'বলুন স্যার'।

— 'বাঘ বাহাদুরের কেরামতি’ বলে কোনও ফিল্ম কখনও রিলিজ হয়নি। আমি মোটামুটি ফিল্মের খবর একটু আধটু রাখি'। সে হাসল—‘দময়ন্তী মিথ্যে কথা বলেছেন। কিন্তু ‘বাঘ বাহাদুর’ বলে একটা বিখ্যাত ফিল্ম আছে। আরেকটা ফ্লপ ফিল্ম সম্ভবত দুহাজার পাঁচ বা ছয়ে রিলিজ করেছিল। এগজ্যাক্ট নামটা মনে নেই। কিন্তু হাল্কা ভাবে মনে পড়ছে যে সেই ফিল্মের নামের শেষে ‘কেরামতি’ শব্দটা আছে। সম্ভবত ঐটাই সেই ফিল্ম যেটাতে দময়ন্তীর কাজিন ব্রাদার অভিনয় করেছিল। উনি মিথ্যে বলার জন্যই দুটো ফিল্মের নাম মিক্স করেছেন। তুমি টালিগঞ্জ পাড়ায় গিয়ে প্রথমে সেই ফিল্মটাই খুঁজে বের করো। দুহাজার পাঁচ-ছয় সালে রিলিজড়, শেষে 'কেরামতি' শব্দটা আছে এমন নামওয়ালা, ফ্লপ ফিল্ম খুব বেশি নেই নিশ্চয়ই। ইনফ্যাক্ট, একাধিক থাকার সম্ভাবনা খুব কম। আর সেই ফিল্মে বড়জোর পাঁচফুট লম্বা বা তার চেয়েও কম হাইটের কোনও অভিনেতা ছিল কিনা সেই তথ্যটা খুঁজে বের করো।

—‘কিন্তু...’অর্নব আমতা আমতা করে বলে—‘দময়ন্তীর কাজিন ব্রাদার তো ছ'ফুটের উপর লম্বা...

—জানি। আপাতত তাকে বাদ দাও। আমার মনে হয় ফিল্মটা মোস্ট প্রব্যালি দুহাজার পাঁচে রিলিজ করেছিল। আর তার পাঁচফুটি অভিনেতার খোঁজটাও দরকার'।

অর্নব বুঝে পায় না স্যার হঠাৎ ঐ একটি বিশেষ ফিল্মের পেছনেই পড়েছেন কেন?

–'তোমার কথামত ও বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী, উনিশশো নিরানব্বই সালে পুপুর জন্ম। তার মানে তার আগেই তপন সেনের সাথে দময়ন্তীর বিয়ে হয়। দময়ন্তীর নিজের কথা ধরে নিলে মেনে নিতে হয় যে, প্রথম বিয়ের পর আর খুড়তুতো ভাইয়ের সাথে তার কোনও যোগাযোগ ছিল না। অথচ দু হাজার পাঁচে রিলিজ করা তার কাজিন ব্রাদার অভিনীত ফিল্মটার কথা উনি জানেন! হিট ফিল্ম হলে তবু বোঝা যেত। কিন্তু ওটা চূড়ান্ত ফ্লপ ছবি! ভদ্রমহিলা ঐ ফিল্ম দেখতে টিকিট কেটে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে জানার একটাই সোর্স থাকতে পারে। তার কাজিন ব্রাদার স্বয়ং'।

সে এতক্ষণে বোঝে—'তার মানে দময়ন্তী মিথ্যে বলেছিলেন। কাজিন ব্রাদারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল!'

–'অন্তত দুহাজার পাঁচ-ছয় অবধিও ছিল'। নতুন কাকু মিটিমিটি হাসে—'আমার বিশ্বাস পুপুর অবর্তমানে ঐ কাজিন ব্রাদারই দময়ন্তীর প্রপার্টির দাবিদার এবং অসধারণ অভিনেতা।

-ওকে স্যার'।

–'আর লাস্ট কাজ, পবিত্রকে ফোন করে বলো যে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের চক্করে না পড়ে, প্রথমে অসিত চ্যাটার্জীর খুব কাছের বিশ্বস্ত বিজ্ঞানী বন্ধুদের লিস্ট তৈরি করতে। তার মধ্যে বড়জোর একটি বা দুটি এমন প্রভাবশালী লোক পাওয়া যাবে যাঁর বা যাঁদের বাড়িতেই প্রাইভেট ল্যাব আছে। ওকে বলো সেই নির্দিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিটির ল্যাবরেটরিটা ভালো করে খুঁজে দেখতে'। সে মুচকি হাসে—— যে লোক দাঁত মাজে না, বোতাম আটকাতে ভুলে যায়, একটা ল্যাবকোট পরে বছরখানেক কাটিয়ে দিতে পারে, খাওয়া ঘুম নিয়ে যার কোনও মাথাব্যথা নেই, সে লোক টাকা ছাড়াও দিনের পর দিন ভিখিরির মত কাটিয়ে দিতে পারে। না খেয়ে শুকিয়ে মরতেও পারে। কিন্তু সেই লোকটাই যখন জাতে সায়েন্টিস্ট হয় তখন পৃথিবী উলটে গেলেও সে ল্যাব ছাড়া থাকতে পারবে না! পেটে ভাত-মাথার উপর ছাত না থাকলেও ল্যাবরেটরি তার চাই-ই। পবিত্রকে বলো এইভাবে খুঁজে দেখতে। বারো ঘন্টাও লাগবে না। ভদ্রলোক ধরা পড়ে যাবেন'।

—'গট ইট স্যার'।

—'গুড। এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক এগেইন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ মিটিয়ে ফিরে এসো। ছাড়ছি।

লাইন কেটে গেল। কালো রাক্ষস একটু দূরে দাঁড়িয়ে সন্দেহতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে। পেশেন্ট এত নীচু স্বরে কথা বলছিল যে শেষের 'ছাড়ছি' শব্দটা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি। নিজের ভাইয়ের সাথে ফিসফিস করে কি এত কথা! তার সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু ঘাড়ের উপর পড়ে অন্যের কথাবার্তা শোনাটাও ভদ্রতা নয়!

–'হয়েছে? চলুন'।

কালো রাক্ষসের দিকে ট্যারা চোখ করে তাকিয়ে হাসল সে। ব্যাটা কথা শোনার তালে ছিল। কিন্তু ফিসফিস করে কথা বলার দরুণ কিছুই শুনতে পায়নি। সেজন্যই এমন রাগ রাগ ভাব! বাবুর গোঁসা হয়েছে!

খুশি মনে শিস দিতে দিতে ঘরে ফিরছিল সে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই যা দেখল তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! পুপু তখনও বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর কুক্কু ডাক্তারি ছেড়ে তার ঘর লন্ডভন্ড করে কি যেন খুঁজছে! সে চিন্তিত মুখে জিনিসপত্র ঘাঁটছে আর মাথা নাড়ছে!

–'একি!' নতুনকাকু অবাক হয়ে বলে—"কি করছ?'

–'চুপ!' কুক্কু তার দিকে তাকিয়েছে। তার মুখ গম্ভীর—'তোমার ঘর সার্চ করছি। আমি এখন পুলিশ'।

–'সার্চ করছ!' তার যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়—'কি খুঁজছ?'

—'আঃ'! কুক্কু মুখে রাজ্যের বিরক্তি জমিয়েছে—'তুমি চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ো। আমি তোমার ঘর সার্চ করবো।

নতুনকাকুর মুখে কথা জোগায় না! সে বিছানায় শুয়ে হাঁ করে দেখে, কুক্কু বিছানার নীচে, টেবিলের তলায়, তার জিনিসপত্রের মধ্যে, জামার বুকপকেটে, ওষুধের বাক্সে, ব্যাগের মধ্যে তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে! গম্ভীর মুখে সবই নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু বাঁ হাতে!

অনেকদিন যে কথাটা বলেনি, বিস্ময়ে সেই শব্দটাই ফের উঠে এল তার মুখে। কুক্কুর কান্ড দেখতে দেখতেই সে বিড়বিড় করে বলল—'স্ট্রেঞ্জ!. এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ!'

১৭

ডঃ চৌধুরী গম্ভীর মুখে তার কেবিনে বসেছিলেন। তার চিন্তার শেষ নেই। গত কয়েকদিন ধরে রাতে ঘুম হচ্ছে না। পরপর দুটো খুন হয়ে গেল এখানে। তার উপর সব অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড ঘটছে! কখনও মেইন সুইচ অফ হয়ে যায়, কখনও আবার যেখানে সেখানে আততায়ীর আবির্ভাব ঘটে! আর এখন তো ডাক্তার- সিস্টার- ওয়ার্ডবয়রাও ভয়ে পালাই-পালাই করছে। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না!

তার উপর আবার ডঃ হালদার সকাল সকাল এসেই খবর দিলেন, কাল গভীর রাতে প্যাথোলজি ল্যাবে কেউ ঢুকেছিল! মাইক্রোস্কোপ, টেস্টটিউব সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ সেগুলোকে নাড়াচাড়া করেছে।

—'আরও কিছু দুঃসংবাদ থাকলে এখনই দিয়ে দাও হালদার। একসাথেই হার্টফেল করি। এভাবে চোখের সামনে অ্যাসাইলামটার সর্বনাশ আর দেখতে পারছি না!'

মনোহর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হয় ডঃ হালদারের। এখানে যা সব কান্ডকারখানা শুরু হয়েছে তাতে অ্যাসাইলামটা সত্যিই বন্ধ করতে না হয়! ডঃ চৌধুরীর তিলতিল করে গড়ে তোলা এই 'মেন্টাল হেল্প অ্যাসাইলাম' শুধু একটা অ্যাসাইলামই নয়, বরং তার স্বপ্ন। সেটা এভাবে বরবাদ হয়ে যাবে—ভাবা যায় না!

–'কখন বুঝতে পারলে যে প্যাথোলজি ল্যাবে কেউ ঢুকেছিল?'

–'আজ সকালে স্যার'। ডঃ হালদার জানালেন—'দশটা নাগাদ একটা ব্লাডটেস্ট করতে গিয়ে প্যাথোলজিস্ট দেখে যে ল্যাবরেটরির মাইক্রোস্কোপটা নিজের জায়গায় নেই! এমনকি সমস্ত অ্যাপারেটাসই একটু এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে। ক্লোরোফর্মের শিশিটাও কেউ ধরেছে'।

–'বাঃ, এটাই বাকি ছিল'।

ডঃ চৌধুরীর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আততায়ী কোথা থেকে ক্লোরোফর্ম নিয়ে পুপুকে অজ্ঞান করেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু মাইক্রোস্কোপ নিয়ে সে কি করছিল!

–'বাদ দাও। যা খুশি হোক্'। ডঃ চৌধুরী নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছেন—' পেশেন্টদের স্টেটাস বলো। স্যারের স্টেটাস কি?

ডঃ হালদারের মুখে অল্প একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে— ওঁকে আজ একটা 'সাজেশন' দিয়েছি। সাকসেসফুল হয়েছে'।

--'গুড। আর পজেজড কেসগুলো...?'

দুই ডাক্তার পেশেন্টদের বর্তমান অবস্থা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনায় ডুবে গেলেন। প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে তাদের কথাবার্তা চলল। কাকে কোন মেডিসিন দিতে হবে, কোন থেরাপি প্রয়োজন ইত্যাদি নানা আলোচনা।

প্রয়োজনীয় কথা সেরে আন্দাজ বেলা তিনটে নাগাদ চলে গেলেন ডঃ হালদার। ডঃ চৌধুরী একবার ঘড়ি দেখলেন। এখন তার লাঞ্চ টাইম। পেশেন্টদের অবশ্য দুপুর বারোটাতেই লাঞ্চ সার্ভ করে দেওয়া হয়। তাদের রুটিনের বিশেষ হেরফের নেই। কিন্তু ডাক্তারদের রুটিন বস্তুটা থাকলে চলে না।

তার প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল। তবু তখনই খেতে গেলেন না। বরং ড্রয়ার থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে এনেছেন। গোটা কয়েক বিস্কুট আর জল খেয়ে রাউন্ডে বেরোলেন। তার চিকিৎসাধীন রোগীদের একবার দেখে নিয়ে সটান চলে গেলেন দোতলায়। গটগট করে গিয়ে ঢুকলেন সোজা ওয়ার্ডবয়-সিস্টারদের ঘরে!

তার মনে একটা অদ্ভুত সন্দেহ কাজ করছিল। কাল রাতে গোটা দোতলাটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মেইন সুইচ অফ করার কারিকুরিতে বিশেষ নতুনত্ব কিছু নেই। যে কেউ সেটা করতে পারে। কিন্তু ওয়ার্ডবয়- সিস্টার- ডাক্তারদের একটা টর্চও জ্বলল না কেন? অন্যদিকে হ্যালুসিনেশন আর সাইকাসথেনিয়ার দুই পেশেন্ট জোর দিয়ে বলেছে যে একটা টর্চের জোরালো আলো তারা দেখেছে। পেশেন্ট দুজন মিথ্যে বলেনি। তবে সেই টর্চের আলোটা

এলো কোথা দিয়ে?

ডঃ চৌধুরীর জেদ চেপে গিয়েছিল। এত সহজে অ্যাসাইলামের সর্বনাশ হতে দেবেন না তিনি। তার জন্য যদি তাকে ডাক্তারি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, তাও সই।

ওয়ার্ডবয়- সিস্টাররা তখন খেতে বসেছিল। তাকে দেখেই তটস্থ হয়ে খাবার দাবার ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনরকম ভণিতা ছাড়াই বললেন তিনি—'তোমাদের টর্চগুলো কোথায়?'

–'টর্চ তো লকারেই থাকে স্যার'। একজন ওয়ার্ডবয় ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়। স্যার হঠাৎ টর্চের খোঁজ করছেন কেন?

—'কোন লকারে?

ওয়ার্ডবয়টি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে আসছিল। তাকে হাত তুলে থামালেন ডঃ চৌধুরী —'আসার দরকার নেই। শুধু লকারটা দেখিয়ে দাও'।

সে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লকারটা দেখায়। ডঃ চৌধুরী লকার খুলে টর্চগুলো বের করে আনেন। বেশ প্রমাণ সাইজের টর্চ। মোট বারোটা আছে।

–'নতুন ব্যাটারি কবে ভরা হয়েছে?'

-'পরশুই'...

তিনি এক এক করে টর্চগুলো ঝাঁকিয়ে দেখছেন। কোনও টর্চই হাল্কা লাগছে না। অর্থাৎ ব্যাটারিগুলো সবই ভরা আছে।

টর্চে পরশুই নতুন ব্যাটারি ভরা হয়েছে! ব্যাটারিগুলোও যথাস্থানে! তবে জ্বলল না কেন?

তার সন্দেহ প্রগাঢ় হয়। তিনি একটা টর্চ খুলে ব্যাটারি চেক করেন। দুটো ব্যাটারির অবস্থান দেখামাত্রই সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যায়।

—'ওঃ, এই ব্যাপার!' ডঃ চৌধুরীর মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে ওঠে—'ব্যাটারির পজিশনই উলটো! দুটো পজিটিভ সাইডই একদিকে। টর্চ জ্বলবে কি করে?'

তিনি সবকটা টর্চই চেক করেন। বারোটা টর্চেরই এক ইতিহাস!

–কে করেছে?' ডাক্তারবাবু টর্চগুলো সরিয়ে রেখে এবার সিস্টার-ওয়ার্ডবয়দের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালেন। এমনিতে তাকে সচরাচর রাগতে দেখা যায় না। কিন্তু যখন রেগে যান তখন যেন তার ভিতরের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা দপ করে জ্বলে ওঠে! সেই রুদ্রমূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন লোক নেই!

–'আমি জানতে চাই এটা কে করেছে?' ডঃ চৌধুরীর চোখে আগুন জ্বলছে—'কোনও পেশেন্টের কাজ এটা হতেই পারে না। কোনও পেশেন্টের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে টর্চগুলো কোথায় থাকে! তারা এ ও জানে না যে মোমবাতি কোথায় রাখা হয়। জানো শুধু তোমরা'।

–'স্যার...আমরা কিছু...' এক সিস্টার কিছু বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই গর্জন করে উঠলেন তিনি।

—'চো—প! হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অ্যাম আই আ ফুল? আমাকে যা খুশি তাই বোঝাবে তোমরা!' অসম্ভব রাগে যথারীতি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন ডঃ মনোহর চৌধুরী— এ ঘরে বাইরের একটা লোক বা কোনও পেশেন্ট এসে দিব্যি লকার খুলে বারোটা টর্চের ব্যাটারির পজিশন ধরে ধরে চেঞ্জ করে দিয়েছে, অথচ তোমরা কেউ কিছু জানতে পারলে না! অসম্ভব! হতেই পারে না! আমি বিশ্বাস করিনা!'

ডাক্তারবাবুর রাগের সামনে সবার মাথা নীচু হয়ে গেছে। সবাই নীরব!

–'চুপ করে থেকো না!' তার মুখ রক্তাভ—— এ কাজ তোমাদের মধ্যেই কেউ করেছে। আমি জানতে চাই কে সে? এটা কার কাজ? উত্তর দাও'।

সবাই যথারীতি নিশ্চুপ। কেউ মুখ তুলে তাকানোর সাহসই পাচ্ছে না।

-'কাম্ অন্। আনসার মি।'

পাগলের মত চিৎকার করে উঠেছেন ডঃ চৌধুরী—'কে করেছে এটা? কে...?'

—'আমি'।

খুব শান্ত ও উষ্ণ পুরুষালি গলায় উত্তর এল। তিনি বিস্ফারিত লাল চোখে সামনে দাঁড়ানো ওয়ার্ডবয়দের দিকে তাকালেন। সবার মুখ নীচু। একদম স্থির। কেউ সামান্য নড়ছেও না।

উত্তরটা কে দিল বোঝার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোক। তার আগেই কানের কাছে সেই ব্যারিটোন ভলিউম—'আমি আপনার পিছনে ডক্টর'।

সবিস্ময়ে পিছনে ফিরলেন তিনি। তার পিছনে চমৎকার গ্রীক ভাস্কর্যের মত সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘ চেহারার লোক। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, অথচ অনিন্দ্যসুন্দর মুখে একটা মিষ্টি ছেলেমানুষী হাসি। এ সেই দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্ট। বাচ্চাদের 'নতুন কাকু'।

—'ই-উ!' ডঃ চৌধুরী অসম্ভব বিস্ময় আর প্রচন্ড রাগ মিশিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—'হাউ ডেয়ার ইউ! এ সব কাজ তোমার! তোমার এতবড় সাহস যে.....!

–'নার্সিসিজ্ ভালো নয়'। ছেলেটি নম্রভাবে 'বাও' করল—'কিন্তু নিজের সাহসের প্রশংসা শুনতে আজও আমার খারাপ লাগে না'।

রাগে, বিস্ময়ে মুখে কথা জোগায় না! কি বলবেন ভেবে পেলেন না! এই কি সেই খুনী! অথচ কি অদ্ভুত শান্ত!

–'রাগ খুব খারাপ জিনিস স্যার'। সে আস্তে আস্তে বলে—'আপনার সাথে আমার একটু জরুরী কথা আছে। কিন্তু যে মুডে আছেন তাতে জরুরী কথাটাও বোধহয় সারা অ্যাসাইলাম শুনতে পাবে! যেভাবে একটু আগেই আপনার কন্ঠস্বর তিনতলা অবধি পৌঁছচ্ছিল, তাতে এইটুকু বলতে পারি—এইমুহূর্তেই মুডটা একটু চেঞ্জ করার জরুরী। বেটার, আমরা আপনার কেবিনে বসে চা খেতে খেতে একটু গল্প করি—তাই না?'।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল ডঃ চৌধুরীর। কিন্তু কি একটা অদ্ভুত শক্তি আছে ছেলেটির মধ্যে! তার কথা বলার নম্র ভঙ্গি ও শান্ত ছেলেমানুষী হাসি ডঃ চৌধুরীকে স্তম্ভিত করে দেয়। তেড়েফুঁড়ে উঠতে গিয়েও পারেন না। বরং স্খলিত গলায় বলেন –'কে তুমি?'

–'ভ্যালিড কোয়েশ্চেন'। ছেলেটি হাসল—'দরকার পড়লে লম্বা লম্বা কয়েকটা শ্বাস টেনে নিন। ব্লাড প্রেশার কমলে আমরা আপনার কেবিনে, একটু নিভৃতে বসে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করব। আমার পরিচয়টাও নাহয় তখনই দেওয়া যাবে। ওকে? নাউ, প্লিজ কাম ডাউন......'।

-'অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়! আই জি, আই পি এস, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট!'

ডঃ মনোহর চৌধুরী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না! বারবার আইডেন্টিটি কার্ডটা সবিস্ময়ে দেখছেন। তার কেবিনে সামনের চেয়ারে বসে মিটমিট করে হাসছে দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্ট! এখন তাকে দেখতে আরও চমৎকার লাগছে। বাদামী চোখদুটোয় তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও সপ্রতিভ চাউনি।

-'তুমি...সরি...আপনি একজন আই পি এস অফিসার...?' তার তখনও বিশ্বাস হয় না! এই সাতাশ-আঠাশ বছরের বাচ্চা ছেলেটা একজন জাঁদরেল সি আই ডি অফিসার! এরকম পুলিশও হয়!

–'দুর্ভাগ্যক্রমে!' মুচকি হাসিটা তখনও তার ঠোঁটে লেগে আছে—'অ্যাসাইলাম মার্ডার কেসের ভার আমাকেই দেওয়া হয়েছে।

ডঃ চৌধুরী হতবিহ্বল হয়ে বসে থাকেন। আইডেন্টিটি কার্ডটা তার হাতেই ধরা। তবু যেন বিশ্বাস হয় না। তার চোখে এখনও ভাসছে আগের অফিসারটির ছবি! তার সাথে এই ছেলেটির কোনও মিলই নেই! একদম উলটো!

–'কিন্তু আপনি তো অন্যভাবেও তদন্ত করতে পারতেন!...এইভাবে..!'

—'পারতাম'। অধিরাজের চোখে আত্মবিশ্বাস—'কিন্তু এডিজি সেন এটাকে একটা সাধারণ মার্ডার কেস হিসাবে দেখেননি। আফটার অল এটা একটা মেন্টাল অ্যাসাইলাম। পুলিশি তদন্তের চাপে অনেক সুস্থ মানুষও মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলে। সেখানে মানসিক রোগীদের উপর পুলিশি উপদ্রব কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার নমুনা তো আপনি দেখেছেনই স্যার'।

ডঃ চৌধুরী চুপ করে গেলেন। সত্যিই নমুনা তিনি নিজেই দেখেছেন।

—'এটা একটা স্পেশ্যাল কেস ছিল'। সে বলল—'অত্যন্ত স্পর্শকাতরও বটে। তাই এডিজি শিশির সেন কোনও চান্স নেননি'।

—'কিন্তু দোতলার সব টর্চ একসাথে বিকল করা, মেইন সুইচ অফ করে দেওয়া—কাল যা যা হয়েছে, সবটাই কি আপনার কাজ! অ্যাসাইলামে যে অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড ঘটছে...'

—'একা আমার নয়'। অধিরাজ রহস্যময় হাসে—'এর উত্তর আপনি রাত বারোটার পরই পেয়ে যাবেন। যা যা প্রশ্ন আপনার মনে আছে সব খোলসা হবে আজই।

—'কিন্তু...' ডঃ চৌধুরী দ্বিধাগ্রস্ত—'আজই কেন?'

-'কারণ আপনার মতন আরেকজনও আমার পরিচয় জেনে ফেলেছেন'। তার মুখে চিন্তার লেশমাত্রও নেই—'আমার ঘর সার্চ করে এই আইডেন্টিটি কার্ডটা তিনি খুঁজে বের করেছেন। সন্দেহ ভদ্রলোকের আগেই ছিল। আজ নিশ্চিত হয়েছেন। সুতরাং এখন আমারও ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র ও অমিতাভ খাসনবিশের রাস্তা ধরার সময় হয়েছে'।

—'কিন্তু সে তো যখন তখনই হতে পারে। রাত বারোটাই কেন?'

—'কারণ রাত বারোটায় শিফট চেঞ্জ হয়। লক্ষ্য করে দেখুন, সব খুনগুলোই রাত বারোটার আশেপাশে হয়েছে। শিফট চেঞ্জ হয়ে সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাকটিভেট হতে প্রায় চল্লিশ সেকেন্ড বা একমিনিট লাগে। একজন ডেসপারেট খুনীর পক্ষে ঐ সময়টাই যথেষ্ট। কিন্তু তার আগে স্কোপ নেই। তাই বারোটার আগে তিনি আসবেন না।

অধিরাজের নিরুত্তাপ কথাগুলো শুনে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় ডঃ চৌধুরীর। কি নিস্পৃহভাবে কথাগুলো বলে গেল লোকটা। অমন দুর্দান্ত একটা খুনী! দু দুটো খুন করেছে এরমধ্যেই। অথচ তার তৃতীয় শিকারের কোনও হেলদোল নেই!

—'তবে তো আপনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়!' উত্তেজিত হয়ে বেল বাজাতে যান তিনি—'এখনই সবাইকে ডেকে কড়া সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি'।

অধিরাজ তার হাত চেপে ধরেছে—'আপনি মাটি করবেন দেখছি স্যার। সিকিউরিটির দরকার নেই। বরং আমি যা বলছি তাই করুন'।

মনোহর চৌধুরী উৎকন্ঠিত—'কিন্তু যদি সে আপনাকে অ্যাটাক করে...?...কোনও মারাত্মক ওয়েপন যদি তার কাছে থাকে? আপনার কাছে নিশ্চয়ই কোনও অস্ত্র নেই। অ্যাসাইলামে তো কোনও অস্ত্র নিয়ে ঢোকা যায় না, আপনার সার্ভিস রিভলবার...'।

—'ঠিকই ধরেছেন। সার্ভিস রিভলবার আমার সঙ্গে নেই'।

-তবে?'

সে ফের হাসছে—'সার্ভিস রিভলবারের চেয়েও বড়ো অস্ত্র আছে। তাছাড়া মেন্টাল অ্যাসাইলামে গোলাগুলির আওয়াজ স্বাস্থ্যকর নয়। এতদিন সব দিক রক্ষা করে এসে, এই শেষমুহূর্তে যদি দুমদাম গুলি চালিয়ে পেশেন্টদের ভয় দেখাই—তবে সেটাই বা কেমন ভদ্রতা!'

ডঃ চৌধুরী একটু চুপ করে থাকেন। অফিসারটির সব কথাই তার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। যদিও মনে মনে স্বীকার করলেন যে এই অফিসারটি ঠিক অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের মত নয়। তাকে পুলিশ কম, মানুষ বলেই বেশি মনে হয়।

—'তাহলে এখন কি করতে বলেন?'

—'ছোট্ট কয়েকটা হেল্প'।

সংক্ষিপ্ত উত্তর।

একটু পরেই ডঃ চৌধুরীর নির্দেশে অ্যাসাইলামের সমস্ত ডাক্তাররা এক এক করে তার কেবিনে এসে ঢুকল। ডঃ হালদার এলেন প্রথমে। অধিরাজ ডঃ চৌধুরীকে তার পরিচয় ফাঁস

করতে বারণ করেছিল। তিনি তার কথামতই বললেন—'হালদার, এই পেশেন্টটির তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

–'আমার সাথে!' ডঃ ধৃতিমান হালদার আকাশ থেকে পড়েন—'কি কথা!'

—'জানি না'। ডঃ চৌধুরী মাথা নাড়লেন—'আমাকে বলছে না। তুমি দেখো।

কথাটা বলেই পূর্বনির্দেশমত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তিনি। ঘরে এখন মুখোমুখি দুশো চারের পেশেন্ট আর ধৃতিমান হালদার।

-'বলো, কি বলবে'। নিরুৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

দুশো চারের পেশেন্টটি নীচু স্বরে বলল—'আমি সব জানি'।

ডঃ হালদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। তার মুখে সতর্কতার ছাপ পড়ল।

–'কি জানো?'

–'যা ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র আর ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ জানতে পেরেছিলেন'।

চমকে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণের জন্য তার বাকশক্তি লোপ পেল।

–'সেটা কি?'

–'এখন নয়'। সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—'আজ রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমার ঘরে আসবেন। তখন বলব'।

-'রাত সাড়ে বারোটায়!এখন বলা যাবে না?'

পেশেন্ট মৃদু হাসল—'না সাড়ে বারোটাতেই বলব'।

-'কেন?'

-'আমার মর্জি'। সে বলে—'তবে আরেকটা মর্জিও আছে। সেটার কথা এখনই বলতে পারি'।

কিছুক্ষণ পরেই ডঃ হালদার কিম্ভুত কিমাকার মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন মনোহর চৌধুরী। তাকে একঝলক দেখেই বুঝতে পারেন যে ভদ্রলোক পুরোপুরি কনফিউজ্‌ড্‌!

এই একই নাটক প্রত্যেক ডাক্তারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে অভিনীত হল। সবাই একইরকম লম্বাটে মুখ নিয়ে চলে গেলে পর আর থাকতে পারলেন না ডঃ চৌধুরী। জিজ্ঞাসা করেই বসলেন—'আমি সিরিয়াসলি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি ঠিক কি করছেন অফিসার?'

–'আপনার বুঝে কাজ নেই'। অধিরাজ বলল—'যাঁর বোঝার তিনি ঠিকই বুঝেছেন। নিজের লোকদের চেনেন না ডক্টর? এরা সব এক একটি রয়টার। ঐ দেখুন...

সে কেবিনের দরজার তলার দিকে নির্দেশ করে। সেখানে কারুর ছায়া এসে পড়েছে! কেউ কান পেতে সব কথা শুনছে!

ডঃ চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। অধিরাজ তার হাত টেনে ধরেছে। ইশারা করে নিরস্ত হতে বলে। গলার স্বর অস্বাভাবিক নীচু করে বলল—'আমিও এটাই চাই। একঘন্টার মধ্যে গোটা অ্যাসাইলাম খবরটা জেনে যাবে। আমাদের ইপ্সিত ব্যক্তিটিও হয়তো এরমধ্যেই জেনে গেছেন। আজ রাত সাড়ে বারোটায় তার ভেক খুলবে জেনে কি আর স্থির থাকতে পারবেন? আসতেই হবে তাকে।

ডঃ চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ওরকম মারাত্মক খুনীর মোকাবিলা কিভাবে করবে এই লোকটা? কোন্‌ সাহসে এভাবে লোভ দেখাচ্ছে! হোক্‌ পুলিশ অফিসার। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র!

—কে বলল নিরস্ত্র?' অধিরাজ হাসছে—'আমার অফিসার লাহিড়ীর মত হাই বাজেটের অসুর মার্কা চেহারা না হলেও গায়ে কিছু কম জোর নেই। প্রথমদিন আপনাকেও উলটে ফেলেছিলাম, মনে আছে?'

খুব মনে আছে ডঃ চৌধুরীর! তার দশাসই চেহারাটাকেও এই লোকটি অতি সহজেই তুলে আছড়ে ফেলেছিল।

অফিসারের গায়ে যে জোর আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু উলটো দিকের ব্যক্তিটির গায়ে জোর কতটা থাকবে সেটা না জানলেও চলে। তার হাতে কি থাকবে সেটাই প্রশ্ন!

-'আপনার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না! তার সাথে বুদ্ধি ও অভিনয়ের প্রশংসাও করতে হয়! কিন্তু এইগুলো কি কোনও অস্ত্রকে ঠেকাতে পারবে?'

—'পারবে না'। অধিরাজ শান্ত গলায় বলে—— আমার অভিনয় আর কি দেখেছেন স্যার! আমার থেকেও বড় অভিনেতা এই অ্যাসাইলাযেই আছেন। ইনফ্যাক্ট অভিনয়ের জন্য তাঁর অস্কার পাওয়া উচিৎ! আপনারা এত কাছ থেকে রোজ দেখেও তাঁকে চিনতে পারেননি। সাহস আর বুদ্ধির ক্যাটাগরিতে তিনি আমারই সমান সমান। ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র'র মাথার খুলি যিনি একঘায়ে ভেঙে দিতে পারেন, কিম্বা ছুরির এক কোপেই অমিতাভ খাসনবিশের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারেন, তাঁর গায়ের জোরটাও ভেবে দেখার মত বিষয়বস্তু'।

-'তবে?'

—'চিন্তা নেই'। সে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে—"তিনি বাইরে থেকে কোনও অস্ত্র আমদানি করতে পারবেন না। আপনার অ্যাসাইলামের ভিতর থেকে তাঁকে অস্ত্র নিতে হবে। আমিও এই অ্যাসাইলাম থেকেই আমার অস্ত্র বেছে নেব। যার ওয়েপন বেশি মারাত্মক সে-ই আজ এখান থেকে বেঁচে ফিরবে। সময় নেই স্যার-ডু অর্ ডাই সিচুয়েশন'।

ডঃ চৌধুরী উৎকন্ঠিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকান। নিতান্তই বাচ্চা ছেলে! অল্প বয়েসেই গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন অফিসার! কিন্তু যৌবনের উদ্যমে ভুল করছেন না তো! মারাত্মক ঝুঁকি নিতে গিয়ে যদি সেটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল প্রমাণিত হয়!

তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন!

১৮

ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত সেদিন রাত আটটা নাগাদ ফিরে এল। তার চেহারা প্রায় ঝোড়ো কাকের মতন হয়েছে। হাতে একগুচ্ছ ফাইল।

সে অ্যাসাইলামে ঢুকতে না ঢুকতেই ওয়ার্ডবয় বিনয় এসে ফিসফিস্ করে বলে—'শুনেছেন স্যার?'

অর্চিষ্মান অবাক হয়। একটু আশঙ্কিতও ছিল। সময় যতই কাছে আসছে ততই যেন বুকের ভিতরে ভয়ের পারদ ক্রমশ চড়ছে। এমনিতেই উত্তেজিত ছিল, তার উপর বিনয়ের এই রহস্যময় হাবভাবে আরও ঘাবড়ে গেল—'কি শুনবো?'

বিনয় তাকে জানায় যে দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্ট দাবি করেছে, যে খবরটা প্রয়াত দুই ডাক্তার, ডঃ মিত্র ও ডঃ খাসনবিশ জানতেন তা নাকি সে জানতে পেরেছে।

–'আপনার কি মনে হয় স্যার? লোকটা সত্যি কথা বলছে? না স্রেফ পাগলামি?

–'কি জানি!' অর্চিষ্মানের কপালে চওড়া ভাঁজ পড়ল—'পাগলামিও হতে পারে। কিন্তু তুমি একথা জানলে কি করে?'

-'খবর হাওয়ায় ভাসে স্যার'।

রহস্যময় হাসি হেসে সে চলে গেল।

তার গমনপথের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অর্চিষ্মান। স্যার একদম ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে ফেলেছেন মার্ডারারকে। আর এ খবরটা চাউর করার দায়িত্ব বিনয় নিয়েছে নাকি! না অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে! ওর মাথার কদমছাঁট চুলের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে কি যেন ভাবে।

অর্চিষ্মান অন্যমনস্ক ভাবে ডঃ চৌধুরীর কেবিনে নিয়মমাফিক হাজিরা দিল। ডঃ চৌধুরীর মুখ কেমন যেন থমথমে। তাকে দেখে বিশেষ কিছু বললেন না।

ডঃ হালদারের মুডও আজকে ভালো নেই। কথায় কথায় স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে খ্যাঁচখ্যাঁচ করছেন। পেশেন্টদের সাথে ভালোভাবে কথাও বলতে পারছেন না। প্রেসক্রিপশন লেখার সময় তার বাঁ হাতটা বেশ কাঁপছে। এমনিতেই তার হাতের লেখা জঘন্য। আজ ভীষণ নার্ভাস থাকার দরুণ প্রেসক্রিপশনটাকে প্রেসক্রিপশন কম, মডার্ণ আর্ট বলেই বেশি মনে হচ্ছে।

এর মধ্যেই দোতলায় সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্টটি চটেছে! ওয়ার্ডবয় নার্সদের বিরক্তিমিশ্রিত মৃদু কণ্ঠে বলছে—'একটা বই পড়তে চেয়েছিলাম। ইংলিশ বই। এটা কি দিয়েছেন? এক লাইনও পড়তে পারছি না!'

অর্চিষ্মান গোলমালের আওয়াজ পেয়ে ভিতরে ঢুকল। সিস্টার- ওয়ার্ডবয়রা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ডঃ দত্তকে দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল!

–'এটা ইংলিশ, না ফ্রেঞ্চ!' পেশেন্টটি বিরক্ত—'কিছু বুঝছি না!'

অর্চিষ্মান তার হাতের বইটার দিকে তাকায়।

–'বইটা ইংলিশই'। সে পেশেন্টের হাতের বইটা সোজা করে দেয়—'তবে আপনি ওটা উলটো করে পড়ার চেষ্টা করছেন'।

পেশেন্টটি সচকিত হয়ে ওঠে।পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল—'সত্যিই আমি একটা অপদার্থ'!

সব মিলিয়ে অ্যাসাইলামের প্রত্যেকটা মানুষই যেন অস্থির। তাদের অশান্ত মনের মধ্যে কি চলছে তা বোঝাই দায়! যেন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত সবাই! 'কি হয়...কি হয়' ভাব!

যে লোকটি এত উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল সে কিন্তু অদ্ভুতরকমের শান্ত। অর্চিষ্মানের মন পড়েছিল দুশো চার নম্ব ঘরে। সুযোগ পেতেই সে গিয়ে হাজির হল সেখানে।

—'আসুন ডাক্তারবাবু। বাড়ির খবর কি?' সহাস্যে জানতে চায় দুশো চারের রোগী—'আপনার বাড়িতে কি আয়লা ঝড় চলছে নাকি! নয়তো আপনাকে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষের মত লাগছে কেন?'

লোকটার স্বভাব আর বদলাল না! এখনও কি খোশমেজাজে আছে! সে ফাইলটা হস্তান্তরিত করে দেয়।

—'দরজা ভেজিয়ে দাও'। রোগী নীচু স্বরে বলেন—'আমি দেখতে চাই না ঐ হতভাগা কালো রাক্ষস দরজা দিয়ে উঁকি মারছে!'

অর্চিষ্মান একবার মুখ বের করে দেখে নেয় করিডোরে কেউ আছে কি না! ডিনারের সময় অতিক্রান্ত। সম্ভবত সিস্টার-ওয়ার্ডবয়রা এখন সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। সুযোগ বুঝে সে দরজা ভিতর থেকে ভেজিয়ে দেয়।

রোগীটি ফাইলের ভিতরের সব কাগজ একের পর এক দেখছে। তার মুখ ভাবলেশহীন। দময়ন্তী ও তপন সেনের বিয়ের ছবিটা চোখ কুঁচকে দেখল। একটু যেন থমকে গেছে।

—'আঁতশকাচ আছে?'

-'আছে স্যার'।

-'দাও তো!'

আতশকাঁচ নিয়ে অনেকক্ষণ ফটোটা দেখল সে। অন্যমনস্ক স্বরে বলে——— মাঘ মাস! বেশ! বেশ!'

হঠাৎ মাঘ মাস এরমধ্যে কোথা দিয়ে এসে পড়ল তা মাথায় ঢোকে না অর্চিষ্মানের! রোগী এবার অন্যান্য কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছে। ডঃ হালদারের রেকর্ড আর ডঃ সেনগুপ্ত সম্পর্কিত নথিপত্র দেখে ফাইলটা সযত্নে রেখে দিল নিজের ব্যাগে।

অর্চিষ্মান কৌতুহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে হাসছে—'নাঃ, মানতেই হবে যে, দময়ন্তীর প্রথম স্বামী, তপন সেন দিল্লীতে থাকলেও খাঁটি বাঙালী। দেখেছ, নিজের বিয়ের দিন কেমন সুন্দর বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙিয়েছেন!'

যা ব্বাবা! এত কিছু দেখার পর শেষে কিনা এই মন্তব্য!

—মাঘের শীত বাঘের গায়!' তার চোখে কৌতুক নেচে ওঠে—'বাঘ বাহাদুরের কেরামতির অরিজিনাল ভার্সানটার খোঁজ পেলে?'

—'হ্যাঁ স্যার'। অর্চিষ্মান বলে—'ফিল্মটার নাম 'বাচ্চুর কেরামতি'। ২০০৫ এ রিলিজ করেছিল। সুপার ফ্লপ ফিল্ম!'

—'গল্পে নিশ্চয়ই একটা বাঘ ছিল'।

সে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। গল্পে যে একটা বাঘ ছিল সেকথা এই ভদ্রলোক আগেই জানলেন কি করে!

—'একদম ইজি!' ডিপ্রেশনের পেশেন্ট মুচকি হেসে জানায়—'এত ফিল্ম থাকতে দময়ন্তী যখন 'বাঘ বাহাদুর'কে টেনেছেন, তখন বুঝতেই হবে যে নির্ঘাৎ ফিল্মে একটা বাঘ ছিল। তাই অন্য কোনও নাম না জুড়ে, ঐ নামটাই জুড়েছেন'।

—ঠিক স্যার। 'বাচ্চুর কেরামতি'তে একটা বাঘ ছিল। স্টোরি লাইন আপ অনুযায়ী সার্কাস দলের একটি বাচ্চার নাম 'বাচ্চু'। সেই বাচ্চু সার্কাসে সাইকেলের খেলা দেখাত। হঠাৎ একদিন তার শখ হল যে রিংমাস্টার হবে। সোজা ঢুকে গেল বাঘের খাঁচায়। বাঘটার সাথে বন্ধুত্বও হয়ে গেল তার। তারপর একদিন সেই বাঘের পিঠে চড়েই ডাকাতদলকে শায়েস্তা করল সে। এটাই মেইন স্টোরি লাইন আপ!'

—'অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্টোরি লাইন আপ। ফিল্মে পাঁচফুটি অভিনেতা কজন ছিল?'

—'একজনই ছিল। তারই লিড রোল। একটি বছর বারোর বাচ্চা। 'বাচ্চু'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সে ছাড়া আর সব পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির উপরে। মানে সবারই লম্বা লম্বা চেহারা!'

—'সেই সেন্ট্রাল ক্যারেকটারটির খোঁজ করেছ?'

—'করেছি'। অর্চিষ্মান জানায়—' এবং তাকে পেয়েছিও। কিন্তু সে এখন আর ছোট নেই! বছর আঠেরো বয়স তার। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা! ছেলেটি এখনও অভিনয় করে। তবে ফিল্মে আর অভিনয় করেনি। এখন

মেগাসিরিয়ালে ছোটখাট রোল করে'।

—'ছোট ছেলে বড় হয়ে গেছে!' পেশেন্টের মুখে স্মিত হাসি ভেসে ওঠে—'ফিল্মে আর কোনও বেঁটেখাটো লোক ছিল না। শিওর?'

—'শিওর। ঐ একজনই ছিল। আর কেউ নেই। বরং ছ'ফুট লম্বা লোকই ওখানে বেশি। ট্র্যাপিজ প্লেয়ারের হাইট তো প্রায় আপনার কাছাকাছিই— ই-ছয় তিন! রিং মাস্টার তথা বাচ্চুর বাবার রোল যে করেছিল, সে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা!' সে বলল—'ফিল্মটার বিশেষত্বই এই যে প্রায় গোটা ফিল্মেই ছ'ফুটিদের ছড়াছড়ি। ডাকাত সর্দারও ছ'ফুট এক ইঞ্চি!'

–'তুমি তো দেখছি প্রত্যেকটা ক্যারেকটারের হাইট ধরে ধরে নোট করেছ! সত্যিই-ব্রিলিয়ান্ট ওয়ার্ক!' পেশেন্ট কি যেন ভেবে নিয়ে বলে—'আর বাঘটা? তার হাইট কত ছিল?

বাঘের হাইট! এরকম উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে অর্চিষ্মান ভাবেনি। কোনরকমে মিনমিন করে বলল—'স্যার, বাঘের হাইট তো জানতে চাইনি! তবে বাঘটা সার্কাসের বাঘ ছিল এইটুকুই জানি।'

–'এত কিছু জেনেছ আর বাঘের হাইটটা জানোনি?' সে রাগ রাগ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অর্চিষ্মানকে দেখল। অর্চিষ্মানের তখন থরহরি কম্পমান হচ্ছে। বাঘের হাইটটা মিস্ হয়ে গেল! হয়তো ওটাই সবচেয়ে বেশি জরুরী ছিল।

-'সরি স্যার'।

পেশেন্ট এবার ফিক্ করে হেসে ফেলেছে—'রসিকতা করলেও এত ঘাবড়ে যাও কেন? গ্রেট ওয়ার্ক! তোমার জায়গায় আমি থাকলে, এত কম সময়ে এত ইনফর্মেশন জোগাড় করতে পারতাম না। যাই হোক, আরেকটা ইনফর্মেশন জোগাড় করে দাও। এখনই কিচেনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ যে ছুরির সংখ্যা আরেকটা কমেছে কি না!'

অর্চিষ্মান তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে সে যোগ করল—'এটা রসিকতা নয়'।

--'ওকে'।

মিনিট দশেকের মধ্যেই একতলায় গিয়ে টুক্ করে খোঁজটা নিয়ে এল সে। নাঃ, কোনও ছুরি মিসিং নয়। সব যথাস্থানেই আছে।

সে কথা দুশো চারের পেশেন্টকে বলতেই সে শান্ত গলায় বলল—'তার মানে আমার কপালে ঠ্যাঙা নাচছে। মোস্ট প্রব্যালি ঐটা'।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করল অর্চিষ্মান। পেশেন্ট তার নিজেরই ঘরের বাইরে রাখা ঠ্যাঙা তথা খিলটার দিকে তাকিয়ে আছে।

একতলার ঘড়িতে সজোরে বারোটার ঘন্টা পড়ল। মিনিটের কাঁটাটা একটু একটু করে সরছে আর ডঃ চৌধুরীর বুকের ভিতরের ধুকপুকুনিটা ক্রমশই বাড়ছে। তিনি অধৈর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। পুলিশ অফিসারটি কতদূর জানতে পেরেছে? সবটুকুই জেনে গেছে কি?

আর আধঘন্টা বাকি। তারপরই পর্দা ফাঁস হবে। ডঃ মনোহর চৌধুরী অস্থিরভাবে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

ভিতরের কাঁপুনিটা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে। আর কতক্ষণ সহ্য করতে হবে এই উত্তেজনা!

অস্থিরভাবে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক। অফিসার যে রীতিমত বুদ্ধিমান তাতে কোনও সন্দেহ কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরাও অনেক সময়ে যারাত্মক ভুল করে বসে।

ফাঁকা করিডোরের এদিক ওদিক দেখতে দেখতেই তার মনে হল, করিডোরটা আজ বড় বেশি ফাঁকা! রাত বারোটার পর সামান্য শুনশান হয়ে যায় বৈকি। কিন্তু এত খালি তো হয় না! একজন সিস্টার কিংবা ওয়ার্ডবয়কেও চোখে পড়ল না। গেল কোথায় সবাই?

নেই।

নাঃ...এভাবে হবে না। কে শিকারী আর কে শিকার তা এখনও বোঝা যায়নি। ওস্তাদের মার কোথা দিয়ে পড়ে তা কেউ জানে না। তিনি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন কিচেনের দিকে। কিচেনে তখন কেউ ছিল না। কফির মেশিন থেকে গ্লাসে কফি নিয়ে চুমুক দিতে দিতে চতুর্দিকটা দেখে নিলেন ডঃ চৌধুরী। কেউ তাকে দেখছে কি না সেটাই যেন পরখ করছেন।

এর ফাঁকেই তার বাঁ হাতটা অতি সাবধানে এগিয়ে গেল সার সার বাটার নাইফের দিকে। তারপর যা ঘটল তা অভাবনীয়! বাঘ যেমন হরিণের উপর লাফিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরে, ঠিক তেমনই তার আঙুলগুলো ক্ষিপ্রগতিতে চেপে ধরল একটা ছুরির বাঁট! মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্রটা চলে গেল তার অ্যাপ্রণের পকেটে।

কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে আশ্বস্ত হলেন তিনি। তার হাতের ভেল্কি কেউ দেখেনি। এখন বারোটা পাঁচ।

আর দেরি করা যাবে না...!

বারোটার ঘন্টা পড়ার শব্দ ডঃ হালদারও পেয়েছিলেন। এক একটা ঘন্টা পড়ছে, আর তার হৃৎপিন্ডটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আজ পেশেন্টদের দিকে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দিতে পারেন নি। বারবার দুশো চারের পেশেন্টের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কি জানে ছেলেটা? কি করে জানল?

প্যাথোলজি ল্যাবেও এখন কেউ নেই। সচরাচর রাত ন'টার পরই প্যাথোলজি ল্যাব ফাঁকা হয়ে যায়। এই মুহূর্তে একাই প্যাথোলজি ল্যাবে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তার সামনে ক্লোরোফর্মের শিশি। একবার সেটার দিকে তাকালেন। তারপর সন্তর্পণে চতুর্দিকটা মেপে নিচ্ছেন। কেউ অলক্ষ্যে নজর রাখছে না তো!

এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নাঃ, কেউ নেই।

সেই ফাঁকেই ক্লোরোফর্মের শিশিটা তুলে নিলেন ডঃ হালদার। ছেলেটা যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকে, তবে চান্স না নেওয়াই ভালো।

বারোটা বাজতেই অর্চিষ্মান হাজির হল দুশো চারের পেশেন্টের ঘরে। তার ঘর অন্ধকার। বিছানার উপর দীর্ঘ দেহটা গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে।

তার মনে ভয় জাগে। শোওয়ার ভঙ্গিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। এর মধ্যেই আততায়ী কাজ হাসিল করে বেরিয়ে যায় নি তো! সে আড়চোখে দরজার বাইরে তাকাল। ঠ্যাঙা বা খিলটা এখনও ওখানেই আছে দেখে একটু স্বস্তি পায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় পেশেন্টের দিকে। করিডোরের আবছা আলোয় তার মুখ দেখা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। চোখ বোঁজা। মুখে প্রশান্তভাব।

–'কি দেখছ? বেঁচে আছি'।

ক্ষীণ কয়েকটা শব্দ শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অর্চিষ্মান।

-বারোটা বাজে স্যার'।

–'এখনও বাজেনি'।

সে অবাক হয়ে বলে—'সেকি! ঘন্টা পড়ল তো!'

-'আমি আমার কথা বলছি'। পেশেন্ট হাসল—'সবে তো কলির সন্ধে'।

—'আপনি শিওর তিনি আসবেন?"

–'আসতেই হবে তাকে'। মৃদু হাসিটা তখনও লেগে আছে তার ঠোঁটে—'এবং সবরকম প্রস্তুতি নিয়েই আসবেন। সাড়ে বারোটা অবধি অপেক্ষা করতে হবে না। সময় হয়ে এসেছে।

স্যারের হাসি দেখে অর্চিষ্মানের আরও ভয় লাগে! একটা মহা ধুরন্ধর খুনীর সাথে

মোকাবিলা করতে হবে তাকে। অথচ এখনও কেমন সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন! হাসি তো দূর, ভাবলেই রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে তার নিজের। অথচ এই লোকটার ভ্রূক্ষেপও নেই! সার্ভিস রিভলবারটা যে সঙ্গে নেই সে খেয়াল তার আছে তো?

-'আমি আপনাকে ছেড়ে নড়বো না স্যার'। অর্চিষ্মান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—'এভাবে একটা খুনীর সামনে আপনাকে অরক্ষিত রাখতে পারি না! আমার ডিউটি আমায় সে পারমিশন দেয় না।

—'বেশ'। পেশেন্ট ঘরের অন্ধকার কোণটা দেখিয়ে দেয়—'ঐখানে চুপ করে বসে থাকো। কোনও শব্দ করবে না। শুধু দেখে যাও। যাই ঘটুক, আমার নির্দেশ না পাওয়া অবধি কিচ্ছু করবে না। গট ইট্?'

অর্চিষ্মান বিনাবাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করল। অন্ধকার কোণে নিঃসাড়ে মিলিয়ে গেল।

এরপর শুধু প্রতীক্ষা! এক একটা মিনিট কাটছে আর উত্তেজনার পারদ ধাপে ধাপে চড়ছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দেই মাঝেমধ্যে চমকে উঠছিল অর্চিষ্মান। সে নিজেও বুঝতে পারছে না যে আজ কোন অতিথির আগমন ঘটবে এ ঘরে। এক একটা মিনিটকে এক এক ঘন্টা বলে মনে হচ্ছে। এ রাতটা কি অনন্ত! কখনও কি শেষ হবে না এই রাত! কি হবে আজকে? কি...?

ঘরের দরজা আলতো ভাবে ভেজানো। এখানে পেশেন্টদের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করার নিয়ম নেই। ডাক্তাররা রাউন্ডে আসতে পারেন। সিস্টার ওয়ার্ডবয়রা আসতে পারে। তাই রাতে দরজা ভেজানোই থাকে।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ পিঙ্গল রশ্মি এসে পড়ছে পেশেন্টের মুখে। সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বুকের উপর হাতদুটো জড়ো করা। মুখে কোনও চিন্তার ছাপ নেই!

সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়িয়ে তারও ক্লান্ত লাগছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটাকে মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করার চেষ্টা করছে সে। একটা অমোঘ হাই গলার কাছে এসে হঠাৎ মাঝপথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ!...খুট্ করে একটা ক্ষীণ আওয়াজ!

মুহূর্তের মধ্যে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। এসেছে...কেউ এসেছে!

সমস্ত স্নায়ু-ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেছে। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখে পেশেন্টের মুখের উপরে ক্ষীণ রশ্মি আস্তে আস্তে চওড়া হল। অর্থাৎ দরজাটা কেউ সন্তর্পণে খুলেছে। তার একটু পরেই ঘরের মেঝেতে একটা লম্বা ছায়া!

অজান্তেই অর্চিষ্মানের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। শিকার ফাঁদে পড়েছে! এখনই গিয়ে চেপে ধরলেই হয়। কিন্তু

স্যারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই ঘরের কোণে ঘাপ্টি মেরে বসেই দেখল যে এক আগন্তুক গুটিগুটি পায়ে এসে স্যারের ঠিক মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষীণ আলোতেও দেখতে অসুবিধা হয় না যে তার হাতে পাতলা গ্লাভস!

—'কে?'

আগন্তুকের আগমন পেশেন্টটিও টের পেয়েছে। সে বিছানায় উঠে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখদুটো কুঁচকে লোকটিকে দেখার চেষ্টা করে। সদ্যঘুমভাঙা চোখ চিনতে চাইছে রাতের অতিথিকে।

—'কে? ডাক্তারবাবু এলেন?...'

আরও কিছু বলার আগেই আগন্তুকের একটা হাত তার মাথার পিছনদিকটা চেপে ধরেছে। আরেকটা হাত রুমাল চেপে ধরল মুখের উপর! ছট্ফট্ করে ওঠার ন্যূনতম সুযোগও পেল না পেশেন্ট! নিরুপায়ভাবে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল আক্রমণকারীর বেষ্টনীর মধ্যে!

অর্চিষ্মান স্তম্ভিতের মত ব্যাপারটা দেখছিল! তার নাকে একটা আলতো মিষ্টি গন্ধ আসছে! কি সর্বনাশ! ক্লোরোফর্ম! এই সম্ভাবনাটার কথা আগে মাথায় আসেনি! দুষ্কৃতী ঠ্যাঙা দিয়ে

মারবে, স্যার সেটা বুঝেছিলেন। কিন্তু তার আগে যে ক্লোরোফর্ম দিয়ে নেবে—সেটা হয়তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি।

গোটা ঘটনাটাই এত দ্রুত হয়ে গেল যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়! তার মধ্যেই খুনী ক্ষিপ্রগতিতে দরজার সামনে থেকে জগদ্দল খিলটা নিয়ে এসেছে। শিকার নিস্তেজের মত বিছানায় পড়ে...অর্চিষ্মানের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনেই বিদ্যুৎগতিতে ঠ্যাঙাটা ছোবল মারার যত উঠল...একদম স্যারের যাথা লক্ষ্য করে... কিছু করার উপায় নেই... সেকেন্ডের ভগ্নাংশে আছড়ে পড়ল তার মাথায়......

সে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল স্যারের উপর। তাতে তার পিঠ বা কাঁধ ভাঙলেও স্যার বেঁচে যেতেন। কিন্তু ততদূর যেতে হল না। তার আগেই একটা শক্তিশালী হাত খপ্ করে ধরে ফেলেছে প্রচন্ড বেগে নেমে আসা অস্ত্রটাকে। সঙ্গে সঙ্গেই অর্চিষ্মান শুনতে পেল একটা পরিচিত কন্ঠস্বর!

—'অর্ণব। লাইট প্লিজ'।

অর্চিষ্মান, তথা অর্নব সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়েছে। সমস্ত ঘর সাদা আলোয় ভরে উঠল।

—দেখে নাও'। খুনীর হাতের খিলটা ডানহাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে অধিরাজ-'বলেছিলাম না, হাইটটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়! এই দেখো, ইনি বাঁ হাতি। এখনও বাঁ হাতেই ঠ্যাঙাটা ধরে রেখেছেন। মাথায় কদমছাঁট। গায়ে লাল জামা। চুল ঘন করার জন্য মাথায় ক্যাস্টর অয়েল মাখেন—সব কি সুন্দর মিলে যাচ্ছে!'

বলতে বলতেই তার সকৌতুক দৃষ্টি অর্নবের দিক থেকে খুনীর দিকে ফিরল।

–'পরপর দুটো ওভার বাউন্ডারি মেরে, থার্ডবলটাতেই ক্যাচ কট্ কট্ হয়ে গেলেন মাস্টার পুপু?'

ইতিমধ্যেই দরজার সামনে আরও দুজনের আবির্ভাব হয়েছে। ডঃ হালদার এবং ডঃ চৌধুরী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই খুনী? এই বারো বছরের বাচ্চাটাই একের পর এক খুন করে যাচ্ছিল! পুরো ঘটনাটাই অবিশ্বাস্য লাগে তাদের। একটা বাচ্চাছেলে খুনী!

–'বাচ্চা হোক্ ওঁর দুশমন! বাচ্চা হতে যাবেন কোন দুঃখে?' অধিরাজ বলল—'উনি কমপক্ষে বত্রিশ বছরের যুবক! আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ওঁর তো আবার অনেকগুলো পরিচয়! ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র ও ডঃ অমিতাভ খাসনবিশকে ইনিই খুন করেছেন। অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জীকেও খুন করতে যাচ্ছিলেন! একটুর জন্য ফস্কে

গেল। যাই হোক, এর আরও পরিচয় আছে। ইনিই দময়ন্তী সেনের খুনী ও সম্পর্কে তাঁর কাজিন ব্রাদার!'

পুপুর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন রক্ত হিম হয়ে যায় সবার। কোথায় সেই বারো বছরের বাচ্চা ছেলের সারল্য! হিংস্র চোখদুটোয় জিঘাংসা ঠিকরে পড়ছে। চোয়াল শক্ত! এই মুহূর্তে তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ বলেই মনে হয়।

-রীতিমত অভিনয়ও করতে জানেন। কোনও বাচ্চার ঝুঁকিপূর্ণ শট থাকলে এঁকেই বাচ্চাটার ডামি হিসাবে ব্যবহার করতেন পরিচালকেরা। চমৎকার ইনোসেন্ট বেবিফেস থাকার দরুণ কারুর পক্ষে বোঝাই সম্ভব ছিল না যে উনি আদৌ বাচ্চা ছেলেই নন্। প্রোপোর্সোনেট ডোয়ার্ফিজ্‌মের কি দারুণ উদাহরণ! সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই প্রোপোর্শনেট! হাইপোপিটুইটারিজ্‌জ্‌মের রোগীদের দাড়ি গোঁফ অনেকসময় হয় না। এনারও নেই! বাচ্চা ছেলের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতেও পারেন। তাই বাইরে থেকে কোনভাবেই বোঝার উপায় নেই! অথচ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি ধরেন! কি অপরূপ খুনী!'

দুই ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন খুনীর দিকে! তাদের বাকশক্তি যেন লোপ পেয়েছে।

—'যে কয়েক কোটি টাকার প্রপার্টির জন্য এত কিছু করলেন সেটা ও তো ফস্কে গেল মিস্টার..., আপনার আসল নামটা কি?'

পুপু অসম্ভব প্রতিশোধস্পৃহায় মাথা নাড়ে।

—'বলবেন না? ঠিক আছে। কিন্তু তাতেও আপনার ভাগ্য পাল্টাবে না।

—'আপনার কাঠে কি প্রমাণ আঠে?' সে সাপের মত হিহিস্ করে বলে—'কে বলল ডে আমি ডময়ন্তী টেনের ঠেলে নই'?

—'প্রমাণ অনেক আছে'। অধিরাজ হাসল—'আপনি আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখেও বুঝলেন না? আমি একজন সি আই ডি অফিসার। খুনীকে শনাক্ত করার সাথে সাথে আমাকে প্রমাণও জোগাড় করতে হয়। এখানে আরও একজন সি আই ডি অফিসার, এবং দুজন ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছেন আপনাকে আমার উপর আক্রমণ করতে। এটাই কি যথেষ্ট নয়? এছাড়াও যে কয়েকটা প্রমাণ পাবলিক প্রসিকিউটারকে দেবো তার অন্যতম এই টুথ এক্সরে আর এম আর আই স্ক্যানের প্লেটটা। যেটা নিঃসন্দেহে আপনারই। ঐ স্ক্যান আর টুথ এক্সরে দেখেই দুই ডাক্তার ধরে ফেলেছিলেন যে আপনি আদৌ বাচ্চা ছেলে নন। তাই দুজনকেই মেরে ফেললেন!এবং প্লেটের পিছনের রিপোর্টটা হাপিশ করে, অতিরিক্ত চালাকি করে দুশো তিনের ইংরেজী তিন হরফটাকে টেনে ইংরেজীর আট করে দিয়েছিলেন। তবু শেষ রক্ষা হল না!' সে গভীর আক্ষেপে যাথা নাড়ে—'দ্বিতীয় প্রমাণ আপনার বার্থ সার্টিফিকেট ও আপনার সো কলড্ বাবা মায়ের বিয়ের ছবি! দময়ন্তী ও তপন সেনের বিয়ের ফটোতে বর-বৌয়ের পিছনে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার খুব অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। আতশকাঁচ দিয়ে দেখা গেল যে ওটা ১৪০৫ সালের ক্যালেন্ডার। এবং মাঘ মাসের পাতা খোলা আছে। আজকের খবরের কাগজের বাংলা তারিখ থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে বাংলা ক্যালেন্ডারের ১৪০৫ সালের মাঘ মাস শুরু হয়েছিল ইংরাজী উনিশশো নিরানব্বই সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি। আন্দাজ চোদ্দ কি পনেরো তারিখ। মানে আপনার বার্থ সার্টিফিকেটে বাবা-মা হিসাবে যাদের নাম লেখা আছে, তাদের বিয়ে হয়েছিল উনিশশো নিরানব্বই সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনও সময়ে। অথচ আপনার বার্থ সার্টিফিকেট বলছে যে পুপু নামক শিশুটির জন্মতারিখ এইডথ জানুয়ারি,১৯৯৯। বাবা-মায়ের বিয়ের আগেই আপনি জন্মালেন কি করে? সার্টিফিকেটটাই জাল—তাই না? কিন্তু বড় কাঁচা কাজ করেছেন। আপনার মত প্রতিভাবান ক্রিমিনালের অন্তত ডেটটা মেনটেইন করা উচিৎ ছিল'।

অধিরাজ আফসোসে মাথা নাড়ছে।পুপু হিংস্রভাবে বলে—'বাডে কঠা! ঠব বাড়ে কঠা!'

—'কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্ট বাজে কথা বলে না'। বজ্রকন্ঠে বলল সে—'ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে কালই আপনার মাথার চুল ও রক্তের নমুনা নিয়েছিলাম। আমাদের ফরেনসিক এক্সপার্ট আজ সকালেই জানিয়েছেন যে আপনার চুলে সেই ক্যাস্টর অয়েলই পাওয়া গেছে যা ডঃ খাসনবিশের টেবিলের তলায় ছিল। তিনি এ ও জানিয়েছেন যে আপনার হাইপোপিট্যুইটারি আছে। যার জন্য আপনার বয়েস বাড়লেও উচ্চতা বাড়েনি। বরং গড়নটা বারো বছরের বাচ্চার মতই হয়ে আছে। 'বাচ্চুর কেরামতি'র ডাইরেক্টর ও আপনাকে দেখলেই ফিল্মের নায়ক বাচ্চা ছেলেটির পূর্ণবয়স্ক ডামি বলে চিনতে পারবেন। স্বীকার করুন মাস্টার পুপু। পালাবার পথ নেই!'

পুপু ক্ষিপ্তভাবে চতুর্দিকটা দেখে নেয়। পরক্ষণেই আসুরিক শক্তিতে ঠ্যাঙাটা অধিরাজের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। সেটাকে গদার মত তুলে ধরে সে সবার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাল—'ঠবাই ঠরে ডাও। কেউ আমার ডিকে এগোবে না। এগোলেই মাঠা ঠাটু করে ডেবো।

অর্নব তার পিছন দিয়ে গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথা লক্ষ্য করে ঠ্যাঙাটা চালাল পুপু। সে কোনমতে বসে পড়ে মাথা বাঁচালেও বাড়িটা পড়ল তার কাঁধে! মুহূর্তের মধ্যে মনে হল কাঁধটাই বোধহয় নেই! যন্ত্রণায় কাতরে উঠল অর্নব।

–'একডম চালাকি নয়! মেরে ডেবো...মেরে ডেবো......!' বলতে বলতেই অধিরাজের দিকে ফিরল পুপু। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'আমায় আটকাটে পারবে না অফিঠার। ডে এগোবে টাকেই মারব'।

–'কেউ এগোবে না'। অধিরাজ তখনও ভীষণ শান্ত—— কিন্তু আপনি পালাতেও পারবেন না। পিছনে একবার তাকিয়ে দেখুন।'

—'ভেরি ওল্ড ট্রিক অফিঠার। টুমি আমায় বোকা পেয়েঠো?'

পুপু উত্তেজিত হয়ে অস্ত্রটা ফের হাওয়ায় ঘোরায়। কিন্তু পিছন থেকে একটা মৃদু অথচ স্নিগ্ধ কন্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠল!

-'শান্ত হও'।

সে বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফেরে। তার ঠিক পিছনেই একটি শীর্ণ চেহারার বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রশান্ত চোখ, সৌম্যকান্তি!

–'এই বুড়োটা কি করবে?...এই বুড়োটাকে ডিয়ে আমাকে আটকানো ডাবে না অফিঠার'। পুপু ঠ্যাঙাটা উঁচিয়ে ধরে। এক্ষুনি যেন বসিয়ে দেবে মানুষটির মাথায়—'ঠরে ডাও...ঠরে ডাও...'।

অধিরাজ তখনও বিছানায় বসেছিল। সে সেভাবেই জোর গলায় বলল—'ডঃ সেনগুপ্ত, এই ছোট্ট লোকটি আপনার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে!'

ডঃ সেনগুপ্তর মুখে সেই পেটেন্ট হাসিটা ভেসে উঠল। যেন কোনও দুষ্টু শিশু বদমায়েশি করতে চলেছে! সবুজাভ নীল চোখ দুটোয় অতলান্তিক গভীরতা।

–'ঠরে ডাও...নয়টো...'

একটুও ভয় পেলেন না তিনি। বরং তার অপূর্ব সুন্দর চোখদুটো পুপুর চোখের উপরে রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন ভদ্রলোক—'শান্ত হও...শান্ত হও...শান্ত হও...'।

পুপু বুঝতে পারল না যে কি হচ্ছে! তার সামনের লোকটির মুখে দুষ্টু হাসি। সে তার চোখ থেকে নিজের চোখ সরাতে পারছে না! কি দুর্নিবার শক্তি সেই চোখে! যেন বৈদ্যুতিক রশ্মি ঠিকরে পড়ছে তার দুচোখ বেয়ে...ক্রমশই

উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। পুপুর মনে হল সে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে...ডুবে যাচ্ছে এক অন্ধকার সমুদ্রে...সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে তার...কানে আসছে শুধু একটাই অমোঘ শব্দ—'শান্ত হও...শান্ত হও...শান্ত হও...'।

তার হাত থেকে ঠ্যাঙাটা সশব্দে খসে পড়ল।

–'তুমি ক্লান্ত...ঘুমোবে...তোমার চোখ বুঁজে আসছে... চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুপু ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। তার চোখ যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে! ডঃ চৌধুরী ও ডঃ হালদার এতক্ষণে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসেছেন। সে হয়তো মাটিতেই লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু দুজন দুদিক থেকে ধরে ফেললেন তাকে।

–'না জানি কি যন্ত্র পড়ি যাদু করিল'! অধিরাজ এবার বিছানা ছেড়ে উঠে এল সম্মোহিত খুনীটির দিকে।

–'কুড়ি সেকেন্ডেই চেক অ্যান্ড মেট!' একবার তাকে ভালো করে দেখে নিয়ে অর্নবের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার কন্ঠস্বরে তীব্র তিরষ্কার—'তোমায় ওরকম বোকার মত মাঝখানে

টপকে পড়তে কে বলেছিল? ব্লোটা যদি সোজা যাথায় পড়ত তাহলে এতক্ষণে কোথায় থাকতে!' বলতে বলতেই তার কন্ঠস্বর নরম হয়ে আসে—'খুব ব্যথা করছে? কলকব্জা ঠিক আছে? না নার্সিংহোমে ছুটতে হবে?'

অর্নব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে তখনও যন্ত্রণা হচ্ছে। তবে তেমন গুরুতর কিছু নয়। এ যাত্রা অল্পের উপর দিয়েই ফাঁড়া কাটল বোধহয়।

—'আমি ঠিক আছি স্যার'।

অধিরাজের মুখে স্বস্তির ছাপ পড়ে—'গুড নিউজ। অ্যাসাইলামের নীচে অলরেডি একটা প্রিজ্‌ন ভ্যান আর গোটা কয়েক পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমিই বিকেলে ফোন করে গোটা ফোর্স নিয়ে আসতে বলেছিলাম। অতিথিকে স্বাগত জানানোর জন্য স্বয়ং অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ী হাজির আছেন। তাঁকে ফোন করে বলে দাও যে মিশন সাকসেসফুল। তিনি দলবল নিয়ে যেন অবিলম্বে দুশো চারের পেশেন্টের ঘরে এসে হাজির হন্'।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ী পুপুর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পুপু তখনও সম্মোহিত! তার অবস্থা দেখে অফিসার লাহিড়ী অবাক!

—'এ-ই খুনী! এ অবস্থা হলো কি করে? কি করেছ?'

অধিরাজ একটু হাসে—'আমি নই। এ ক্রেডিট 'হিপনোসিস কিং' এর প্রাপ্য'।

ডঃ পুলক সেনগুপ্ত তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। তার চোখে এখন আচ্ছন্ন ভাবটা আর নেই। বরং অন্যান্য দিনের তুলনায় স্বাভাবিক লাগছে। অধিরাজ হুইলচেয়ারটা এনে তাকে সযত্নে বসাতে বসাতেই বলে—'এরকম একটা জিনিয়াস লোক থাকতে অন্য কোনও অস্ত্রের দরকার কি? ওঁর চোখ দুটোই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র!'

—'বুঝলাম! কিন্তু এর কি হবে?' অফিসার লাহিড়ী বললেন—'হিপনোসিস কাটবে কি করে?

—'আপনার স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্টেই কাটবে'। অধিরাজ হেসে ফেলেছে— 'দুই গালে দুই পেল্লায় চপেটাঘাত! আপাতত আপনার খাতিরদারিতে থাকুক। আমি দেড় দু ঘন্টার মধ্যেই আসছি'।

অফিসার লাহিড়ী কয়েদীকে নিয়ে চলে গেলেন। ইতিমধ্যেই অর্নব চারতলা থেকে কাফ্রীদের মত দেখতে নতুন

সাইকো কিলারকে নামিয়ে এনেছে। তার বীভৎস দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন কুচকুচে কালো মুখ, কোঁকড়া কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুল দেখলেই ভয় লাগে! ডঃ চৌধুরী তাকে দেখেই আঁৎকে ওঠেন—'এ কি অর্চিষ্মান! ওকে নামিয়ে এনেছ কেন? হাতে পায়ে লোহার শিকলও নেই! সর্বনাশ!'

—'উঁহু.......ডঃ চৌধুরী...' অধিরাজ বলল—'ও অর্চিষ্মান নয়। ওর নাম অর্নব। আমার জুনিয়রদের মধ্যে অন্যতম সেরা সি আই ডি অফিসার। আর এই কয়েদীটিও আপনার অতি পরিচিত।

বলতে বলতেই সে কয়েদীর নকল দাড়ি গোঁফ, ঘায়ের দাগওয়ালা স্টিকার খুলে দিয়েছে —'দেখুন, চিনতে পারেন কি না।

ডঃ চৌধুরী হাঁ করে তাকিয়ে আছেন—'না তো! কে?'

—'বেশ'। সে এবার উইগটাও খুলে ফেলেছে—'বিশ্বে এইরকম জাবুলানি ফুটবলের মত মাথা একজনেরই আছে। এটা দেখে অন্তত চেনা উচিৎ!'

সাইকোটি সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ওঠে—— কি! আমার টাক নিয়ে ইয়ার্কি!...আমার টাক নিয়ে ফের ফিচলেমি! মেরে ফেলবো...কেটে ফেলবো...হিংসে...! হিংসে!... নিজের নেই কিনা! তাই অন্যেরটা দেখলে হিংসে হয়!'

ডঃ মনোহর চৌধুরী প্রায় মহাকাশ থেকে পড়লেন। কোনমতে বললেন—'অসীম! তুমি!'

–'ইয়েস্, নান্ আদার দ্যান ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ অসীম চ্যাটার্জী স্বয়ং!' অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। টাক দিয়েও যদি না চেনেন, তবে লম্ফঝম্প দেখে চেনা অবধারিত। বাই দ্য ওয়ে ডক্টর, মনোরোগের তালিকায় টাক-হিস্টিরিয়া, বা টাক-স্কিজোফ্রেনিয়া বলে কোনও অসুখ আছে? থাকলে বলুন, ওনাকে এখানেই রেখে যাই'।

-'রাজা...আই হেট ইউ...আই জাস্ট হেট ইউ...'। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী রাগে লাফাতে লাফাতে বললেন—'মনোহর, তুমি জানো না...আমার মুখে চুন-কালি-ঝুল সব মাখিয়ে ছেড়েছে এই হতভাগা......!'

১৯

ডঃ হালদার অপ্রস্তুতের মত মুখ নীচু করে ছিলেন।

দুশো চারের ডিপ্রেশনের পেশেন্টকে এখন চেনাই দায়! তার হাবভাবই পালটে গেছে। কোথায় সেই উদ্ভ্রান্ত হতাশ হতাশ চেহারা! বরং চলাফেরা ও কথাবার্তার মধ্যে অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস আর কম্যান্ডিং টোন! একদম শাণিত, ঝকঝকে তকতকে স্মার্ট যুবক। তার সাথে পুলিশকর্মীদের তটস্থ ভাব, স্যালুট ঠোকার ঘটা আর 'স্যার...স্যার' করার ভঙ্গি দেখে তিনি বুঝতেই পারছিলেন এ কোনও সাধারণ লোক নয়! ডঃ চৌধুরী ছোট্ট করে তার পরিচয়টা দিয়ে দিলেন—'উনি একজন আই পি এস অফিসার'।

ডঃ হালদারের মুখটা তখন দেখার মত হয়েছিল! এখনও মুখ কালো করে বসে আছেন।

অফিসার লাহিড়ী পুপুকে নিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসার অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্নব ও ডঃ চ্যাটার্জী বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কালো জিনস আর নীল শার্টে অধিরাজকে আরও আকর্ষণীয় লাগছিল। অর্নব ডাক্তারের ধরাচূড়ো ছেড়েছে। ডঃ অসীম চ্যাটার্জীও তার মুখকে কালিমাযুক্ত করেছেন। তবে মোটা মোটা ঠোঁটদুটো এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ঠোঁটে নিয়মিত প্যারাফিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার এফেক্ট।

তার মুখের দিকে তাকিয়েই কুক্কু ফিকফিক্ করে হাসছিল। একটু আগেই তাকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। তার নতুনকাকু ও ডাক্তারবাবুরা, সবাই জানিয়েছে যে, এখন অ্যাসাইলাম থেকে তার ছুটি হবে। সে জ্যেঠুর বাড়ি যাবে। অসীম চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেই সে সম্মতি জানিয়েছে। কারণ এই ভদ্রলোককে দেখতে অবিকল তার বাবার মতন। তাই জ্যেঠু বলে চিনতে অসুবিধা হয়নি। শুধু একবার জানতে চেয়েছে—'দাদা কোথায়?'

অধিরাজ মুচকি হাসে—'দাদা মামাবাড়ি গেছে। মামারা এসে তাকে নিয়ে গেছে। আর তুমি এখন জ্যেঠুর সাথে যাবে'।

এখন সে অধিরাজের কোলে বসে বারবার জ্যেঠুর দিকে তাকাচ্ছে আর ফিকফিক করে হাসছে।

–'হাসছ কেন?' ডঃ চ্যাটার্জী উৎসুক হয়ে জানতে চান।

কুক্কু লজ্জায় অধিরাজের বুকে মুখ গুঁজেছে। প্রথমে কিছুতেই বলবে না হাসির কারণটা। তারপর নতুনকাকুর অনেক সাধ্যসাধনায় শেষ পর্যন্ত বলল— —'জ্যেঠুকে ডোনাল্ড ডাকের মত লাগছে!'

ডঃ চ্যাটার্জী রাগতে গিয়েও পারলেন না। বরং হেসে ফেলেছেন। কুক্কু এবার নতুনকাকুর দিকে তাকায়—'তুমি কপ্?' –'বাঃ'। নতুনকাকু তাকে একচোট আদর করে বলল—'কপ্ করে কও শিখে ফেলেছ? কপ মানে কি বল তো?'

–'পুলিশ'। কুক্কু সপ্রতিভ ভাবে বলে—'তুমি পুলিশ?'

-'হ্যাঁ, সোনা'।

সে তার নরম তালু অধিরাজের পেটে রেখেছে—'কই, তোমার তো ভুঁড়ি নেই!'

সকলেই একসাথে হেসে উঠেছে। অধিরাজ তার গালে একটা চুমু খেয়ে বলে—'এই দুষ্টুটা এক নম্বরের কপিক্যাট। ও যদি আমার ঘর সার্চ না করত তাহলে বুঝতেই পারতাম না যে খুনীর কাছে ধরা পড়ে গেছি। ও আমায় প্রচুর হেল্প করেছে...'।

-'না... এভাবে নয়...!' ডঃ চৌধুরী ও ডঃ হালদার সমস্বরে বললেন—'শুরু থেকে...শুরু থেকে...'।

—'হ্যাঁ'। ডঃ চ্যাটার্জী বলেন –'প্রথম থেকেই বলো। আমরাও একটু শুনি'।

অধিরাজ হাসছে—'কোন্‌টা আগে বলবো? তদন্ত পদ্ধতি? না পুপুর কীর্তি?'

—তদন্ত পদ্ধতিটাই আগে শুনি'। ডঃ চৌধুরী বললেন—'আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলোও খোলসা হয়ে যাক'।

–'বেশ!' অধিরাজ বলল———শুরুতেই আমাদের গোটা টিমটার এখানে এসে 'বেস অব

অপারেশন' গড়ে তোলার দরকার ছিল। যেটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ! পেশেন্টদের বিরক্ত করা চলবে না। অথচ তদন্ত চালাতে হবে! ডাক্তারদেরও জানতে দেওয়া যাবে না। কারণ তখন আমাদের চোখে অ্যাসাইলামের সবাই সাসপেক্ট! তাই ছদ্মবেশ ধরতে হল। অর্ণব পুলিসে আসার আগে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু মড়া কাটার ভয়ে পালিয়েছিল। ওর পক্ষে একজন জুনিয়র ডাক্তারের ভূমিকায় নামা সহজ ছিল। আমি হয়ে গেলাম ডিপ্রেশনের পেশেন্ট। ডঃ চ্যাটার্জীই বুঝেসুঝে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন, যাতে পটল তোলার মত অবস্থা হলেও শেষপর্যন্ত রক্ষা পাই। আবার সেই তিনিই খুব সাবধানে আমার কবজি কাটলেন।

সে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে দেখায়—'ওনাকেও আনা দরকার ছিল। ফরেনসিকের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে পড়ে। তাই ডঃ চ্যাটার্জীও এলেন।কিন্তু ওঁকে এখানে আনতে সবচেয়ে বেশি কসরৎ করতে হয়েছে আমাদের। আমাকে বা অর্নবকে কেউ এখানে চিনত না। তাই মেক-আপের দরকার পড়েনি। কিন্তু এই ভদ্রলোক স্বয়ং ডঃ চৌধুরীর পরিচিত! তার উপর ঈশ্বরপ্রদত্ত যা একখানা খানদানি মুখ আর ভয়াবহ অ্যাটিটিউড, লম্ফঝম্প আর হাঁকডাক!—লুকোনোই মুশকিল! ডঃ চৌধুরী দেখলেই চিনবেন। তাই মুখে কালি মাখাতে হল। গালে নকল দাড়ি গোঁফ, ঘায়ের দাগ মার্কা স্টিকার লাগানো হল। ঠোঁটে প্যারাফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঠোঁট মোটা করতে হল। এবং সবশেষে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের উইগও পরাতে হয়েছিল। এত কিছু করে তবে ঐ খানদানি চেহারা লুকোনো গেল!'

এবার আসি তদন্তের কথায়। কুক্কুর ব্যাটটা যে মার্ডার ওয়েপন নয় তা শুরু থেকেই জানতাম। যখন আমাকে ট্রলি করে ঢোকানো হচ্ছিল তখনই ঘরের বাইরে ঠ্যাঙাগুলোর দিকে নজর গেল। চমৎকার মার্ডার ওয়েপন হতে পারে। ঐ জিনিস মাথায় পড়লে চ্যাপ্টার ক্লোজ হতে বাধ্য। ট্রলিতে যেতে যেতে দেখলাম যে চোদ্দ নম্বর ঘরের ঠ্যাঙাটা নেই! বুঝতে অসুবিধা হল না আসল অস্ত্র ওটাই। অর্চিষ্মানের ছদ্মবেশে থাকা অনবকে ইশারায় বলেও দিলাম যে একটা ঠ্যাঙা মিসিং। ও প্রথমে না বুঝলেও পরে ডঃ খাসনবিশের কথায় বুঝে গেল'।

ডঃ চৌধুরীর প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে গেল। 'ঠ্যাঙা দিয়ে মারবো' আর 'এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে না' কথাদুটোর প্রকৃত অর্থ এতক্ষণে মাথায় ঢুকল তার।

–'বুঝলাম। তারপর?

–'তারপর শুরু হল আমাদের কাজ। অর্নবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ! ও যা পারফরম্যান্স দিয়েছে তা ভাবা যায় না! ডাক্তার সেজে চতুর্দিকে কড়া নজর রেখেছে। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে—সমস্ত আপডেট দিয়ে গেছে। অন্যদিকে চারতলার সাইকোদের উপর সতর্ক নজর রাখলেন ডঃ চ্যাটার্জী! কয়েকদিন কাটানোর পরেই বুঝতে পারলেন, বাইরের কোনওরকম সাহায্য ছাড়া সাইকোদের হাত-পায়ের শিকল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসাই অসম্ভব। তাও যদি কোনমতে বেরিয়ে আসে তবুও দুমদাম খুন করবে। কিন্তু প্রি-প্ল্যান্ড মার্ডার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য যদি না এর পিছনে অন্য কারুর মাথা থাকে। সাইকোকে বাগে এনে তাকে দিয়ে মার্ডার করানো অত সহজ নয়! সাইকোদের হাত করার ব্যাপারে ডাক্তারদের সন্দেহ হয় ঠিকই। কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যেও একমাত্র ডঃ পুলক সেনগুপ্তই সে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। আজ পর্যন্ত আর কেউ পারেনি।

হিপনোসিস কিং কে এখানে দেখব ভাবিনি! যখন দেখলাম ও চিনতে পারলাম তখন চিন্তা আরও বেড়ে গেল। এই লোকটি আমার সন্দেহের লিস্টে প্রথমেই চলে এসেছিলেন। সিস্টারদের বাদ দিয়েছিলাম। মেয়েদের ছোট করছি না। কিন্তু ঐ জগদ্দল ঠ্যাঙা তোলা এবং চিরঞ্জীব মিত্রকে একমারেই কাৎ করে দেওয়া তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। এ কোনও পুরুষের কাজ। ডাক্তার বা ওয়ার্ডবয়রাও লিস্টে ছিল। আর ছিল বাচ্চারা!'

-'বাচ্চাদেরও সন্দেহ করেছিলেন আপনি?'

অধিরাজ হাসল—'কি করব? আমার পাপী মন। বাচ্চাদেরও ছাড়িনি। বরং গোড়া থেকেই বাচ্চাদের উপর আমার একটু বেশি সন্দেহ ছিল। ভেবে দেখুন, একটা বাচ্চা যদি ঘাড়ে ব্যাট

নিয়ে হেঁটে যায়, তবে অঞ্জলি গুপ্ত'র মত পেশেন্ট ছাড়া আর কেউ ভয় পাবে না। সন্দেহও করবে না। অন্য পেশেন্টদের পক্ষে অ্যাসাইলামের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো মুস্কিল। কিন্তু একটা বাচ্চা অনায়াসেই ঘুরে বেড়াতে পারে। ডঃ খাসনবিশের মৃত্যুর দিন কিচেনে সেই বাচ্চারাই ছিল। যদিও ঐটুকু বাচ্চাছেলেগুলো খুন করতেই বা যাবে কেন? মোটিভ তখনও আননোন্। কিন্তু কুক্কুর চুল কাটার ভীতি ও ডাক্তারদের উপর আক্রোশ নিয়ে আমারও একটু দ্বিধা ছিল। তাই প্রথমেই দুষ্টুটার সাথে ভাব জমালাম। ডঃ অমিতাভ খাসনবিশ আমার কাজ আরও সহজ করে দিলেন। একেবারে বাচ্চাদের ফ্লোরে শিফ্ট্ করে দিলেন। কুক্কুর ভয়টা পরখ করে দেখা জরুরী ছিল। কিন্তু দেখলাম যে তার ভয়টা অন্য জায়গায়। কিছু গোপন করার উদ্দেশ্য তার নেই'।

–'যে দুটো মিরাকল আপনি করেছেন, তার মধ্যে কুক্কুর ভীতি কাটানোটা প্রথম'। ডঃ চৌধুরী বলেন—'ডঃ সেনগুপ্তকে কিভাবে হিপনোটাইজ করেছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কুক্কুর ভয় ভাঙালেন কি করে? আমরা সবাই মিলে এতদিনেও যা পারলাম না, তা আপনি একদিনেই করলেন! এই ধাঁধাঁটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

—'এটারও ক্রেডিট ডঃ চ্যাটার্জীরই প্রাপ্য'। সে বলে-'আমি এমন কিছু জানতাম যা আপনারা জানতেন না। ডঃ চ্যাটার্জী আমায় বলেছিলেন যে কুক্কুর স্টেপমাদার দময়ন্তী সেনকে থ্যালিয়াম স্লো পয়জনিং করা হয়েছিল। থ্যালিয়াম পয়জনিঙের অনেক সিম্পটম আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল চুল উঠে যাওয়া। অনেক সময় ভিকটিমের অ্যালোপেশিয়াও হয়ে যায়। অর্থাৎ মাথায় টাকও পড়ে যায়। কুক্কু দেখেছিল তার সৎ মায়ের মাথার চুল গোছায় গোছায় উঠে যাচ্ছে। চুল পড়ে যাচ্ছে। এর কয়েকদিন পরেই তিনি মারা গেলেন! তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে চুল উঠে গেলেই মানুষ মারা যায়! নিজের সৎ মাকে এভাবেই মারা যেতে দেখেছে সে'। অধিরাজ কুক্কুর মাথায় হাত বোলাচ্ছে—'এইটুকু একটা বাচ্চা ছেলে বুঝবে কি করে যে মাথার চুল উঠে যাওয়া বা পড়ে যাওয়াটা আসলে বিষের এফেক্ট! সে ভয় পেল। আর সেই ভয়টা এত বড় হয়ে দাঁড়াল যে নিজের মাথার চুল কাউকে স্পর্শ করতে দিত না। আতঙ্ক যে, চুল উঠে গেলেই বা কেটে দিলেই সে মরে যাবে। আমি শুধু ওকে হাতেনাতে দেখালাম যে চুল উঠলেই বা কাটলেই মানুষ মারা যায় না! তবে কুক্কুর ভয় কাটল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন, দময়ন্তী কুক্কুর স্টেপযাদার ছিলেন। পুপুর নিজের মা! কুক্কু যা দেখেছে পুপুও নিশ্চয়ই তা-ই দেখেছে। অথচ ভয়টা শুধু একা কুক্কুরই হল! পুপুর হল না! একটা দশ বছরের ছেলের পক্ষে থ্যালিয়ামের এফেক্ট যেমন জানা সম্ভব নয়, তেমনি বারো বছরের ছেলের পক্ষেও অসম্ভব! পুপুরও ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে ভয় পায়নি। এটাই আমার মনে পুপু সম্বন্ধে প্রথম খটকা। তবে কি পুপু জানে যে এই চুল উঠে যাওয়াটা আদৌ কোনও রোগ নয়, বরং বিষের এফেক্ট? আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে শুরু করল'।

–'হুঁ, গুড পয়েন্ট!' ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'আগেই ভাবা উচিৎ ছিল'।

–'আমার তখনও মন পড়েছিল আসল মার্ডার ওয়েপনটার দিকে। যখন ওয়ার্ডবয়রা হুইলচেয়ারে করে ঘোরাতো তখন গোটা চত্বরটাই ভালো করে দেখেছি। কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন নেই। ঠ্যাঙা বা খিলটা কেউ মাটিতে পোঁতেনি। তাহলে সেটা গেল কোথায়? আমার সমস্ত সন্দেহ পুকুরটার উপর পড়ল। মার্ডার ওয়েপন গায়েব করার একদম উপযুক্ত জায়গা। ব্যস্, সুযোগ পেয়েই লাফিয়ে পড়লাম পুকুরে। বলাই বাহুল্য যে ঠ্যাঙাটা ওখানেই পাওয়া গেল। আমি সাঁতার ভালোই জানি। তবু একপেট জল গিলতে হল। যাতে এটাও আত্মহত্যার অ্যাটেম্পট বলেই মনে হয়।

ডঃ হালদারের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। ডঃ চৌধুরী কোনমতে বললেন—'গড!'

——'সেদিন রাতেই অস্ত্রটা উদ্ধার করলাম। অর্নব এসে হাত পা খুলে দিল। ও কোথা থেকে অমিতাভ খাসনবিশের মতই একটা গোল ফ্রেমের চশমা জোগাড় করেছিল। ডঃ খাসনবিশের উদ্ভট স্বভাব ও উলটো গোণার অভ্যাসের কথা অর্নবই আমাকে বলেছিল।

তখন দরকার পড়ল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের। ডাক্তার হওয়ার দরুণ অর্নবের হাতের কাছে সব চাবিই থাকত। ও আমাকে চারতলার সাইকো কিলারের ঘরের চাবির একটা ডুপ্লিকেট কি এনে দিয়েছিল। আমি গিয়ে ডঃ চ্যাটার্জীকে নামিয়ে আনলাম। অন্যদিকে অর্নব একটু ঝুঁকি নিয়ে ইলেক্ট্রিকের মেইন তারটাই কেটে দিল। আর অবিকল ঐ একই মেক-আপ নিয়ে নিজেই প্রক্সি দিল। যেহেতু ডঃ অর্চিষ্মান দত্ত'র সেদিন অফডিউটি ছিল তাই কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ঐ ওথেলো মার্কা মেক-আপই বাঁচিয়েছিল সে যাত্রা'।

-'তার মানে সেদিন যে লোকটি অমিতাভ খাসনবিশ সেজে ঝড়জলের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল-সে আপনি!'

—'হ্যাঁ—আমিই। কিন্তু তখন কে জানত যে ভদ্রলোক ঐ রাতেই খুন হবেন! খুনটা ধরা পড়তেই অর্নব বিপদে পড়ল।

সে তখন চারতলার কয়েদীর প্রক্সি দিচ্ছে। আমি জলের পাইপ-কার্ণিশ বেয়ে ততক্ষণে নিজের ঘরে পৌঁছে গিয়েছি। নিজের হাত পা নিজেই ম্যাজিক নট মেরে বেঁধেছি। ঐ জাতীয় গিঁট নিজে থেকেই বাঁধা বা খোলা যায়। ডঃ চ্যাটার্জী চলে গেছেন অর্চিষ্মানের ঘরে। ফেঁসে গেল বেচারা অর্নব। এদিকে খুন হওয়ায় অবধারিত ভাবে সাইকোদের উপর সন্দেহ পড়বে। তাই তার ওখান থেকে নড়ার উপায় নেই! আবার পুলিশ এলে অর্চিষ্মান দত্ত'র খোঁজও পড়বে। কপালগুণে ওর কাছে মোবাইল ফোনটা ছিল। ও নিজের অবস্থা অফিসার প্রণবেশ লাহিড়ীকে ফোন করে জানাল। অফিসার লাহিড়ীও চমৎকার ব্যাক-আপ দিলেন। হম্বিতম্বি করে সবাইকে ভয় দেখিয়ে এক জায়গায় জড়ো করলেন। করিডোর ফাঁকা হয়ে গেল। অফিসার লাহিড়ী চারতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথাগুলো বললেন, যাতে চারতলার কয়েদী বুঝতে পারে যে রাস্তা সাফ আছে। এই রোল বদলের সুযোগ। অর্নবের কাছে আসল চাবি ছিল। সে বেরিয়ে এসে ডঃ চ্যাটার্জীকে স্বস্থানে পাঠিয়ে দিল। আর আমি একটু ঝুঁকি নিয়েই তাঁকে ঘরবন্দী করলাম।

কিন্তু মজার কথা হল যে দ্বিতীয় খুনটা হওয়ার পরেই আমার সমস্ত সন্দেহ পড়ল বাচ্চাদের উপর। আর পুপুর সন্দেহ পড়ল আমার উপর। অফিসার লাহিড়ী কায়দা করে দুটো কাজ করেছিলেন। প্রথমত অর্চিষ্মান বা অর্নবকে মেক-আপ তোলার প্রয়োজনীয় সময় দিলেন। দ্বিতীয়ত মার্ডার ওয়েপনটা আমার ঘরে রেখে গেলেন। কুক্কু ওটাকে আলমারির মাথায় রাখার জন্য টেবিলে উঠল। ওর টেবিলে ওঠাটাই প্রমাণ করে দিল যে ফরেনসিক ছ'ফুটের যে খুনীর থিওরি খাড়া করেছিল তা ভুল। একটা বাচ্চাও টেবিলের উপরে উঠে দাঁড়ালে ছ'ফুট লম্বা লোকের মাথার নাগাল পেতে পারে। আর ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র যেখানে পড়েছিলেন, তার সামনেই একটা কাঠের টেবিল ছিল।

আর অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশনের রোগী যখন বলল যে সে লম্বা ছায়ার হাতে লম্বা ছুরি দেখেছে তখনই স্যাঙ্গুইন হলাম—এ বাচ্চাদেরই কারুর কাজ। মানসিক রোগীদের এই এক প্রবলেম! তারা হয় পুরোটা দেখে না, নয় দেখলেও পুরোটা ঠিক ভাবে বলে না। মিসেস অঞ্জলি গুপ্ত'রও এই প্রবলেম ছিল। হ্যালুসিনেশনের রোগীটিও তার ব্যতিক্রম নয়! সে লম্বা ছায়া দেখেছে এটা ঠিকই। কিন্তু ছুরিটা দেখেনি, বরং ছুরিটার ছায়া দেখেছে। এটা যদি সে স্পষ্ট করে বলতে পারত, তবে লম্বা ছুরি—ছোট ছুরির প্যারাডক্সে পড়তে হত না অফিসার লাহিড়ীকে। যখন মার্ডার ওয়েপন হিসাবে একটা ছোট ছুরি পাওয়া গেল তখনই বুঝলাম যে ওটারই ছায়া লম্বা হয়ে পড়ছিল ঘরের সামনে। হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট সেটাই দেখেছে! ছোট ছুরির ছায়া যদি লম্বা হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে লম্বা ছায়াটাও আদতে লম্বা নয়! যেমন ছুরিটা আসলে ছোট, তেমনি ছায়ার মালিকও ছোট! এবং সে যখন উপর থেকে নেমে আসছিল তখনই তার ছায়াটা লম্বা হয়ে পড়েছে। সে দোতলার কেউ হতে পারে না। চারতলার কেউ তো আরও হতে পারে না। কারণ সেখানে তখন ডঃ চ্যাটার্জী না থাকলেও অর্নব ছিল। কোনও সাইকো নেমে এলে তার চোখে পড়বে না এটা সম্ভবই নয়!

অতএব কোনও সন্দেহই নেই যে সে তিনতলার লোক। এবং ছোটখাটো চেহারার মানুষ,

তথা বাচ্চা!

ডঃ সেনগুপ্ত ও তার সাইকো কিলারদের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তখনই সম্ভাবনার লিস্ট থেকে বাদ গেল। আমার মন পড়ল তিনতলার বাচ্চাদের উপর। মনে হল বাচ্চাদের ভিড়ে এমন কেউ নেই তো যে আদৌ বাচ্চাই নয়! বরং ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী একজন পূর্ণবয়স্ক লোক। যাকে দেখতে বাচ্চাদের মত হলেও আসলে একটি ছুপারুস্তম!'

-'আচ্ছা, তারপর?

—'তারপরই বাচ্চার দেহে পূর্ণবয়স্ক লোকের থিওরি অনুযায়ী ভাবতে শুরু করলাম। দেখলাম—একমাত্র এই সম্ভাবনাটাই পারফেক্ট লাগছে। কিন্তু কোনজন? কোনজন আমাদের লোক সেটা বোঝার একটা মজাদার রাস্তা ছিল। আমি ডঃ হালদারের কাছে আবদার করে বসলাম যে আমার প্রমাণ সাইজের একটা জগদ্দল ভারি ব্যাট চাই। যেটা দিয়ে একজন ছ'ফুট লম্বা শক্তপোক্ত পূর্ণবয়স্ক লোক ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারে। আমিও বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলব। কিন্তু ঐ পুঁচকি-হাল্কা ব্যাটে পোষাচ্ছে না! প্রমাণ সাইজের ব্যাট চাই। ডঃ হালদার প্রথমে পাত্তা দিলেন না। পরে আমার ঘ্যানঘ্যানানিতে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে একটা দশাসই জগদ্দল ভারি ব্যাট এনে দিলেন বটে, কিন্তু উলটো বুঝলেন। তিনি ভেবে বসলেন যে হয়তো আমিই ঐ ভীম ব্যাট কারুর মাথায় বসানোর তাল করছি। তাই এমন কড়া ডোজের ওষুধ দিলেন যাতে বিছানা ছেড়ে উঠতেই না পারি! এবং ওয়ার্ডবয় সিস্টারদের কড়া নির্দেশ দিলেন যাতে তারা নিজেরাই পেশেন্টকে ধরে ওষুধগুলো গিলিয়ে দেয়। কোনমতেই ওষুধ স্কিপ করতে না পারে! যাই হোক্, এরপর কায়দা করে কুক্কুকে ব্যাটটা গিফট করলাম। আমি জানতাম খেলা তো দূর, ঐ ব্যাট নাড়ানোর সাধ্যও কোনও বাচ্চার নেই! পরদিন বাচ্চা আর বড়দের মধ্যে একটা ম্যাচ ছিল। কুক্কু তার নতুন ব্যাট নিয়েই খেলতে নামল। কিন্তু যা ভেবেছিলাম! বাচ্চারা সকলেই ঐ একটা ব্যাট নিয়েই খেলছিল। যে যখন স্ট্রাইকে যাচ্ছিল, তখনই ব্যাটটা তার কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল। সেদিন অদ্ভুতভাবে ধড়ধড় করে বাচ্চাদের দলের উইকেট পড়তে শুরু করল। তার কারণ বিপক্ষদলের বোলিং নয়, ঐ মোক্ষম ব্যাট! দেখলাম, আমার অনুমান অনুযায়ী কেউ সেটা নিয়ে নড়াচড়াই করতে পারছে না! এমনকি ঐ কাহিল অবস্থাতে আমারও ব্যাট ধরতে কষ্ট হচ্ছিল। ব্যতিক্রম শুধু পুপু! সে শুধু ব্যাটটাকে তুললই না, বরং অনায়াসে ছক্কার পর ছক্কা মারল। যে হাত ঐ ব্যাট দিয়ে ছক্কা মারতে পারে —সে হাত হরধনু ভঙ্গ করার ক্ষমতাও রাখে! আর অবশ্যম্ভাবী ভাবেই সে হাত কোনও বাচ্চা ছেলের নয়! ব্যস্, ওখানেই পুপু ধরা পড়ে গেল!'

—'তুমি আগেই বুঝতে পেরেছিলে!' ডঃ চ্যাটার্জী ভয়াবহ ভ্রূকুটি করলেন—— তবে বললে না কেন?'

—'বুঝলেই হল না। প্রমাণ দরকার ছিল। একদম কষে ধরতে হবে। তাই একটার পর একটা প্রমাণ জড়ো হচ্ছিল। আপনি ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের টেবিলের তলা থেকে ক্যাস্টর অয়েলের ট্রেস খুঁজে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রমাণ করলেন। অর্নবের পরিশ্রমের পুরষ্কার হিসাবে পাওয়া গেল ঐ এম আর আই স্ক্যান আর টুথ এক্সরেটা। ওটা সবাই প্রথমে দুশো চার, আর পরে দুশো আটের ভেবেছিল। কারুর চোখে পড়েনি যে আট সংখ্যাটা নীল কালিতে লেখা থাকলেও 'আট' সংখ্যাটার একদিকের কালিটা ডট পেনের, অন্যদিকের অংশটা জেল পেনের। আসলে ওটা দুশো তিনের প্লেট। পুপুর স্ক্যান আর টুথ এক্সরের প্লেট! আর ওটাই যত নষ্টের গোড়া! পরপর দুটো খুনের মোটিভ।

আমি মোটামুটি শিওর ছিলাম যে পুপুই আসল খুনী। কিন্তু ও লেটি কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। লেট্ হ্যান্ডার ব্যাটস্ম্যান ঠিকই, কিন্তু আবার রাইট হ্যান্ডার বোলার! তাই একটা ওল্ড ট্রিক খাটাতে হল। কুক্কু আর পুপু দুজনেই আমার ঘরে একটা বল ফেলে যাচ্ছিল। আমি চট করে বলটা ছুঁড়ে মারলাম পুপুর মাথা লক্ষ্য করে। ও চিন্তাভাবনার অবকাশ পায়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় এখানেই ভুলটা করল। বাঁহাতে খপ করে বলটা লুফে নিল। বুঝতে বাকি রইল

না যে ঠিক লোককেই ধরেছি। ভদ্রলোক লেফটি।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্ত ফের ঝামেলা পাকালেন! ওঁর 'খুন করিনি' কথাটা ফের সব তালগোল পাকিয়ে দিল। ডঃ সেনগুপ্ত'র ‘খুন’ আর ‘খুনী’র স্বরূপ তদন্তের খাতিরে জানা দরকার ছিল। অগত্যা হিপনোসিস কিংকেই হিপনোটাইজ করতে হয়েছিল'। সে হেসে ফেলে—'আপনারা জানেন কিভাবে উনি হিপনোটাইজ্‌ড্‌ হয়েছিলেন। পুপু ওঁর দিকে কুড়ি সেকেন্ড তাকাতে পেরেছিল। অর্নব ত্রিশ সেকেন্ডেই ধরাশায়ী! কিন্তু আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি মাথামোটা! পাক্কা দু মিনিটেও আমাকে ভদ্রলোক কাৎ করতে পারলেন না। কিন্তু স্বীকার করছি, যে ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু নিজেই মানসিক রোগী, তাই রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ওঁর গোঁ চেপে গিয়েছিল। আর আমিও ঠিক ঐ মুহূর্তটার অপেক্ষায় ছিলাম। যখন পুরোপুরি কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, তখনই নিজে সরে গিয়ে আয়নাটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলাম! নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল হলেন ডঃ সেনগুপ্ত! তবু স্বীকার করব, ঐ দু মিনিটেই আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে শুরু করেছিল! অদ্ভুত ক্ষমতা এই ভদ্রলোকের! উনি হিপনোটাইজ্‌ড্‌ অবস্থায় সব কথা বললেন। বুঝলাম, ওঁর ট্র্যাজেডিটা আলাদা। এ কেসের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই'।

—‘তাহলে সেদিন কে হেঁটে গিয়েছিল একতলা আর দোতলায়? সে খুনী নয়?’

—‘একদম না’। কুক্কু অধিরাজের কন্ঠলগ্ন হয়ে তার গালে গাল ঠেকিয়ে চুপ করে বসেছিল। এই ভঙ্গিটা নতুনকাকুর পরিচিত। কুক্কু এখন হামি চায়! সে বাচ্চাটাকে একটু আদর করে বলে—'তিনি ইনি! কুক্কুসাহেব কথা দিয়েছিলেন ম্যাচ জিতলে একটা কাজ করে দেবেন। ঐ কাজটা করানোর জন্যই অতিকষ্টে মাঠে নামতে হয়েছিল আমায়। তখনও দুটো বিষয়ে খট্‌কা ছিল। আট নম্বরের মিসেস গুপ্ত খুনীর কমলা শার্ট আর গদা দেখলেন, অথচ এটা তার নজরে পড়ল না যে গদাধারীটি একটি বাচ্চা তথা ছোট মানুষ! আর হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট ছুরি দেখেছিল না ছুরির ছায়া দেখেছিল সেটাও একবার কনফার্ম করে নিতে চেয়েছিলাম। ঐ খটকা দুটো দূর করার জন্য একই পরিবেশ আবার রিক্রিয়েট করতে হল। অর্থাৎ একই সিনের রিমেক। কুক্কু আর পুপুর হাইট প্রায় সমান। তাই কুক্কুই নামল পুপুর ভূমিকায়। এই কাজে আরও দুজন সাহায্য করেছিল। তাদের নাম আমি বলব না। মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই গোটা নাটক শেষ! কিন্তু আমার যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গেল। অঞ্জলি গুপ্ত ফের কমলা জামা, গদা দেখলেন। এবং যথারীতি গদাধারী বেঁটে না মোটা, লম্বা না বেঁটে—কিছুই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন না! হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট এবারও লম্বা ছায়া আর লম্বা ছুরি দেখল! একমাত্র সাইকাসথেনিয়ার পেশেন্টটিই ঠিক বলেছিল। সে ‘লম্বা ছুরি দেখেছি’ বলেনি, বলেছে ‘ছুরির লম্বা ছায়া দেখেছি'। ঐটাই আসল স্টেটমেন্ট। আগেরবার দৃশ্যটা সে দেখেনি বলেই যত গোলমাল! নয়তো তখনই বোঝা যেত যে পেশেন্টরা কেউ ছুরিটার আসল দৈর্ঘ দেখেনি। স্রেফ ছায়াটা দেখেছে।

এসব কিছু করার আগেই অবশ্য আরেকটা কাজ করতে হয়েছিল। পুপু যদি জানতে পারত যে এইসব কান্ড হচ্ছে তাহলে ও আগেই আমায় খুন করত। যেদিন সে বাঁহাতে বলটা লুফে নিয়েছিল সেদিনই বুঝেছিল যে ভুল করেছে। তাই খুব সতর্ক ছিল। আমিও মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক ছিলাম। তাই কোনওরকম চান্স না নিয়ে সুযোগ বুঝে প্যাথোলজি ল্যাব থেকে ক্লোরোফর্ম, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আর একটা কনটেনার সরিয়ে ফেললাম। আগেই বুঝেছিলাম যে ও বাচ্চা নয়, একটি ডোয়ার্ফ মাত্র। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ফরেনসিকই শেষ কথা বলে। তাই ওকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে সোজা চারতলায় ডঃ চ্যাটার্জীর কাছে নিয়ে গেলাম। ডঃ চ্যাটার্জী ওর রক্তের নমুনা নিতে হাতটা একটু কেটে দিলেন। অসম্ভব চালাক খুনী। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ফোটানোর দাগ দেখলেই বুঝত ওর ব্লাড নেওয়া হয়েছে। সেইজন্যই সিরিঞ্জ ফোটানোর দাগটা ঢাকার জন্য হাতটা একটু কেটে দিতে হয়েছিল। তারপর আমিই ওকে ঘাড়ে করে ছাতে রেখে এলাম'। অধিরাজ হাসল—‘সমস্ত হাঙ্গামা মিটে গেলে ডঃ চ্যাটার্জীকে আবার গভীর রাতে নামিয়ে আনতে হল উপর থেকে। আপনাদের প্যাথোলজি

ল্যাবের করুণ অবস্থা উনিই করেছিলেন! কিছু ভেঙেটেঙে থাকলে ওঁর ঘাড় ভেঙে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিতে পারেন। পুপুর রক্তের নমুনা নিয়ে গ্রোথ হরমোন স্টিমুলেশন টেস্ট করলেন। যথারীতি হাইপোপিট্যুইটারিজ ধরা পড়ল। তদন্ত ওখানেই শেষ। খুনীকে সপ্রমাণ শনাক্ত করা গেল।

ওদিকে পুপুও আমাকে সন্দেহ করেছিল। যখন আমি ফোন ধরতে বাইরে গেলাম সেই ফাঁকে ও আমার ঘর সার্চ করল। আই কার্ডটা যথেষ্ট গুপ্ত জায়গায় ছিল। কিন্তু পুপু ঠিক খুঁজে বের করল! আমি যখন ফোনে কথা শেষ করে ঘরে ফিরে আসি তখন কুক্কুসাহেব আমার ঘর সার্চ করছে! ব্যাটা এক নম্বরের কপিক্যাট। পুলিশ এখানে কখনও সার্চ করেনি। তাহলে কাকে সার্চ করতে দেখেছে ও? আর কাকেই বা নকল করছে! ওর বাঁহাতে সার্চ করার ভঙ্গি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তিনি যখন আমার আই কার্ডটা বের করে গম্ভীর মুখে বললেন- –'বুঢেঠি'! তখন আমিও বুঝলাম বিচ্ছুটা কাকে নকল করছে। এখানে একজনই 'ট..........ট' করে কথা বলে। তার সাথে এও বুঝলাম, আমার কপালে মস্তবড় ফাঁড়া নাচছে! তারপর কি হয়েছিল তা আপনারা জানেন। পুপুকে চ্যালেঞ্জ জানালাম। ডঃ হালদারকে সবকথা খুলে না বললেও সামান্য হিন্ট দিয়ে অনুরোধ করলাম ক্লোরোফর্মের শিশিটা প্যাথোলজি ল্যাব থেকে সরিয়ে দিতে। আশঙ্কা ছিল যে আমার দেখানো পথেই পুপু চলবে। ঘটলও তাই। ক্লোরোফর্মের আবির্ভাব হল। আমি সবসময়ই ওর বুদ্ধির কদর করে চলেছি। দুঃখের বিষয়, ও সেটা করেনি। তাই গবেটের মত শিশি থেকে ক্লোরোফর্ম সরানোর আগে দেখে নিল না যে ওটা সত্যিই ক্লোরোফর্ম কি না! ডঃ হালদার আগেই শিশিটা পালটে অবিকল ক্লোরোফর্মের মতই দেখতে মিষ্টি গন্ধওয়ালা পারফিউমের শিশি রেখে দিয়েছিলেন'। সে শ্বাস টানল—'চমৎকার স্মেল ছিল পারফিউমটার। কোন্ ব্র্যান্ড?'

—'খাঁটি ফরাসী আতর!' ডঃ হালদার হাসছেন—'ডঃ চৌধুরী মাখেন। ওঁর ঘর থেকেই সরিয়েছিলাম!'

–'আমিও ভাবছি এরপর থেকে মাখব'। সে বলল—'অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ডঃ সেনগুপ্ত'র কামাল। যে দুই ওয়ার্ডবয়কে হাত করেছিলাম তারা ডঃ সেনগুপ্তকে নিয়ে ওয়ার্ডবয়দের ঘরে অপেক্ষা করছিল। আমার ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই একদম আগে দেওয়া নির্দেশ মেনে ডঃ সেনগুপ্তকে দরজার সামনে এনে রাখল। বাদবাকিটা আপনারা জানেন'।

অধিরাজ পরম মমতায় ডঃ সেনগুপ্ত'র দিকে তাকায়। তিনি তখনও স্থির হয়ে বসে আছেন।

—'আ রিয়েল অ্যাসেট! এই মানুষটিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলুন আপনারা। ইনি ফর্মে ফিরলে এই অ্যাসাইলাম তো বটেই, অনেক মানুষেরও মঙ্গল হবে'।

-'একটা কথা বুঝলাম না স্যার'। অর্নব বলে—'পুপু যে দময়ন্তী সেনের কাজিন ব্রাদার তা বুঝলেন কি করে?

–'সেকি! তুমিই তো খবরটা দিলে!' অধিরাজ বলল—'দময়ন্তী সেন কোনও প্রতিবেশীর কাছে, এমনকি পাপড়ি গুপ্ত'র কাছেও কখনও নিজের বাবা, মা, নিজের দাদা বা দিদি, এমনকি প্রাক্তন স্বামীর কথাও বলেননি! বললেন তো শ্রেফ এক খুড়তুতো ভাইয়ের কথা। এর মানে কি! কাজিন ব্রাদারটি তার সবচেয়ে কাছের লোক। ওদিকে পুপুর বয়েস কমপক্ষে বত্রিশ! দময়ন্তী সেনের ছেলে সে হতেই পারে না। তবে কে সে! একটাই অপশন হতে পারে। যে একমাত্র মানুষটির কথা দময়ন্তী সেন বলেছেন সেই কাজিন ব্রাদার। তাছাড়া দময়ন্তী তার চেহারার বর্ণনাও অজ্ঞাতসারে দিয়ে ফেলেছিলেন'।

—'চেহারার বর্ণনা!' অর্নব অবাক—'কিন্তু উনি তো ছ'ফুট লম্বা লোকের কথা বলেছিলেন'!

—সেইজন্যই তো 'অজ্ঞাতসারে' শব্দটা বলেছি'। সে মুচকি হাসে—'দময়ন্তী গোটাটাই

মিথ্যে বলেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল, ,মিথ্যের মধ্যেও অনেকসময় সত্যি লুকিয়ে থাকে। যেমন ফিল্মের নামটাই ধরো। উনি নামটা বানিয়ে বলেছিলেন। কিন্তু 'কেরামতি' শব্দটা আর বাঘের উপস্থিতি সত্যি ছিল। কাজিন ব্রাদারের কাল্পনিক বর্ণনা থেকেও ঠিক এইভাবেই তার আসল চেহারাটা ধরা পড়ে যায়। ধরো, তোমায় যদি ডঃ অসীম চ্যাটার্জীর ইনস্ট্যান্ট মিথ্যে বর্ণনা দিতে বলা হয় তবে কি বলবে?'

-'বলবো যে...' অর্নবের সপ্রতিভ উত্তর— 'লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল........'

—'এগজ্যাক্টলি'। অধিরাজ চোখের কোণে ডঃ চ্যাটার্জীকে একবার দেখে নেয়—'তুমি প্রথমেই ওনার মাথার বিখ্যাত টাকটার উল্টোটা বলবে। কারণ টাক ওঁর সবচেয়ে উইক পয়েন্ট। টাক দেখলেই কেউ আইডেন্টিফাই করবে এই ভয়ে তুমি প্রথমেই সেটাকে 'ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে'র মিথ্যে বর্ণনা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করবে'।

ডঃ চ্যাটার্জী ফোঁস করে উঠলেন—'ফের আমার টাক নিয়ে টানাটানি!'

–'ওকে... সরি হিজ হাইনেস'। তাকে থামিয়ে দিয়েছে অধিরাজ—'দময়ন্তীর ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। উনি খুড়তুতো ভাইটির উলটো ডেসক্রিপশন দিয়েছেন। এবং প্রথমেই তাকে টেনে ছ'ফুটের উপর লম্বা করেছেন। এর থেকেই স্পষ্ট যে কাজিন ব্রাদারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার হাইট! যেহেতু মিথ্যে বর্ণনায় সে বিরাট লম্বা, অতএব বুঝতে হবে আসল লোকটি অস্বাভাবিক বেঁটে।

–'ও,' এবার অর্নব বুঝতে পারে— তাই আমাকে ফিল্মের সবচেয়ে বেঁটে অভিনেতাটিকে খুঁজে বের করতে বললেন?'

–'হ্যাঁ। আর তুমি নিজের অজান্তেই সেটা খুঁজে বেরও করলে। ঐ ফিল্মের লিড রোলে একটি বাচ্চা ছেলে ছিল।

ফিল্মের স্টোরি লাইনআপ অনুযায়ী বাচ্চাটিকে বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে, বা বাঘের সাথে নিশ্চয়ই শট দিতে হয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখ, কোনও বাচ্চা ছেলের পক্ষে কি বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে শট দেওয়া সম্ভব? সার্কাসের হোক্, কি চিড়িয়াখানার, বাঘ তো বাঘই! বড়রাও তার সাথে শট দিতে গিয়ে গলদঘর্ম হবে! বাঘটার বেশি কিছু করার দরকার নেই, গাঁক করে একবার ডাক দিলেই যথেষ্ট! বয়স্ক মানুষেরাও ফিট পড়বে, আর এতো একটা বাচ্চা ছেলে। ভয়ে হয়তো হার্টফেলই করবে! এত বড় ঝুঁকি কি কোনও ডাইরেক্টর নেবে?' সে সিগ্রেটে সুখটান মেরে বলে— সেক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক, তাহল ডামি ব্যবহার করা। বাঘের সামনে দাঁড়ানোর মত বুকের পাটা আছে, এমন লোক চাই। অথচ তাকে বেঁটে হতে হবে বাচ্চাদের মতন। এইবার সবক'টা পয়েন্ট পরপর ফেলে দেখ। পুপু পূর্ণবয়স্ক লোক, কিন্তু বাচ্চাদের মত দেখতে, দময়ন্তীর ছেলে সে হতেই পারে না—অথচ তাকে ছেলের পরিচয় দেওয়া, দময়ন্তীর কাজিন ব্রাদারের মিথ্যে বর্ণনা, কাজিন ব্রাদারের একটি বিশেষ ফিল্মে অভিনয়ের কথা উল্লেখ, এবং সেই বিশেষ ফিল্মটিতে একজন পূর্ণবয়স্ক কিন্তু ডোয়ার্ফ ডামি থাকার অব্যর্থ সম্ভাবনা। সো ইজি–স্রেফ দুয়ে দুয়ে চার!'

অর্নব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! ব্যাপারটা কত সহজ! অথচ তার মাথায় এলো না কেন?

অধিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর সিগ্রেটটা নিভিয়ে দিয়ে আপনমনেই আস্তে আস্তে বলল—'পুপু কি করে দময়ন্তীর ছেলের পরিচয় পেল সেটা অবশ্য অজানা! সম্ভবত দময়ন্তীর কোনও পাস্ট হিস্ট্রি আছে, যেটা আমরা এখনও জানি না। পুপুকে অফিসার লাহিড়ী একটু মেরামত করলেই সেটা বেরিয়ে পড়বে। আমি যেটা বলছি সেটা সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক। আমার মনে হয় দময়ন্তীর আসল নাম ও পরিচয় অন্য কিছু। তাই ১৯৯৯ সালের আগে তার রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। দিল্লীতে তপন সেনের সাথে বিয়ে। এবং তার অ্যাক্সিডেন্টের পর কয়েক কোটি টাকার মালকিন হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। সম্ভবত মা-বাবার সাথে সম্পর্ক ছিল না, অথবা তারা বেঁচেই নেই। এইখান থেকে গল্পের শুরু।

দময়ন্তী কলকাতায় ফেরার পর কোনওভাবে তার খুড়তুতো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়।

তার নিজের কথা ও পাপড়ি গুপ্ত'র বয়ান অনুযায়ী এই ছেলেটির সাথেই তার শৈশব কেটেছে। ভাইকে ভালোবাসতেন। অনাথ ভাইটা ফিল্মে ডামির রোল করে কষ্টেসৃষ্টে জীবন কাটাচ্ছে দেখে হয়তো তার কষ্ট হল। ভাইকে নিজের কাছেই রাখলেন। এটা সম্পূর্ণ আমার অনুমান। কিন্তু আশা করছি আসল ঘটনা এর কাছাকাছিই।

ভাইকে তো রাখলেন, কিন্তু কি পরিচয় দেবেন? এখানেই একটা মারাত্মক স্টেপ নিলেন দময়ন্তী। ভাইকে সোসাইটিতে 'নিজের ছেলে' বলে পরিচয় দিলেন। পুপুও সেই সুযোগটা নিল। এর মধ্যেই দময়ন্তী বিয়ে করলেন বিজ্ঞানী অসিত চ্যাটার্জীকে। পুপু কতদূর পড়াশোনা করেছে জানিনা। সচরাচর হাইপোপিটুয়্যইটারিজ এর রোগীদের পড়াশোনা বেশিদূর হয়না। কিন্তু বুদ্ধির বহর দেখে মনে হয় ইনি বোধহয় ব্যতিক্রম। অন্তত 'থ্যালিয়াম' যে একটা মারাত্মক বিষ, সেটা বোঝার জন্য যতটুকু আই কিউর দরকার পড়ে, ততটুকু ছিল। হয়তো বাচ্চাদের হাত থেকে দূরে রাখার জন্য বিজ্ঞানী সাহেব ওয়ার্নিং ও দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুপুর যা দরকার ছিল, তা সে পেয়ে গেল। সে দেখল বিজ্ঞানীর ল্যাবে থ্যালিয়ামের মত মারাত্মক বিষও রাখা থাকে। এবার প্ল্যান করল দিদিকে সরানোর। অসিত চ্যাটার্জীকে এখনও দেখিনি। কিন্তু তারঁ সম্পর্কে সবাই প্রায় এক কথাই বলেছে। তিনি একদম টিপিক্যাল আত্মভোলা লোক ছিলেন। তাঁর ল্যাবে কুক্কু দিব্যি ঢুকে বসে থাকত। উৎপাতও করত। পুপুও নিশ্চয়ই ঢুকত। অন্যমনস্ক উদাসীন বিজ্ঞানী লক্ষ্যই করেননি যে থ্যালিয়ামের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যখন তাঁর চোখে পড়ল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে! দময়ন্তীর মৃত্যুর লক্ষণগুলো উদাসীন হলেও জাত বিজ্ঞানীর চোখ ধরে ফেলল। পাগলের মত থ্যালিয়ামের শিশি খুঁজতে ল্যাবে ঢুকে দেখলেন—সর্বনাশ! কুক্কু সেই সর্বনেশে শিশিটাই ধরে নাড়াচাড়া করছে! কি কুক্কু—তাই না?'

–'হ্যাঁ'। কুক্কু মাথা নাড়ল—'তারপর বাবা সেটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে বারান্দার জানলা থেকে ফেলে দিল'। –'সেইজন্যই দুজনের মাত্র দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে শিশিতে। এটাও অস্বাভাবিক। অসিত চ্যাটার্জী হয়তো অনেকবার শিশিটা ধরেছেন। তাঁর একাধিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু পাওয়া গেল মাত্র একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট! তার মানে, তার আগেই শিশিটাকে ভালোভাবে ধোয়ামোছা হয়েছে। যখন কুক্কু সেটাকে ধরেছিল তার আগে সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্টই হাপিশ করে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক্, কুক্কু বাচ্চা বলে রেহাই পেয়ে গেল। অসিত চ্যাটার্জীকে পুলিশ গ্রেফতার করল। ভদ্রলোকের কোর্টে শুনানির বিবরণ পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি নিজেকে ডিফেন্ড করার কোনও চেষ্টাই করেননি। জজসাহেব নিজেও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনার কিছু বলার নেই?' অসিত চ্যাটার্জী উত্তর দিয়েছিলেন—'না'। কুক্কুকে থ্যালিয়ামের শিশি নিয়ে বসে থাকতে দেখে তিনিও উলটো বুঝেছিলেন। ভেবেছিলেন, অজান্তেই হয়তো কুক্কু দুষ্টুমি করে সৎ মা কে ভুলবশত থ্যালিয়াম দিয়ে ফেলেছে! অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথাতেই আসেনি। তাই ছেলেকে বাঁচানোর জন্য কোর্টেও নীরব থাকলেন ভদ্রলোক। সবাই তাঁর এই নীরবতাকেই অপরাধীর স্বীকারোক্তি হিসাবে ধরে নিল। তবু ডিফেন্স লয়্যার কেসটাকে ছাড়লেন না। তিনি একের পর এক সাক্ষী তুলে প্রমাণ করে দিলেন যে লোকটা একদম ন্যালাখ্যাপা! যাঁর নিজেরই প্রাইভেট ল্যাব গড়ে তোলার ক্ষমতা আছে, তাঁর পয়সার অভাবও নেই। যাঁর খাওয়া ঘুমের ঠিক নেই, দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া, জামা পালটানো কিছুরই ঠিক নেই—তিনি কিনা প্রি প্ল্যান্ড মার্ডার করবেন! তাহলেই হয়েছে! সত্যিই খুনের স্টাইলের সাথে বিজ্ঞানীর চরিত্র খাপ খাচ্ছিল না! ডিফেন্স লয়্যারের বুদ্ধি আছে বলতে হবে, একটা সঠিক পয়েন্ট তিনি ধরতে পেরেছিলেন। আরেকটা পয়েন্ট ধরতে পারলেই অসিত চ্যাটার্জী রেহাই পেয়ে যেতেন'।

-'কি পয়েন্ট?'

–'ফরেনসিক রিপোর্টে পরিষ্কার লেখা আছে খাবারের সাথে থ্যালিয়াম দময়ন্তীর পেটে গিয়েছিল। অথচ পাপড়ি গুপ্ত নিজের বয়ানে, এমনকি অসিত চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে উঠেও বারবার একটা কথার উল্লেখ করেছিলেন, যেটা কারুরই চোখে পড়েনি। অর্ণবকেও

এই একই কথা তিনি বলেছিলেন। কথাটা অবিকল এরকম ছিল—‘পরের দিকে তো দময়ন্তী আর ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষাই করতেন না। নিজেরা নিজেদের মত খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন'। এই 'নিজেরা' শব্দের প্লুরালের অন্য ব্যক্তিটি কে? আর যেই হোক্, অসিত চ্যাটার্জী হতেই পারেন না। তার ডিনার বা লাঞ্চটাইম আলাদা ছিল—দময়ন্তীর সাথে যে তিনি একসঙ্গে ডিনার করতে বসতেন না তার জবরদস্ত প্রমাণ পাপড়ি গুপ্ত'র এই কথা! কারণ বক্তব্য অনুযায়ী দময়ন্তী আর ‘ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষাই করতেন না। তবে অসিত চ্যাটার্জী দময়ন্তীর খাবারে আলাদা করে বিষ মেশাবেন কখন? আর যদি তর্কের খাতিরে যেনেও নিই যে ভদ্রলোক একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে খাবারে বিষ মেশাতেন, তাহলে কোনটা দময়ন্তী খাবেন, কোন্টা খাবেন না—বুঝবেন কি করে? যদি কল্পনাশক্তিকে আরও একটু খাটাই তবে ধরে নিতে হয়, তিনি সব খাবারেই বিষ মিশিয়েছিলেন! সেটাও অসম্ভব! সেক্ষেত্রে শুধু দময়ন্তীই নন্, কুক্কু, পুপু এমনকি স্বয়ং বিজ্ঞানী সাহেবও সুস্থ থাকতেন না।

অন্য ব্যক্তিটি কুক্কুও হতে পারে না। কারণ পাপড়ি গুপ্ত'র বয়ান অনুযায়ী সে বাবাকে টেনেটুনে ডিনার বা লাঞ্চের কথা মনে করিয়ে দিত। বাবার জন্য অপেক্ষা করত কুক্কু। দুজনের ডিনার বা লাঞ্চ টাইম একই ছিল।

সুতরাং দময়ন্তীর সাথে যিনি একসাথে খেতেন তিনি পুপু। দময়ন্তীর খাবারে বিষ মেশানোর স্কোপ তার সবথেকে বেশি ছিল। আর লাভও ছিল একমাত্র তারই। দময়ন্তী মারা গেলে নিঃসন্দেহে ফাঁসবেন অসিত চ্যাটার্জী। প্রপার্টির নিরঙ্কুশ অধিকার পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। ঘটনাক্রমে হলও তাই। বেচারি নিরীহ বিজ্ঞানী ফেঁসে গেলেন। পুপুর প্ল্যান সফল হল'।

–‘তবে অসিত চ্যাটার্জী দময়ন্তীকে 'খুন করে ফেলবো' বলেছিলেন কেন? এ তো রীতিমত খুনের হুমকি!’

অর্নবের প্রশ্নে হাসল অধিরাজ——ঐ ডায়লগটা বলা চ্যাটার্জী ফ্যামিলির জেনেটিক প্রবলেম! তোমাকে একটা তথ্য জানানো হয়নি। অসিত চ্যাটার্জী আমাদের ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ 'টেকো' চ্যাটার্জীর যমজ ভাই'।

—'আমায় ফের টেকো বলা!’ ডঃ চ্যাটার্জী লাফিয়ে উঠেছেন—‘মেরে ফেলব...কেটে ফেলব...খুন করে ফেলব... একদম খুন করে ফেলব...

–‘দেখলে?’ সে হাসছে—‘যমজ ভাইদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কিছু মিলও থাকে। তার মধ্যে এই একটা। খেপে গেলে দুজনেই 'খুন করে ফেলবো' বলেন। ডঃ চ্যাটার্জী তো রোজই আমাকে খুন করার হুমকি দেন! কিন্তু এখনও খুন করেননি। বলা, আর করা—দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পুপু আর কুক্কু—দুজনেই এই অ্যাসাইলামে এসে উঠল। পুপু নিশ্চিন্ত। এতদিন যে কষ্টে, যে চূড়ান্ত অবহেলায় জীবন কাটিয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি। এখন তার কাছে কোটি কোটি টাকা। সে একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

কিন্তু সেই স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটালেন ডঃ চিরঞ্জীব মিত্র। একদম বাচ্চাদের মত আকৃতি, নিষ্পাপ কচি কচি মুখ, বাচ্চাদের মত কন্ঠস্বর থাকার দরুণ পুপুর ডোয়াফিজমের অভিশাপ প্রায় আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছিল। বাইরে থেকে দেখে তাকে বাচ্চা বলেই মনে হয়। তাছাড়া হাইপোপিট্যুইটারিজ্‌মের কিছু আনুষঙ্গিক সমস্যা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এই ‘নাও থাকতে পারে'র ক্যাটাগরিতে পড়ত পুপু। শুধু একটাই সমস্যাই ছিল। কথা বলার সময় অক্ষরগুলো সে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারত না। 'ট, ঠ, ড’ কথার মধ্যে চলে আসত। অন্যদিকে কুক্কুর ভয়ে ফিট পড়া! ডঃ মিত্র ভাবলেন, পুপুর উচ্চারণদোষ আর কুক্কুর ফিট পড়ার পিছনে কোনও নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার নেই তো! তিনি নিজে নিউরোলজিস্ট ছিলেন। তাই বাচ্চাদুটোর এম আর আই

স্ক্যান করালেন। কিন্তু স্ক্যানের প্লেট দেখে চিন্তায় পড়লেন। একটা দশ বছরের বাচ্চার

মাথার স্ক্যান আর বারো বছরের ছেলের স্ক্যানে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তাঁর মনে হল কুক্কুর মস্তিষ্ক'র তুলনায় পুপুর মস্তিষ্ক যেন একটু বেশি ডেভলপ্‌ড। ডঃ মিত্র'র সন্দেহ হল। কিন্তু ব্রেন দেখে অত স্পেসিফিকভাবে বোঝা যায় না। তাই যেটা দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, সেই টুথ এক্সরেও করালেন দুজনের। এবং পুপুর দাঁতের এক্সরে প্লেট দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ! বুঝলেন যে পুপু আদৌ কোনও বাচ্চা ছেলেই নয়! বরং বয়স্ক লোক। কম সে কম বত্রিশ বছর বয়েস তো তার হবেই!

ওদিকে পুপুও প্রমাদ গুণেছিল। সে চিরঞ্জীব মিত্র'র উপর নজর রাখল। এবং বুঝল যে ডঃ মিত্র ডঃ চৌধুরীকে সবকথা খুলে বলতে চলেছেন।

এরপরই তৈরি হল মাস্টার প্ল্যান। চিরঞ্জীব মিত্র মারা গেলেন।

কিন্তু পুপুর মনে একটু সন্দেহ ছিল। অঞ্জলি গুপ্তকে সে ভয় দেখিয়ে এসেছে। মহিলা যদি সঠিক বর্ণনা দিয়ে ফেলেন! যদি বলে দেন যে খুনীটি বাচ্চাদের আকৃতির ছিল। সেইজন্যই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল সে। কুক্কুর ব্যাট তো তার হাতের মুঠোয়। একঘরেই থাকে দুজন। সেটা নিয়েই নীচে নেমে এসেছিল। কুক্কুকে ফাঁসিয়ে দেওয়াটাই সবচেয়ে সন্তোষজনক সমাধান মনে হল তার। সে ব্যাটটায় চুল আর রক্ত মাখিয়ে সেটাকেই মার্ডার ওয়েপন হিসাবে ফেলে গেল। আর পরে সুযোগ বুঝে ঠ্যাঙাটাকে ফেলে দিল পুকুরে।

কিন্তু এতকিছু করেও শেষরক্ষা করতে পারল না। সে জানত না যে সেদিন বিকেলেই ডঃ মিত্র তার ঐ এক্সরে প্লেট- এম আর আই স্ক্যান সমেত সব কিছুই রেখে এসেছিলেন ডঃ অমিতাভ খাসনবিশের টেবিলে। যখন জানতে পারল ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ডঃ খাসনবিশ সব জেনে গেছেন। যে কোনও মুহূর্তে তার পর্দাফাঁস হবে। তাই প্রথমে সে অখাদ্য স্যুপের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানানোর আইডিয়া ঢোকাল কুক্কুর মাথায়। সবকাজই সে কুক্কুকে সামনে রেখে করতে চায়! যথারীতি কুক্কু দলবল নিয়ে হাজির হল কিচেনে। পুপুও ছিল সেই দলে। বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে আর নানাবিধ বায়নায় যখন কিচেনের লোক চোখে সর্ষেফুল দেখছে, তখনই সুযোগ পেয়ে বাটার নাইফটা হাতিয়ে নিল। সে জানত রাত বারোটার আগে ডঃ খাসনবিশকে বিশেষ এমার্জেন্সি ছাড়া বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই রাত বারোটা নাগাদ সে চুপিচুপি নেমে এল উপর থেকে। লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায় তার বিস্তর অসুবিধা হয়েছিল। বিশেষ করে টর্চের আলো জ্বলে ওঠায় তার ছায়া দেখতে পেয়ে গেল হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট!

যাই হোক্, ডঃ খাসনবিশের টেবিলের তলায় ঘাপ্টি মেরে বসে সে ভদ্রলোকের অপেক্ষা করছিল। ডঃ খাসনবিশ তার জুনিয়র ডাক্তারটিকে নিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। কিছুক্ষন কথাবার্তার পর জুনিয়র ডাক্তারটি চলে গেল। পুপু দেখল এই সুযোগ! টেবিলের তলা থেকে একদম সোজা ছুরি বসিয়ে দিল ভদ্রলোকের বুকে। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁরই টর্চ দিয়ে তন্ন তন্ন করে টেবিল খুঁজল পুপু। ভাগ্য এতদিন তার সাথ দিয়েছে। এবারও সহৃদয় হল। নিজের প্লেটগুলো খুঁজে পেয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু ঐ দুটো প্রমাণ লোপাট করার প্রয়োজনীয় সময় পেল না। কারণ দোতলায় তখন রীতিমত গোলমাল চলছে। তাই প্লেটের পিছনের রিপোর্টটা সে ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরল। আর চালাকি করে দুশো তিনের 'তিন' অক্ষরটাকে টেনে 'আট' করে দিল'।

অধিরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—'ভাগ্য তার উপর প্রসন্ন ছিল বলে একবারও সে ধরা পড়েনি। কিন্তু ভাগ্যের জোরও শেষপর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারেনি। এখানেই পুপু নামক ব্যক্তিটির ইতিহাস শেষ। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

-'হ্যাঁ স্যার...' অর্নব বলল—'আপনি যখন জানতেনই যে পুপু মার্ডারার, তখন তিন ডাক্তারের রেকর্ড চাইলেন কেন?

—'শেষ দিনের সম্মুখ সমরে যাঁদের হেল্প নিতে চলেছি তাঁদের সম্পর্কে একটু জেনে নেবো না? তাঁরা কতটা নির্ভরযোগ্য সেটাও তো দেখতে হবে'। সে ডঃ চৌধুরীর দিকে সহাস্যদৃষ্টিতে তাকায়—'লক্ষ্য করছি মাঝেমধ্যেই আপনার বাঁ হাতটা অ্যাপ্রণের পকেটে ঢুকে

যাচ্ছে। ওটাকে ওখানে রেখে আর লাভ কি? বের করেই ফেলুন না।

ডঃ চৌধুরী লজ্জিতমুখে পকেট থেকে একটা বাটার নাইফ বের করে এনেছেন। লাজুক লাজুক হাসতে হাসতে বলেন—'ভেবেছিলাম তেমন ভয়ঙ্কর খুনী হলে এটা দেখিয়েই ভয় দেখাবো।

–'কিন্তু খুনীকে দেখেই এমন ভির্মি খেলেন যে পকেটের অস্ত্রটা পকেটেই রয়ে গেল!' অধিরাজও হেসে ফেলেছে—'এমন খুনীর কথা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। তাই না?'

দুই ডাক্তারই হাসলেন। সত্যিই কল্পনাও করেননি তারা।

অর্নবের মোবাইল বেজে উঠল। অফিসার পবিত্র আচার্য ফোন করে জানালেন যে অসিত চ্যাটার্জীকে পাওয়া গেছে। তার এক বিজ্ঞানী বন্ধুর ল্যাবরেটরি রেড করেই পাওয়া গেছে তাকে।

—'এগেইন গুড নিউজ। ভদ্রলোক বোকার মত পালিয়ে গিয়েই ঝামেলা পাকালেন। খুনের দায় থেকে যদি বা উদ্ধার করা গেল, ফের আইনভঙ্গ করার জন্য অল্প শাস্তি হবে তাঁর'। অধিরাজ ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়েছে—'আপনার এই কান্ডজ্ঞানহীন ভাইটিকে দয়া করে মানুষ করে তুলুন ডক্টর। এরকম যদি একের পর এক ব্লান্ডার করে বসে থাকাই তাঁর স্বভাব হয়, তবে বিপদ! এখন তো মনে হচ্ছে কুক্কুর জন্য নয়, বরং তার বাবার জন্যই ন্যানির বেশি প্রয়োজন! আর প্রত্যেকবার ন্যানি হিসাবে আমাকে পাওয়া যাবে না।

–'স্যার...' অর্নব একটু অন্যমনস্ক স্বরে বলে—'পুপুর কথা ভেবে কেন জানি না আমার বারবার রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর' লাইনটা মনে পড়ে যাচ্ছে। পরশপাথর সে সত্যিই পেয়েছিল। চেহারাটা হয়তো তার পক্ষে অভিশাপ! কিন্তু অমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এমন সাহস, অদ্ভুত অভিনয় ক্ষমতা ঈশ্বর সবাইকে দেন না'।

–'কথাটা ঠিকই বলেছ'। অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—'এটাই জাত ক্রিমিনালদের সমস্যা। তারা প্রত্যেকেই রীতিমত প্রতিভাবান। কিন্তু পরশপাথর পেয়েও সেটা চিনতে পারে না। ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কবিতায় তবু পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজান্তেই কিছু সোনা হয়েছিল। এখানে যে কি সোনা হল—কে জানে! বাকি জীবনটা তার জেলেই কাটবে! অবশ্য যদি না ফাঁসি হয়...!'

নিজেদের কাজ শেষ করে অধিরাজ ও তার টিম ফিরে গেল।

–'যে বলেছিল পুলিশ শুধু যমদূতই হয় না...' ডঃ চৌধুরী অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন——কখনও কখনও দেবদূতও হয়, সে ঠিকই বলেছিল'।

-'এ কথাটাও আপনার আগে কেউ বলেনি স্যার'। ডঃ হালদার অ্যাপ্রণ থেকে একটা কলা বের করে সযত্নে ছাড়াতে ছাড়াতে বলেন—'আপনিই প্রথম বললেন। এবং ঠিকই বলেছেন'।

ডঃ চৌধুরী সকৌতুকে তার দিকে তাকালেন—'যাক্, অবশেষে কলা ফিরল। কলা ফিরেছে মানে তুমিও ফর্মে ফিরেছ'।

–'আপনি শুধু আমার হাতের কলাটাই দেখলেন?' বিস্ময়াহত কণ্ঠস্বরে বললেন ধৃতিমান হালদার—'আর স্যারকে দেখলেন না? ঐ দেখুন!'

অবাক হয়ে ডঃ পুলক সেনগুপ্ত'র দিকে তাকালেন ডঃ চৌধুরী। স্কিজোফ্রেনিয়ায় আচ্ছন্ন মানুষটি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দূরের গাড়িটার দিকে। তার শীর্ণ ডানহাতটা অল্প অল্প নড়ছে! মুখে স্মিত হাসি। তার সাথে একটা ক্ষীণ শব্দও কানে এল...

–'টা-টা...টা-টা...!'

ডঃ চৌধুরী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটা কি করে হল! কখন হল! টের পেলেন জীবনে এই প্রথম তার চোখ বেয়ে তরল নোনতা জিনিসটা গড়িয়ে পড়ছে! বিন্দু হয়ে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত ধরা গলায় বারবার বললেন

–'থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ...!'

(সমাপ্ত)